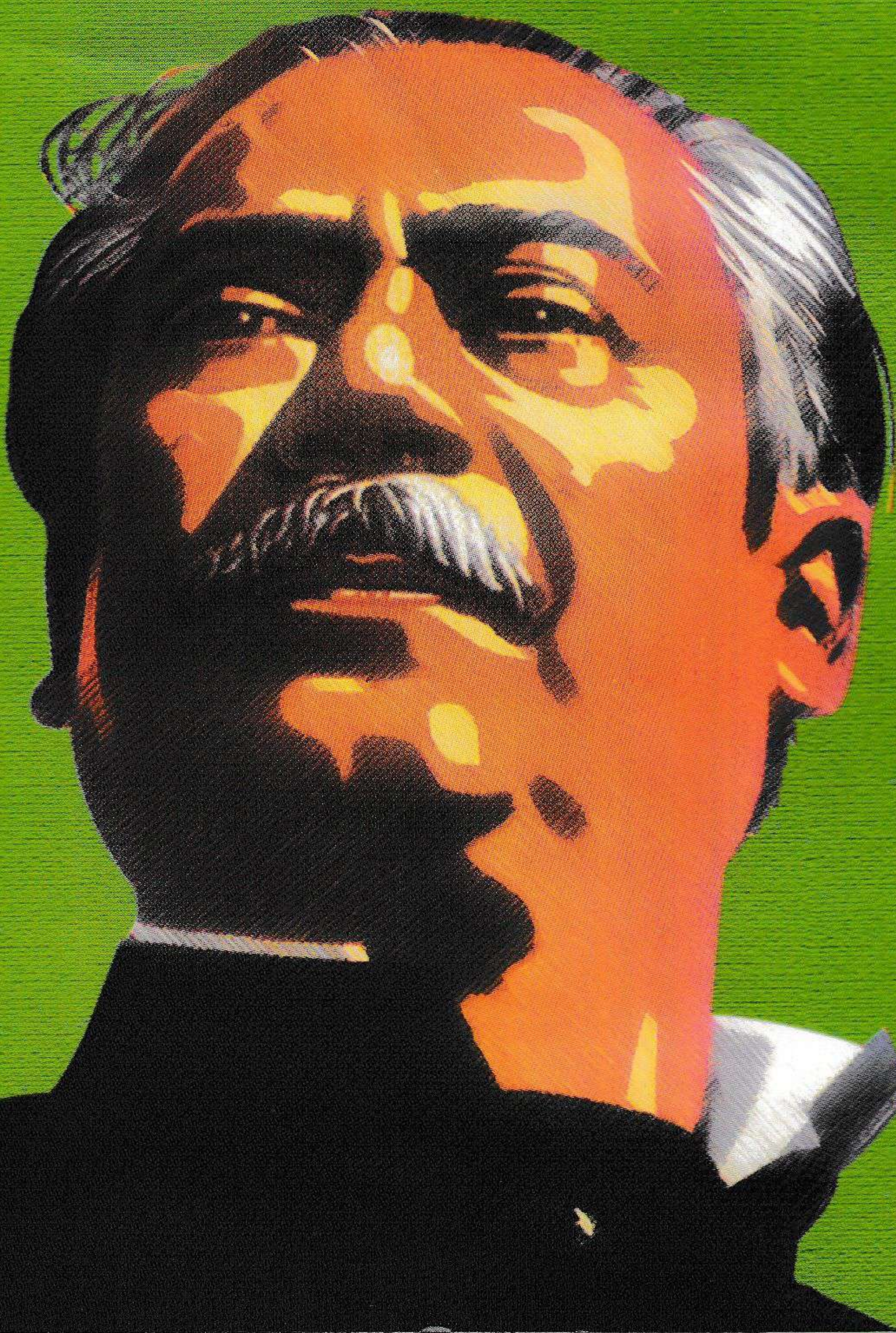
একটি পতাকা
একটি মানচিত্র
একটি নাম

বঙ্গবন্ধু

সংকলন সম্পাদনা

ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর
ড. অরুণ কুমার গোস্বামী





অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর ১৯৬৪ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কমলাকান্তপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মরহুম আশরাফুর রহমান, মাতা-মরহুম শওকত আরা বেগম। তিনি খুলনার সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে ১ম বিভাগে এসএসসি এবং সরকারি বিএল কলেজ থেকে ১৯৮২ সালে ১ম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০০২ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। ২০০৮ সালের ২২ জুন তারিখে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং আগস্ট মাস থেকে তিনি বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দের সংগঠন শাপলা ফোরাম এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন বিভাগীয় সভাপতি, অনুষদীয় ডিনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন-কানুন প্রণয়নসহ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত হন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের দ্বিতীয় ট্রেজারার হিসেবে যোগদান করেন। এ যাবৎ দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ২২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

একটি পতাকা
একটি মানচিত্র
একটি নাম
বঙ্গবন্ধু

একটি পতাকা
একটি মানচিত্র
একটি নাম
বঙ্গবন্ধু

সংকলন ও সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. মো. শওকত জাহাঙ্গীর
অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

সৃজনী

একটি পতাকা একটি মানচিত্র একটি নাম বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. মো. শওকত জাহাঙ্গীর
অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

প্রকাশনায়
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৫০৭১

নতুন মুদ্রণ
মে ২০১৮

©
লেখক

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স, ঢাকা

দাম : ৪০০ টাকা

ISBN : 978-984-8383-398-8

EKTI POTAKA EKTI MANCHITRA EKTI NAM BANGABANDHU by Prof. Dr. Md. Showkat jahangir & Prof. Dr. Arun Kumar Goswami
Published by Srizoni, 40/41 Banglabazar, Dhaka-1100
Date of Publication : February 2018, Price : Tk. 400 Only. US$: 10
e-mail : srizoni2000@yahoo.com

USA Distributor : Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor : Sangeeta Ltd., 22 Bricklane, London
অনলাইনে বই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com
অথবা ফোন করুন : Mobile : 01519521971-5
পরিবেশক : পাঠশালা, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

উৎসর্গ

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫

ইতিহাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত

বঙ্গবন্ধুসহ

পরিবারের সকলের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৯
ভূমিকা	১১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাণী	১৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাণী	১৬
বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব :একটি বিশ্লেষণ : ড. অরুণ কুমার গোস্বামী	১৭
আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি : শেখ মুজিবুর রহমান	৩৮
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র	৫১
স্বসর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ : আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক	৫৩
বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ : ফারাজী আজমল হোসেন	৫৮
শেখ মুজিব আমার পিতা : শেখ হাসিনা	৬০
স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার : শেখ হাসিনা	৬৫
জীবনে-মরণে সুখ-দুঃখের সাথী : শেখ হাসিনা	৭৪
একনজরে বঙ্গবন্ধু : মোহাম্মদ আবদুল অদুদ	৭৭
বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবন	৮০
বিবিসির শ্রোতা জনমত জরীপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	৮৪
অন্তরঙ্গ আলোকে বঙ্গবন্ধু : এবিএম মূসা	৯৩
আমার তোলা বঙ্গবন্ধুর সেই ছবিটি : পাভেল রহমান	৯৬
ঢাবিতে বিশাল প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা ১৫ আগস্ট তিনি আসবেন, এলেন না : সাইদুর রহমান	৯৮
খ্যাতিমানদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু	১০০
১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড : কাজী আব্দুল হান্নান	১০১
একটি লুঙ্গিতে মোড়ানো ছিল রাসেলের লাশ : মেজর আলাউদ্দিন	১০৯
কী অপরাধে নিহত হলেন তাঁরা? : জাহীদ রেজা নূর	১১৪
প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : এএফএম মুহিতুল ইসলাম	১১৭
শেষের সেই দিন : তোফায়েল আহমেদ	১২০
সেই রাতের কথা : হামিদা সেরনিয়াবাত	১২৩
সেই রাত্রির কল্পকাহিনী : নির্মলেন্দু গুণ	১২৬
যে হত্যার পেছনে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র : মুনতাসীর মামুন	১২৮

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা ১৩২
লন্ডনে প্রথম বিচার দাবি : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১৪০
দায়মুক্তি অধ্যাদেশে আটকে ছিল বিচারের পথ ১৪৪
বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় সর্বোচ্চ আদালতে আসামীদের আপিল খারিজ
১২ খুনীর ফাঁসি বহাল : সাঈদ আহমেদ ১৪৫
দু'টি শব্দের দ্যোতনায় আপাত অবসান প্রতীক্ষার : জাকারিয়া কাজল ১৫১
বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনীরা কে কোথায়? ১৫৪
আজ উল্লাসের নয়, কলঙ্কমুক্তির দিন বিনম্রচিত্তে নতমাথা প্রার্থনার দিন : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১৫৬
নফল নামাজ পড়ে শুকরিয়া আদায় করলেন হাসিনা ১৫৯
ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে : শেখ রেহানা ১৬০
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ছবি ১৬১
সত্যে ও ইতিহাসে ফেরার দিন : আবুল মোমেন ১৭৭
বিবেকের দংশন থেকে জাতিকে পরিত্রাণ দেবে : ফারুক চৌধুরী ১৮২
হায়েনাবিনাশী রায় : আবু হাসান শাহরিয়ার ১৮৬
জাতির কলঙ্ক মোচন : নূহ-উল-আলম লেনিন ১৯১
অপেক্ষায় টুঙ্গিপাড়া : আনিসুল হক ১৯৬
জাতি পাপমুক্ত হলো : বাহাউদ্দীন চৌধুরী ১৯৯
দিল্লির চিঠি : কুলদীপ নায়ার : হাসিনাকেই এখন তাঁর পিতার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে ২০৮
জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ছবি ২১১
বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়, প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া ২২২
বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ২২৩
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু থেকে শেষ ২২৮
পাঁচ খুনির ফাঁসি কার্যকর ২৩১
একুশ বছর পর মামলা ৩৪ বছর দায়মুক্ত জাতি ২৩৪
বঙ্গবন্ধুর কিছু স্মরণীয় উক্তি ২৩৮
কালপঞ্জি ২৩৯

মুখবন্ধ

একটি মহান মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে ঠাঁই করে নিয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিচিতির প্রণোদনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচিত হলেও বেঁচে থাকার বস্তুগত উপাদান অচিরেই এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক পরিচিতি বহুধা বিভক্ত এবং বৈচিত্র্যময়। ধর্ম, ভাষা, পেশা, শ্রেণী, আঞ্চলিকতাসহ আরও অনেক কিছুর সাথে এটি অস্তিত্বশীল। মাত্রানুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণভাবে এর প্রত্যেকটির উপস্থিতি ও স্বীকৃতি অপরিহার্য। এর কোনো একটির উপর যদি অত্যাধিক জোর দেয়া হয় তখন যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও কালক্রমে এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আমাদের অস্তিত্বকে গ্রাস করতে পারে। উনিশ শ' সাতচল্লিশে শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে স্বাধীনতা পাবার আশা তাই অচিরেই দুরাশায় পর্যবসিত হয়। ধর্মীয় পরিচিতির মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপের পরিণামে সৃষ্ট পাকিস্তানের ধর্মীয়-উপনিবেশের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য 'ভাষা'র দাবি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে।

'ধর্মীয় পরিচিতি' থেকে 'ভাষাগত পরিচিতি' সেখান থেকে স্বাধিকার তথা স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং সবশেষে নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই পথ পরিক্রমণে এদেশের আপামর জনসাধারণ গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। তবে এই সব অবদান সমন্বিত করে সফলতার সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন যিনি তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর আজীবন ত্যাগ, স্বপ্ন ও অবদান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠী একটি 'রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে' পরিণত হয়েছে—'একটি পতাকা, একটি মানচিত্র' লাভ করেছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান আর্কিটেক্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বাধীন স্বদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছর জীবিত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খুনী-ষড়যন্ত্রকারীর দল তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। দেশে না থাকার কারণে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা প্রাণে বেঁচে যান। বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুদীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর ৩৪ বছরের আকাঙ্ক্ষিত রায়—বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় ঘোষিত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সমগ্র সত্তা জুড়ে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং শাহাদাৎ বরণের কথা স্মরণে রেখে সংকলন গ্রন্থটির নাম দেয়া হয়েছে 'একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি নাম বঙ্গবন্ধু'।

প্রফেসর ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর
ট্রেজারার
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

সাংস্কৃতিক পরিচিতির প্রণোদনা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিউক্লিয়াস সূচিত হলেও বেঁচে থাকার বস্তুগত প্রয়োজন এই আদর্শের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে ধরা দিয়েছিল। বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের রাজনীতি গবেষক, পর্যবেক্ষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকৃত হবার বিষয়গুলোকে সাধারণত 'Bloody emergence of Bangladesh' হিসেবেই দেখে থাকেন। আবার 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' বা Tale of Millions বলে কেউ এর সাথে হৃদয়ের আবেগ যুক্ত করেন। ১৯৪৭-এর Freedom at Midnight থেকে ১৯৭১-এর -bloody emergence বা Tale of Millions-এ উত্তরণের পথে অনেক বিপদসঙ্কুল ও চড়াই-উৎরাই পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। যাকে 'chequered history' বলা হয়ে থাকে। এখানে কেউ Forshadowing Bangladesh নিয়ে গবেষণা করেছেন কেউ বা Pakistan : Failure in National Integration নিয়ে ব্যপৃত থেকেছেন। এটি গবেষকদের স্বাধীনতা, যে যেভাবে দেখে থাকেন। এসব কিছুর পরেও একটি কথা সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কিংবা মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার কাজটি খুবই শৈশব অবস্থায় আছে। আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

সেই কবে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপাল রাজা হয়েছিলেন তারপরে একে একে আবার কোনোরকমে খেয়ে-পরে টিকে থাকা। রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণকারী পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির অংশগ্রহণ না থাকা অথচ তার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আবেগতাড়িত হওয়া, রামপ্রসাদের রাজা হতে না চাওয়া, নেতাজীর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি, বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে দেশবন্ধুর সমানাধিকারের বক্তব্য এবং বিবৃতি, লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান নামের ধর্মীয় উপনিবেশ সৃষ্টি এসবই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস। স্বাধীনতা ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থেমে যাবার ইতিহাস। ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, শ্রেণী-পেশা ও অঞ্চল নির্বিশেষে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের ব-দ্বীপের মানুষ কী করে আধুনিক অর্থে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় হয়ে 'জনগণ' হিসেবে আবির্ভূত হলো ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় তা অনেকটা অজ্ঞাত রয়ে যায়।

জনগণের কথা সবাই বলেন। কিন্তু জনগণ বলতে কী বুঝায় তা এদেশে আলোচনা হয় না বললেই চলে। সার্বভৌমত্বের বিষয়টিও একটি বহুল আলোচিত ধারণা, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অবস্থান কোথায়? তার অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা অবহেলিত। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি রাজনৈতিক সাহিত্যে বহুল চর্চিত বিষয়। যান্ত্রিকভাবে এগুলো আওড়িয়ে অথবা

শ্রেণীকক্ষে এবং ওয়াজ মাহফিলে এসব বলে বাহবা পাবার সময় অনেক আগেই ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে তা চলছে এখনও। আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা, অল্প এবং বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম বাদে, দেশের রাজনৈতিক গতিধারার বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলনের পরিবর্তে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলীয় শ্লোগান বা কূপমণ্ডুকতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপৃত থাকেন। ধুতি পিন্দনের বিদ্বেষপূর্ণ শ্লোগান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হতে দেখা যায়। লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায় 'প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা' বিষয় পাঠদানকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক 'কপালে লাল টিপ' না পরার ফতোয়া দিয়ে সিলেবাস ও প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় উপনিবেশ পাকিস্তানের রাজনৈতিক আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রাণান্ত চেষ্টা। তবে আমাদের সৌভাগ্য তথাকথিত পণ্ডিতদের বিশ্বাস, আদর্শ ও চরিত্র উন্মোচনকারীদের অন্যতম পুরোধা কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি ঘরে জন্ম নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। বিশ্ব যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি এরকম আরও অনেক বক্তব্যের মাধ্যমে নজরুল আমাদের চেতনাকে ধারণ করে আছেন। না হলে এইসব বুদ্ধিজীবীরা একজোট হয়ে আমাদের অন্ধকারে ঠেলে দিত। মানবতা হতো ভুলুণ্ঠিত। জনগণের রাষ্ট্রে 'জনগণ' থাকত অবহেলিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত।

সাধারণভাবে গবেষকরা একমত পোষণ করেন যে, একটি জনগোষ্ঠীর পরিচিতি হচ্ছে তার সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি। বর্তমান বিশ্বে এ সম্পর্কে গবেষণার অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে 'পরিচিতির রাজনীতি'। হান্টিংটনের 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস' সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংঘাতের বিতর্কিত ও অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হলেও এর বাস্তবতা, অনেক স্থান ও ঘটনার সাথে এ দেশের কোনো কোনো গবেষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কর্মকাণ্ডেও পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচিতির সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক খোঁজার মধ্যে।

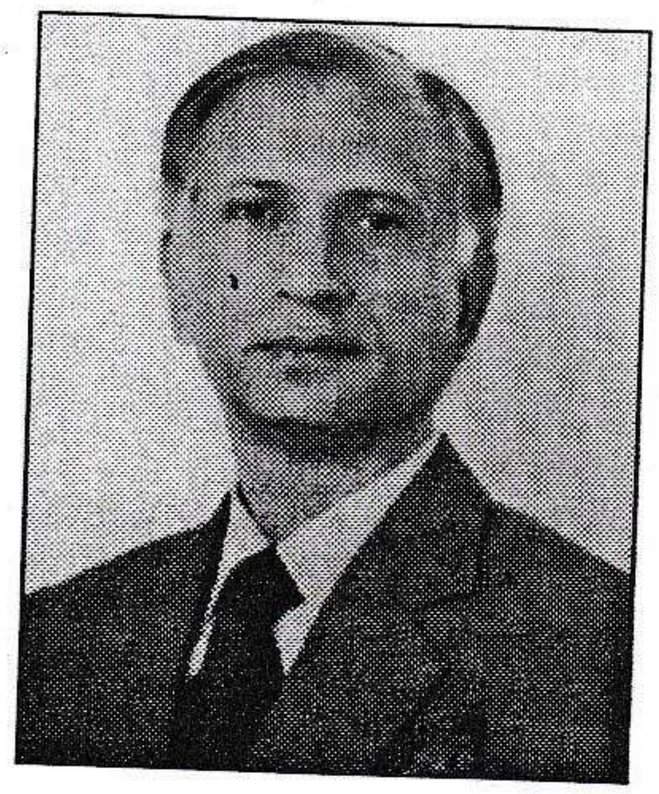
বিশেষ একটি ধর্মীয় পরিচিতি সম্বলিত নাম দেখলে ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো বিমানবন্দরে সন্দেহজনক কারণে যখন কাউকে আটক করে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা হয় তখন পরিচিতির বিষয়টি রাজনৈতিক গবেষণার পাদপ্রদীপে না এসে পারে না।

এসব ঘটনা রাজনীতি গবেষকদের জন্য 'পরিচিতির রাজনীতির' উপাদান যুগিয়ে থাকে। অমর্ত্য সেন তাঁর 'Identity and Violence, The Illusion of Destiny' গ্রন্থে যুক্তি দেখান যে একটা বিশেষ পরিচিতির ভ্রান্তি অতীতের ন্যায় বর্তমানেও সংঘাত ও সহিংসতার উৎস হিসেবে দেখা দেয়। রাজনীতি নিয়ে গবেষণার এমন বিস্তৃততর বাতাবরণে, স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে বাঙালির 'রাজনৈতিক' পরিচিতির বিষয়টিও

সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। একটি 'রাজনৈতিক সম্প্রদায়' হিসেবে এদেশে 'জনগণের' পরিচিতি ও তাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্য সবার চেয়ে 'বঙ্গবন্ধুর' ভূমিকা ও অবদান সমহিমায় ভাস্বর। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন, সংগ্রাম ও এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যার বিচার যাতে কোনোদিন না করা হয় তার জন্য করা হয় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে দেশবাসীকে সামরিক ও স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত করতে শুরু করেন। তাঁকেও কারাবন্দী করা হয়, এমনকি হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রামে অটল থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার পথ ধরে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল হয় এবং ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়। এ রায় ঘোষণার পরবর্তীকালে জাতি যখন খুনীদের ফাঁসি কার্যকর হবার অপেক্ষায় তখন আমাদের মানসপটে উদিত হয় 'ভেতো বাঙালির' 'রাজনৈতিক সম্প্রদায়' তথা 'জনগণ' হয়ে গড়ে ওঠার বিষয়টি।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব : একটি বিশ্লেষণ'। এই নিবন্ধে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে 'জনগণ' একটি রাজনৈতিক ধারণা। জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অকল্পনীয়। গণতন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানি ধর্মীয়-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তা ছিল মূলত এ দেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বিশেষ। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উত্থাপিত ৬ দফা দাবি, জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার স্মৃতিচারণমূলক লেখা নিঃসন্দেহে পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে এ লেখাগুলো পড়লে। অন্যান্য লেখাগুলোও সমৃদ্ধ চেতনার বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য এ সংকলন গ্রন্থটিতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সে কারণে পাঠকদের কাছ থেকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আশা করি। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে সংকলিত সকল লেখকদের কাছে কৃতজ্ঞতা ও সমসাময়িক পত্রিকার লেখাগুলোর জন্য দেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকীগুলোর সম্পাদক ও প্রকাশকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী
শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়



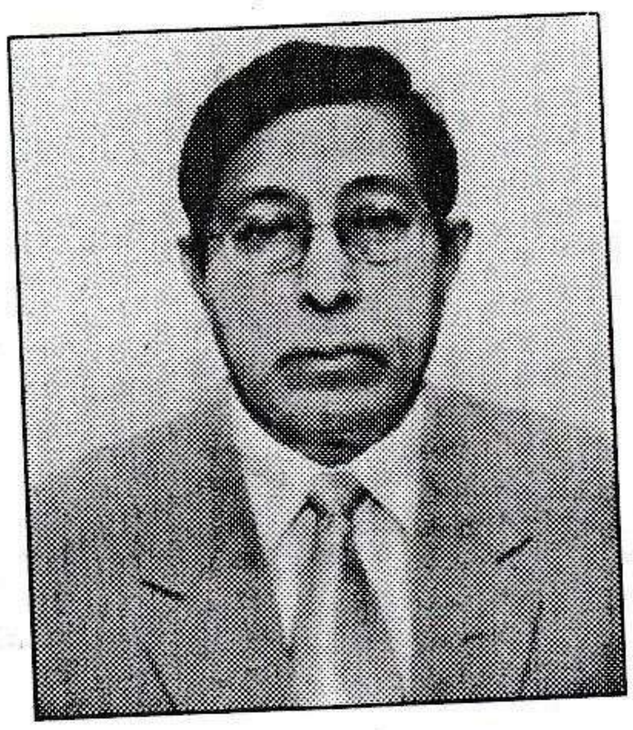
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

শুভেচ্ছা বাণী

"একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি নাম বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক গ্রন্থটি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের রায়, রায়ের প্রতিক্রিয়া, বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবন ও স্মৃতি বিজড়িত লেখা ও ছবি সম্বলিত একটি সংকলন। পাঠক ও গবেষকগণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও মননকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

(অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক)
উপাচার্য



শুভেচ্ছা বাণী

"একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি নাম বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ, কবিতা, সংবাদ চিত্র এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ সালে উত্থাপিত বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা দাবী প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষই শুধু নয় বহির্বিশ্বের সচেতন মহলও এদেশের ঘটনা প্রবাহ গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছেন। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী পাঠক ও গবেষকগণ বিশেষভাবে স্বাধীন ও মুক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে এদেশের মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য করছেন। একটি অবহেলিত, অসচেতন, শোষিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালে দীর্ঘ ২৫ বছর সংগ্রাম, আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বঙ্গবন্ধু ও জনগণের সার্বভৌমত্ব : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'-এ বিষয়টিকে তত্ত্বগতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধগুলোতে, পণ্ডিতজনের প্রতিক্রিয়ায় ও সংবাদচিত্রে-এর প্রতিফলন উপলব্ধি করা যায়। প্রবন্ধ, কবিতা ও সংবাদচিত্র সম্বলিত "একটি পতাকা' একটি মানচিত্র, একটি নাম বঙ্গবন্ধু" সংকলন গ্রন্থটির মাধ্যমে পাঠক বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ইতিহাস, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশ আরও সমৃদ্ধি লাভ করুক এই কামনা করছি।

(অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ)

উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ও জনগণের সার্বভৌমত্ব : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ *

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.

Mathew Arnold, "Dover Beach".

'সত্য অনেকে গ্রহণ করে, অনেককে ক্ষুব্ধ করে। ক্ষুব্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অনেকে, অনেকে আবোল-তাবোল বলে, কুৎসা ছড়ায়, অসত্যের আশ্রয় নেয়। মূল প্রসঙ্গ এতে হারিয়ে যায়। তাই কুৎসা ও অসত্যের বাহাসে না গিয়ে মূল প্রসঙ্গে থাকাই সঠিক কাজ।'

(বিজ্ঞানী গালিলিও গালিলেই
(১৫৬৪-১৬৪২ খ্রি.)

স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনার বিষয়টি অবহেলিত। যদিও অধুনা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বের ক্রীয়াশীলতা এক্ষেত্রে কদাচিৎ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কারণ নির্বাচন হচ্ছে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের সার্বভৌমত্বের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড নির্বাচনের দ্বারা বৈধতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নির্বাচনের বাইরে জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা বেশি দূর অগ্রসর হতে দেখা যায় না। জনগণের রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্বই প্রধানতম বিষয়, সেক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আলোচনার অবহেলা প্রকারান্তরে অন্ধকারময়তার জন্ম দেয়। অমর্ত্য সেনের কথার শব্দান্তর করে বলা যায়, The neglect...obscures the world in which we live[১]. সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণই সব ক্ষমতার উৎস অর্থাৎ এদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। জনগণের সার্বভৌমত্বের এই সাংবিধানিক স্বীকৃতি সম্ভব হয়েছে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের ফলে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সংবেদনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা। পাকিস্তানী ধর্মীয় ঔপনিবেশিক শাসনামলে জনগণের সার্বভৌমত্ব কখনো বাস্তবতার রূপ দেখে নাই। সে সময়ে জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি আন্দোলনের দাবি হিসেবে ঝুলে

* প্রবন্ধটি ২০০৯ সালের 'জাতীয় শোক দিবসে' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত।

থাকত। সবশেষে একবার ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপারটির একটি সুরাহা হওয়ার আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বভাবসিদ্ধ চেতনা অনুযায়ী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হয় নাই। ফলে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার" আহ্বানের মধ্য দিয়ে সে সময়ের বাঙালি জনগণের চেতনা ও সর্বোপরি ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। জনগণের সার্বভৌমত্বের এই চরম প্রকাশ সম্ভব হয়েছে বহুধাবিভক্ত বাংলাদেশের জনগণকে একত্রিত করে মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কারণে। এই কারণের পিছনে এদেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি, উল্লেখযোগ্য হিসেবে অনেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, নেতা ও ঘটনা জড়িত থাকলেও একজন নেতা এই সবকিছুকে সফলভাবে সমন্বয় করতে ও নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তিনি হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে মূলত বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব চিরতরে স্তব্ধ করা যায় না। কারণ জনগণের সার্বভৌমত্ব একটি অব্যাহত বিষয়। আবার এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে আন্দোলন, সংগ্রাম ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার সাথে সাথে এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের গুরুত্বের প্রাসঙ্গিকতা সজীব হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান স্বকীয়তায় ভাস্বর। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি এ দেশের জনগণকে "আমার মানুষ", "বাঙালি" প্রভৃতি অভিধায় সম্বোধন করে তাদের দুর্দশা বা তাদের রক্ত ঝরা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ভাষণে তিনি জনগণের ওপর শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতন এবং এর প্রতিবাদে বাঙালিদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিজের সুদীর্ঘ সংগ্রামী প্রচেষ্টার কথা অনবদ্যভাবে বর্ণনা করে স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। শুধু এই ভাষণই নয়, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনই প্রকৃতপক্ষে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল উৎসর্গীকৃত। পঁচাত্তর পরবর্তীকালের বাংলাদেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি, ১৯৭২ সালে যখন সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা ছিলেন তখন ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চের (অধুনালুপ্ত) দৈনিক বাংলায় "একটি জাতির জন্ম" শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে যা বলেন তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক,

> ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিনগুলিতে যখন পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল তখন সমগ্র জাতি বঙ্গবন্ধুর দিকেই তাকিয়ে ছিল। জাতি বঙ্গবন্ধুর আদেশের অপেক্ষায় ছিল।
>
> এই দুর্যোগের সময় বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালীদের দাবী-দাওয়ার সাথে আপোষ না করে যেভাবে অনড় ছিলেন তাতে করে তিনি বাঙ্গালীদের কাছে কিংবদন্তীর মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময়টায় তিনি ছিলেন বাঙ্গালীর মুকুটহীন সম্রাট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল[২]।

একদিকে জনগণের সার্বভৌমত্বে আস্থাবান বাঙালি ও তাদের সমর্থকগণ, অপরদিকে অস্পষ্ট এবং অব্যাখ্যাত চেতনায় উদ্বুদ্ধ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকগণ এক ব্যাপক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। কারণ জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ব্যতীত রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক বৈধতা আসে না। সে হিসেবে একাত্তরে বঙ্গবন্ধু যে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন সেই যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বৈধতা আনা। ডেভিড ম্যাকক্রোনের ভাষায় 'Without this bonding of people to state, it could not have achieved political legitimacy to its activities[৩].'

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গভীর রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পরিণতিতে খণ্ডিত ও বিকৃত চেতনায় তাড়িত পাকিস্তানি পক্ষ পরাজিত হয় এবং তাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যায়। জনগণের সার্বভৌমত্বে আস্থাবান বাঙালি জয়লাভ করে। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা... একটি ধ্বংসস্তূপ আকারে, অপার সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে স্থান করে নেয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া একটি দেশকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করে। বিজয় দিবস পূর্তি হবার মাত্র এক বছরের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়; শত ষড়যন্ত্রের মধ্যেও দেশ গড়ার কাজ দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যেতে থাকে; ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছার কারণে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হয়; পাকিস্তানি বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভারতে আশ্রয় নেয়া ১ কোটিরও বেশি স্মরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়; নতুন সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের মার্চে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; সমুদ্র বন্দর, রেল যোগাযোগ, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন এবং অবকাঠামো পুনর্বাসন করা হয়; সমাজ উন্নয়নের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের কর্মকাণ্ডের কারণে মানুষের মনে ক্রমান্বয়ে দেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্ব যখন ইতিবাচকভাবে পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল সেই পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

রক্তার্জিত স্বাধীনতার মাত্র প্রায় সাড়ে তিন বছর পর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টার পর থেকে জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কীয় আলোচনার প্রতি তাৎপর্যপূর্ণ অবহেলার পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনার স্থানটি দখল করে নেয় কিছু উদ্ভট অমানবিক ও সংকীর্ণ

যুক্তি, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করবে', 'কিছু গাদ্দার পাকিস্তান ভেঙ্গেছে', 'ধর্মীয় উগ্রতার দ্বারাই কেবল মুক্তি অর্জিত হতে পারে', 'স্বাধীন বাংলাদেশ লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন', 'পাকিস্তান ভালো ছিল', 'সামরিক শাসনের দরকার আছে', 'ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন আছে', 'ধর্মনিরপেক্ষতা অপ্রয়োজনীয়', 'গণতন্ত্র ঈশ্বরের আইনের পরিপন্থী', 'ফতোয়াকে বৈধতা দেয়া উচিত', 'নারী নেতৃত্ব ক্ষতিকর', এবং 'ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার বৈধ' প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা। এইসব আলোচনার প্রতি গুরুত্ব এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবহেলার আনুষঙ্গিক অনেক দুঃখজনক দিক আছে যেগুলো আমাদের কলঙ্ককে প্রলম্বিত করছে যেমন পাকিস্তানি চেতনায় তাড়িত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাক্তন সামরিক শাসক ও সেই ক্ষমতাসীন শাসকদের দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক দলের শাসককুল হাজারো রহস্যময়তার বেড়াজালে এড়িয়ে যেতে চান বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান। অথবা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো করে দেখার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। অথবা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার মতলব করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের যাতে বিচার না হতে পারে তার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পুনর্বাসিত করেন। এইসব কিছু করে প্রকৃতপক্ষে জনগণের সার্বভৌমত্বের ক্রীয়াশীলতার বিষয়টিকে কৌশলে এড়িয়ে যাবার অপচেষ্টা চালানো হয়। যদিও জনগণের সার্বভৌমত্ব অব্যাহতভাবে বজায় থাকার স্বাভাবিক প্রকৃতির কারণে ১৯৯০-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল পরিণতি লাভ করে। পরবর্তীকালে এর চলমানতার কারণে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদে বাতিল হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু বিচারের রায় কার্যকর না করার প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে জনগণের সার্বভৌমত্ব বিরোধী প্রবণতার প্রতিফলন যা গণতন্ত্রকে বিঘ্নিত করে। জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলোচনার অবহেলা মানুষের মনে ধর্মীয় বিভেদ, আঞ্চলিক বিভেদ, সংকীর্ণতা, অপরাধ প্রবণতা, দুর্নীতিগ্রস্থতা প্রভৃতির জন্ম দেয়। অপরদিকে জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, সততা ও ন্যায্যতার প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতির জন্ম দিতে পারে। প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্সে যেমন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস "ন্যায়বিচার" অনুসন্ধানের জন্য তাঁর শিষ্যদের সাথে যে সংলাপ করেছেন মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তা এক চিরন্তন উৎস হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার জন্য একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তেমনি অনস্বীকার্য। ক্ষতিকর মূল্যবোধ বিদায় করে মানবিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য প্রয়োজনীয় ও সঠিক গুণাবলী মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং এই ক্ষেত্রে নেতা হিসেবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান সম্পর্কীয় আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এবং এই অবস্থান মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার বিষয়টি মূলত ইতিহাস নির্ভর তাই যে ঐতিহাসিক পথ পেরিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধটির অবয়ব সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে এটিকে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান অনুসন্ধান করে এ সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

মৌলিক ধারণাসমূহের সংজ্ঞা

জনগণ ও জনগণের সার্বভৌমত্ব

অনুসন্ধানের শুরুতেই জনগণ বলতে কী বোঝায় এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব কী তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। জনগণের ইংরেজি প্রতিশব্দ পিপল। জনগণ একটি ভারসাম্যমূলক, সমষ্টিগত ও সমন্বিত রাজনৈতিক ধারণা। একটি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম, পেশা, শ্রেণী, স্তর, বয়স, লিঙ্গ প্রভৃতির 'সমষ্টিগত' ও 'সমন্বিত' যে রাজনৈতিক রূপ তাই হলো সেদেশের জনগণ। এই 'সমষ্টিগত' ও 'সমন্বিত' রাজনৈতিক রূপের অনেক উপাদানের মধ্য থেকে শুধু কোনো একটির দিকে যদি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে সেখানে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়, যা প্রকারান্তরে একটি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। আর সেই অস্থিতিশীলতা রাষ্ট্রের জন্য চরম ও স্থায়ী ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। নিকট অতীতে যেমন হয়েছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। যেখান থেকে শারীরিক ও আদর্শিকভাবে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ।

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বাগ্মী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং ল্যাতিন ভাষায় বিখ্যাত গদ্য রচয়িতা মার্কুস টুল্লিয়াস সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) রাষ্ট্রকে দ্যা অ্যাফেয়ার অব দি পিপল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে জনগণ হচ্ছে একটি স্ব-শাসিত সংগঠন যার নিজেকে টিকিয়ে রাখা এবং এর অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার ক্ষমতা আছে : স্যালাস পপুলি সুপ্রিমা লেক্স এস্টো। (A people is self-governing organization, which has necessarily the powers to preserve itself and continue its existence : Salus populi suprema lex esto)[৪]

রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন সঠিক ও আইনগতভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কর্পোরেট ক্ষমতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এডমান্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭ সাল)-এর মতে জনগণ হচ্ছে একটি সংগঠিত গোষ্ঠী : এর একটি ইতিহাস এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠান আছে, প্রথানুযায়ী কর্মানুষ্ঠানের পদ্ধতি, অভ্যাসগত কর্তব্যনিষ্ঠা, আনুগত্য এবং কর্তৃত্ব আছে। এটি হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ "সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যক্তিগত অবস্থা" (Politic Personality) জনগণ ব্যক্তিগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর ব্যক্তিবর্গ যে-কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে অসংখ্যবার 'জনগণ' পদবাচ্যটি ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'জনগণ'ই ছিল তাঁর চেতনার উৎস। তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত হত 'জনগণের' সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সুর। 'জনগণে'র চাওয়া-পাওয়ার কথাই ছিল তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতির সারমর্ম। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি। উনিশ শ' একাত্তরের আঠাশে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের লনে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু এবং (১৯৭০ সালের নির্বাচনে) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যদের সম্মানে ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, "...উন্নত জীবনের আশাতেই জনগণ সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল। কিন্তু তার জায়গায় এ পর্যন্ত তারা এমনভাবে শোষিত হয়েছে যে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গেছে।...।" হাজার বছর যাবত এদেশের জনগণের ওপর চলে আসা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা আর দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির পথরেখা অঙ্কন করে দিয়েছে।

অপরদিকে, সার্বভৌমত্ব অর্থ হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট[৫] অবস্থায়। ফরাসি জ্যুরিস্ট জ্যাঁ বোঁদা ১৫৭৬ সালে আইন ও পাবলিক পলিসি বিষয়ে Six Livres de la Republique শীর্ষক গ্রন্থে সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে সার্বভৌম হচ্ছেন তিনি যিনি আইনের ব্যতিক্রম নির্ধারণ করেন, অপরদিকে ম্যাজিস্ট্রেসি শুধু এটি বাস্তবায়ন করে। বোঁদার মতে সার্বভৌমত্ব একসময় রাজার উপর অর্পিত ছিল, এখন এই (সার্বভৌম) ক্ষমতা জনগণের মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রধানত নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য অ্যাপারেটাসের দ্বারা অনুশীলন করা হয়ে থাকে।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বিতর্কের একটি অন্যতম ঔৎসুক্যের দিক হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মহান সর্বশক্তিমান স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের ধারণার অবতারণা। বিশেষতঃ স্রষ্টার আইন হিসেবে আখ্যায়িত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণী অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা সম্পর্কে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী। যেখানে বলা হচ্ছে, মহান স্রষ্টাই সার্বভৌম। আর স্রষ্টার বিধানই হবে শাসনের অন্যতম অবলম্বন। তবে এখানেও মনে রাখা সঙ্গত হবে যে, মহান স্রষ্টা স্বয়ং কিন্তু কখনো শাসনকার্য পরিচালনা করেন না বা করবেন না। স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের বিধানাবলী কার্যকর হবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, এটাই বাস্তব। তাই স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের কথা বলে শাসক যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে যিনি বা যারা সার্বভৌম স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন তিনি তা সঠিকভাবে করছেন কী না তার জন্য জবাবদিহিতা না থাকলে শাসকের কর্মকাণ্ডের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব না। মৃত্যুর পরে স্বর্গ বা নরকের ব্যাপারটি না হয় স্রষ্টা স্বয়ং ব্যবস্থা করলেন কিন্তু এই মর্ত্যলোকের যে 'জনগণ' ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শাসনের ভূক্তভোগী তাদেরও তো বোঝাপাড়ার ব্যাপার আছে। তাদের জন্য কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়, এগুলোর ভুক্তভোগী যেহেতু তারাই সেহেতু এ সম্পর্কে তাদের মতামত

জরুরি। শাসন সম্পর্কে জনগণের এই মতামত প্রকাশের জন্য আধুনিক যুগে গণমাধ্যম এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান অন্যতম। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্ট। নির্বাচিত পার্লামেন্টে শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়। আর এখানেই, এমনকি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষেও জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে উৎসারিত যেখানে একটি রাষ্ট্র আর একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এই নীতি অনুযায়ী প্রতিটি স্বাধীন জাতীয়-রাষ্ট্র সার্বভৌম। এখানে সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় আইনকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেবে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এমন ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে কোনো ধরনের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। যেমন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মধ্যে বাঙালিদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বাঙালি জনগণের উপর ঔপনিবেশিক অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার কারণে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠার চূড়ান্ত মুহূর্তে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বহির্বিশ্বের কাছে পাকিস্তানি ধর্মীয় উপনিবেশের শাসকগোষ্ঠী এটিকে তাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মানিয়ে নেয়াতে ব্যর্থ হয়েছে। ওয়েস্টফেলিয়ান নীতি এখানে কাজ করতে পারে নি। আর তাই ত্রিশ লাখ বাঙালির অমূল্য প্রাণ, দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জত এবং প্রায় তের হাজার ভারতীয় সৈন্যের আত্মাহুতির বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জন্ম নেয়। যে রাষ্ট্রে জনগণই সবকিছুর নিয়ামক শক্তি।

মেরী পার্কার ফোলেট বলেন, যদি কোনো রাষ্ট্র সকলকে নিয়েই এক জনগণ গঠন করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে কেবল তাকেই সার্বভৌমিক বলা যায়। রুশো তাঁর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টির যে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন সেখানে 'জনগণের' অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এই চুক্তি মূলত রাষ্ট্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তি হচ্ছে একটি বন্ধন। একটি সার্বভৌম জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সৃষ্টি হয় এক অভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির সদস্য হিসেবে একত্রে বসবাসের সদিচ্ছা থেকে। এ প্রসঙ্গে র‍্যান্নি ও কেন্ডল বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্ভব, যদি এর সদস্যদের একত্রে বাস করার ইচ্ছা অন্ততঃপক্ষে তাদের স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী-স্বার্থ চরিতার্থের বাসনা অপেক্ষা দুর্বল না হয়। রুশোর মতে, এটা (সার্বভৌম ক্ষমতা) এমন এক উপরের আবরণ যা (একটি জাতির) বিভিন্ন অংশের সকল মানুষকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। র‍্যান্নি ও কেন্ডল এবং মেরী পার্কার ফোলেট-এর বক্তব্যের পথ ধরে জনগণ বা পিপল সম্পর্কে রুশোর মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো, একটি জাতির বিভিন্ন অংশের সকল মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করার মাধ্যমে যে সত্তা গড়ে ওঠে তাই হলো 'জনগণ'। সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে সেই ক্ষমতা যা ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করে 'জনগণে' রূপান্তরিত করে।

নেতৃত্বের ধারণা

স্মরণাতীত কাল থেকে নেতা ও নেতৃত্ব রাজনীতি বিবেচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিয়মবদ্ধ গবেষণা এখনো অঙ্কুরেই রয়ে গেছে। যেমন বার্নস (১৯৭৮ : ২) বলেন, পৃথিবীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সর্বাধিক পর্যবেক্ষণকৃত অথচ সবচেয়ে কম অনুধাবনকৃত একটি বিষয়। (Political leadership is one of the most observed but least understood phenomenon on earth) এর আংশিক কারণ হচ্ছে নেতৃত্ব কী এবং এই ধরনের নেতৃত্ব চর্চার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট সে সম্বন্ধে ঐকমত্যের অভাব। নেতৃত্ব সম্পর্কে মতভেদের আর একটি কারণ হচ্ছে যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব অধ্যয়ন করছেন তারা নেতা এবং নেতৃত্ব দেখেন ভিন্ন ভিন্ন সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এবং তাদের মনে থাকে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য। এটি সেই প্রবাদের অন্ধ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক হস্তির শুধু এক-একটি অঙ্গ অনুভব করার মতো, বিশাল হস্তির শুধু একটি অঙ্গ অনুভব করে যারা প্রত্যেকেই মনে করেন যে তিনি যা অনুভব করছেন সেটাই হচ্ছে একটি সামগ্রিক অবস্থা। কিন্তু যে কোনো নেতৃত্ব বুঝতে হলে নেতৃত্বের উপাদানগুলো বুঝতে হবে। মার্গারেট জি. হারম্যান (১৯৮৬)[৬] তাঁর "ইনগ্রিডিয়েন্টস্ অব লিডারশীপ" শীর্ষক নিবন্ধে নেতৃত্বের পাঁচটি উপাদান উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে;

(১) নেতার ব্যক্তিত্ব এবং পটভূমি একইসাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া যার দ্বারা তিনি নেতা হয়েছেন;
(২) যে গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গকে নেতা নেতৃত্ব দেন তার বৈশিষ্ট্য;
(৩) নেতা এবং যাদেরকে নেতৃত্ব দেয়া হচ্ছে এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি;
(৪) যে প্রেক্ষাপট এবং অবস্থায় নেতৃত্ব দেয়া হচ্ছে সেটি; এবং
(৫) নেতা এবং তিনি যে সুনির্দিষ্ট অবস্থায় যাদেরকে নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে সম্পর্ক।

কোন ধরনের নেতৃত্ব আমাদের আছে তা নির্ভর করছে এই পাঁচটি উপাদানের প্রকৃতি এবং সংমিশ্রণের উপর। যে কোনো ধরনের খাবারের বেলায় যেমন, তেমনি বিচিত্র ধরনের সব ফলাফল পাবার জন্য এইসব মৌলিক উপাদানগুলোর সংমিশ্রণ ঘটানো যায় বিভিন্ন ভাবে। যে কোনো দেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা তথা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সেদেশের নেতার একটি ভূমিকা থাকে। সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক জন মিল্টনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী জনগণ হচ্ছে একজন প্রাকৃতিক এলিটের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি সম্প্রদায়।৭

প্রকৃতপক্ষে মিল্টন রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে ওঠা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে জনগণ বলে অভিহিত করেছেণ। মিল্টনের মতে 'নেতৃত্ব' এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সফলতা লাভ করার প্রধান ক্রীড়নক। এই যুক্তির ধারা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অধিবাসী মানুষ 'জনগণ' হিসেবে গড়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। কারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন ও

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবার পরেই কেবল রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণী-পেশা, স্থানীক পরিচিতি, প্রভৃতি নির্বিশেষে এদেশের মানুষ 'জনগণ' অভিধায় অভিষিক্ত হতে পেরেছে।

অপরদিকে মিল্টনের এই উক্তির মধ্যে যদিও প্রাকৃতিক এলিটের উপাদান সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই তবে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা নেতা ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং এই প্রাকৃতিক এলিট তথা নেতার উপাদান হিসেবে আমরা হারম্যান যে উপাদানের কথা বলেছেন সেগুলোকেও গ্রহণ করতে পারি। এটি সত্য যে একটি দেশের 'জনগণ' সেই দেশের সাথে নিজেদের পরিচিতি এক করে দেখেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সার্জেন্ট এটিকে জাতীয় সচেতনতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বলা বাহুল্য, জাতীয় সচেতনতা এবং জাতীয় পরিচিতি, দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান।

সীমাবদ্ধতা

এই নিবন্ধে অনেক সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা যেতে পারে তবে প্রধানতম সীমাবদ্ধতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বিশ্লেষণের বিষয়ে প্রসঙ্গান্তর না ঘটানোর অবস্থান। যেমন হারম্যান কর্তৃক উল্লেখিত নেতৃত্বের উপাদানগুলোর আলোকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে বিবেচনা করার প্রচেষ্টা এখানে করা হয় নি। তবে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব' শীর্ষক নিবন্ধে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও নেতৃত্বের ধারণা সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সেই তৃষ্ণা কিছুটা হলেও মেটানোর জন্য নেতৃত্ব সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে নেতৃত্বের উপাদানের আলোকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব। বাংলাদেশের রাজনীতি গবেষক বিশেষত বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি (বারাস)-এর সম্মানিত গবেষকদের জন্য এটি গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। তাঁরা তাদের মূল্যবান সময় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে গবেষণার জন্যও নিয়োগ করবেন এই আশা করা অযৌক্তিক নয়। বিশেষত যারা ছাত্রজীবনে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শের স্মৃতি রোমন্থন করে থাকেন তাদের জন্য এটি একটি নৈতিকদায়িত্বই শুধু নয়, এটি তাদের এবং আমাদের সকলের ঋণ। বঙ্গবন্ধুর কাছে এই ঋণ অপরিশোধ্য কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসেবে কিছুটা হলেও এ গবেষণা কর্মের দ্বারা আমরা এ ঋণের কথা অন্তত স্বীকার তো করতে পারি।

জনগণের সার্বভৌমত্ব ও বাংলাদেশ

জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টার পথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য জনগণের সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যান্য অধ্যায় বা অনুচ্ছেদের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে 'জনগণের সার্বভৌমত্বের' প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই চার মূলনীতির ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গে ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই বঙ্গবন্ধুর সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিল্লুর আর. খানের সাক্ষাৎকারের বিষয় উল্লেখ করা যায়। বঙ্গবন্ধু বলেন, গণতন্ত্র মানে হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার সুপ্রিমেসি; শাসিতের সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত সরকার; এবং জনগণের জন্য অন্যান্য জনপ্রিয় স্বাধীনতা যা হৃদয় ও মনের বিকাশের জন্য প্রয়োজন। অন্যরা গণতন্ত্রের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং এভাবে গণতন্ত্রের অসংখ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব। গণতন্ত্রের প্রতি আমার আস্থার পাশাপাশি আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, একটি শোষণমুক্ত সমাজেই কেবল গণতন্ত্র কার্যকর থাকতে পারে। আর এই জন্যই প্রয়োজন সমাজতন্ত্র। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের সব ধর্ম সমান মর্যাদায় টিকে থাকবে এবং তাই ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা সব ধর্মের স্বাধীনতা বুঝায়। আর আমি এটাও চাই যে বাংলাদেশের মানুষ বাঙালি সংস্কৃতি, ভাষা, লোককাহিনী এবং সাধারণ বাঙালি পরিবেশ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা গ্রহণ করুক। এই ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সোনার বাংলা গড়ার কাজে বাঙালিদের মটিভেটিং শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আর এটাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ।[৮]

মূলত স্বাধীনতা তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা আস্তে আস্তে জাগ্রত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে কাজ করেছে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক দলের নেতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠনে মতিলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষ বোস, জওহারলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু সেদেশের অন্যসব নেতার অবদান মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমন্বিত হয়ে সেদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস একসময় ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করতে পারেনি। কংগ্রেসের কোনো শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকায় এই দলটি আন্দোলন সংগঠনে তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। প্রধানত শহুরে স্বল্প শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত এমন ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতৃত্বের ছিল না তেমন কোনো ব্যাপক বিস্তৃত অনুসারী গোষ্ঠী অথবা সাংগঠনিক সমর্থন। এ সময় উদার নিয়মতান্ত্রিক এবং চরম উগ্রপন্থী উভয় ধরনের নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশে এক ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আর এই শূন্যতা পূরণ হয় ভারতীয় রাজনীতিতে একজন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে (গোস্বামী ২০০৭:২৩৪)[৯]।

জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে সেদেশে তাঁকে বাপুজী বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি ভারতের জাতির পিতা। ভারতে যেমন মহাত্মা গান্ধী তেমনি বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভূমিকা অনন্য। আর তাই তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতা।

১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে সার্বভৌমত্বের নীতি অনুযায়ী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হতে থাকে। সে সময় অর্থাৎ ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে এদেশে নবাব, আর বারো ভূঁইয়াদের শাসন ছিল। যদিও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো বিদেশি ধারণা নয় । সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বিশেষত: কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" বারংবার বলা হয়েছে যে, 'রাজাকে অবশ্যই জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে' (নেহেরু ১৯৪২ :১৯৯৯)[১০]।

আবার মাৎস্যন্যায়ের বৈরী পরিবেশ থেকে মুক্ত হবার জন্য গোপালকে রাজা নির্বাচিত করার অভিজ্ঞতা বাংলায় গণতন্ত্রের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে দেখা যেতে পারে। ইতিহাসের পাতা থেকে এদেশে জনগণের সার্বভৌমত্বের এইসব প্রাচীন নিদর্শন হাজির করা গেলেও স্বাভাবিক পরিবেশে সুদীর্ঘকালব্যাপী এদেশে রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের অনীহার উদাহরণও সুবিদিত। বর্তমানে প্রচলিত জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি ইংরেজ আমলের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এমনকি ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের সেনাবাহিনীর সাথে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বাহিনীর যে যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে বাঙালিদের কোনো অংশগ্রহণই ছিল না। এখানে পক্ষে-বিপক্ষের সবাই ছিল অবাঙালি অথচ পলাশীর যুদ্ধ ছিল একটি ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ। বলা হয়ে থাকে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ থেকে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। অথচ বাস্তব কথা হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা তখনকার বাংলায় ছিল অনুপস্থিত। জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে যেখানে বলা হচ্ছে 'চাই না মাগো রাজা হতে, রাজা হবার স্বাদ নাই মা, পাই যেন দু'বেলা খেতে...'। এর দ্বারা বোঝা যায় এদেশের মানুষ নিজের দেশ শাসনের নিমিত্তে রাজা হতে চায় না, তাই বিদেশিদের শাসনে তাদের অনাপত্তিটা সহসাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সে সময়ের বাংলার জনগণ শাসনকার্য সম্পর্কে তেমন একটা আগ্রহী ছিল না।

বর্তমান অর্থে জনগণ হয়ে ওঠার আগে বিশ্বের এ অঞ্চলের মানুষের ওপর নিকট অতীতে পাকিস্তানী ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের পরিচালিত শোষণের বিষয়টি সুবিদিত। তবে এর অনেক অনেক আগে থেকে এদেশের জনগণের ওপর অনেক অত্যাচার আর দুঃখ-কষ্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। আর বাঙালিদের তা মুখ বুজে সইতে হয়েছে। কখনো কখনো হয়তো এর একটা প্রতিকার হয়েছে কিন্তু তা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। এ ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসের মাৎস্যন্যায়ের সময়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইতিহাসবিদ্ তারনাথ একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি এরকম সেকালের বাংলাদেশে বহুদিন যাবত অরাজকতার ফলে জনগণের দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। এর প্রেক্ষিতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মিলিত হয়ে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। কিন্তু রাজা রাত্রিতে এক কুৎসিত নাগ রাক্ষসী কর্তৃক নিহত হন। এরপর প্রতিরাত্রিতে একজন করে নির্বাচিত রাজা ঐ রাক্ষসী

কর্তৃক নিহত হতে থাকেন। অবশেষে চুণ্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়িতে আসে। সেই বাড়ির সকলে খুব বিষণ্ন ছিল। কারণ ঐদিন নির্বাচিত রাজা হবার ভার পড়েছে ঐ বাড়িরই এক ছেলের ওপর। আগন্তুক ওই ছেলের স্থানে রাজা হতে রাজি হন। সে এক রুদ্ধশ্বাস ঘটনা। সবাই ভাবে আগন্তুক রাত্রে রাক্ষুসী কর্তৃক নিহত হবে এবং প্রত্যুষে তার লাশ পাওয়া যাবে। কিন্তু পরদিন সকালে তাকে বেঁচে থাকতে দেখে সব মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। কীভাবে তিনি নাগ রাক্ষসীর হাত থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হলেন তা জানতে চাইলে তিনি জানালেন, ...রাত্রে নাগ রাক্ষুসী তাকে মারতে এলে তিনি চুণ্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত এক লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করেন এবং তাতে রাক্ষুসী মরে যায়। তার এই অভূতপূর্ব যোগ্যতার কারণে মানুষ আনন্দিত হয় এবং তাকে রাজা নির্বাচিত করে এবং তার নাম দেয়া হয় গোপাল। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো দুঃসময় অতিক্রম করার জন্য বাঙালি গণতন্ত্রকেই আঁকড়ে ধরেছে। যদিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ খুব একটা পরিদৃশ্যমান হত না। যেমন জনগণের সমর্থনপুষ্ট গোপাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। খালিসপুর লিপির শ্লোক আর তারনাথের লেখার ওপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাস অনুযায়ী রাজা গোপাল বাংলাদেশে এক বাঙালি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার এটিও একটি শক্তিশালী মত যে, রাজা গোপাল যেহেতু জনগণের সমর্থনক্রমে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি গণতন্ত্রের একটি উদাহরণ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাজা গোপালের শাসনকাল তথা এদেশে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত শাসনকাল ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কোনো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি, দেশীয় শিল্প, কৃষি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দেশের জনগণকে দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। এ সময় ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থায়ী করা। এ দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে ইংরেজদের কোনো নজর ছিল না। এ দেশের জনগণকে তারা খুব নিচু মনে করত এবং 'কালার্ড' জনগণকে শাসন করার জন্য 'সাদা মানুষের বোঝা' (হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন)-এর মতো তত্ত্বের কথা প্রচার করত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজের অধঃপতন এবং ঐক্যের অভাব এবং জনগণের মধ্যে জাতীয় সচেতনতার অভাব প্রভৃতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আসা ইংরেজদেরকে এ দেশে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশরা সমগ্র উপমহাদেশের প্রশ্নহীন প্রভুতে পরিণত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশরা যখন এদেশে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করতে ব্যস্ত ছিল সে সময়টা এ দেশের জন্য অন্ধকারতম ইতিহাস হিসেবে গণ্য হত। সাংঘাতিকভাবে স্তরবিন্যাসকৃত সমাজ এর সাথে বিভিন্ন পদসোপান এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রথা এবং রীতি-নীতি, নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণবিধি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অধীনস্ত করে তুলেছিল। এ অবস্থায় একজন

ব্যক্তি, যে ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে জনগণ গড়ে ওঠে, সম্পূর্ণ অসহায় ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। ফলে সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতে জনগণ বিচ্ছিন্ন, শোষিত এবং নির্যাতিত হচ্ছিল। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যথার্থই বলেছেন যে জনগণের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন দেশে জাতীয় সচেতনতা জন্ম ও বিস্তারকে বাধাগ্রস্ত করেছে। সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক কড়াকড়ি নিয়মকানুন ও প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য চরমভাবে স্তরীকৃত সমাজকে অব্যাহতভাবে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনা দূরীকরণের জন্য জনগণের মধ্যে ঐক্য এবং জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার এ দেশের শিক্ষিত মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে সাহায্য করেছে। ইংরেজি শিক্ষা এ দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিয়মকানুন দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সামাজিক ক্ষেত্রের সচেতনতা সহসাই রাজনৈতিক সচেতনতায় পর্যবসিত হয়। আর এই রাজনৈতিক সচেতনতাই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। রাজনৈতিক সচেতনতার কারণেই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ ধরে এদেশে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণা জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে।

রাজনৈতিক দলের নেতাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড, ব্রিটিশ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইন এবং এই আইনের আওতায় অথবা আইনকে অমান্য করে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামের দ্বারা এ দেশের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হবার সাথে সাথে এদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথ করে নিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীনের উপমহাদেশে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। সর্বভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে নিজেদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অসমর্থ কংগ্রেসের পাশাপাশি মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা সব মিলিয়ে ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে ভারত ও পাকিস্তান নামে উপমহাদেশে দু'টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশরা চলে যাবার পর থেকে পাকিস্তানের শাসনাধীনে বাংলাদেশ ছিল প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের ধর্মীয় উপনিবেশ। ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাতের পাশাপাশি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক প্রভৃতি দিক দিয়ে বাঙালিদের ওপর চলে সীমাহীন বঞ্চনার মহড়া। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, সংগঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করে। ভাষা আন্দোলন থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে দেখব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মকভাবে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে যাচেচ্ছন। কারা নির্যাতন ভোগ করছেন। তিনি তাঁর মাতৃভাষা বাংলাকে, বাঙালি জাতিকে এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তিনি

বলতেন, "ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলাদেশ আমার দেশ।" তাঁর সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিক সিরিল ডান বলেন, "বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর দীর্ঘ শালপ্রাংশু দেহ, বজ্রকণ্ঠ, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার বাগ্মিতা এবং জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে।" ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, এবং সবশেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-এর প্রতিটি স্তরে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছেন।

হেগেলের মতে জনগণের ইতিহাস হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যেখানে এটি সমগ্র মানব সভ্যতায় এর অনুপম অবদান বাস্তবে পরিণত ও উন্মোচিত করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল স্মরণাতীত কাল থেকে। 'শোনরে মানুষ ভাই সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই', 'নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগত ভ্রমিয়া দেখি একই মায়ের পুত' মানব সভ্যতার শ্বাশ্বত প্রকৃতি উন্মোচনকারী এইসব চিরন্তন বাণী আবহমান বাংলার হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করে। স্মর্তব্য, এইসব শ্বাশ্বত বাণী যখন প্রথম উচ্চারিত হয়েছে তখন কিন্তু জনগণের সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তি করে কোনো রাষ্ট্র বিশ্বের এই অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি। এমনকি স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনো সংগঠিত চিন্তা এখানে খুব একটা লক্ষ্য করা যায় নি। অথচ বর্তমানে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় বাংলাদেশের মানুষের জনগণ হয়ে ওঠার একটি ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস...' বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের প্রথম অংশে তিনি এ দেশের মানুষের প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের এবং দ্বিতীয় অংশে নিকট অতীতের একটি প্রকৃত চিত্রই যেন তুলে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর দেয়া এই বিবরণের মধ্যে এ দেশের সব মানুষই তাদের হৃদয়ের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। রাষ্ট্র গঠনের প্রায় সব উপাদান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত এ দেশের আর কোনো নেতা এ দেশের মানুষকে জনগণ হয়ে ওঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। এ দেশের মানুষকে সচেতন করে, তাদেরকে জাগরণের ডাক দিয়ে জনগণে পরিণত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু প্রকৃতপক্ষেই অনন্য।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব

টড্ ল্যান্ডম্যান (২০০৪) তাঁর ইস্যুজ এন্ড মেথডস ইন কম্পারেটিভ পলিটিক্স, আন ইনট্রোডাকসন্ শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, 'সামাজিক জাগরণকে কেন্দ্র করে অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সাধারণত গবেষকগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক জাগরণের উদ্ভব, কৌশল, আকৃতি এবং সফলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী হন। তুলনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হলো সামাজিক জাগরণ

সৃষ্টি হয় কেন, কিভাবে এই জাগরণের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে আগ্রহী হয়ে থাকে, আর এসবের অর্জনই বা কী?' পরাধীন বাংলাদেশে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞজন, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী তথা সংস্কারবাদী নেতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য রাজা রাম মোহন রায় ইংরেজ শাসকদেরকে অনুরোধ করেছেন। ইংরেজ সরকার সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করেছেন। তিনি বাল্যবিবাহ রোধের জন্য সামাজিক আন্দোলন করেছেন। তিনি এ দেশের মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। এঁদের অবদান বাংলাদেশের মানুষের মনে চির স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরে নোবেল বিজয়ী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে বাংলার আপামর মানুষ তথা সমগ্র মানব জাতির আত্মমর্যাদার চেতনাকে জাগ্রতই শুধু নয়, সে চেতনাকে শাণিত করতে যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা বাংলাদেশের চিরন্তন সম্পদ।

অপর দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে সামাজিকভাবে এ দেশের জনগণকে জাগরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে অনেকাংশে সফল হয়েছেন এ.কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক জমিদারদের শোষণ থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য সামাজিক জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিম লীগের নবাব ও জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং তাদের সাথে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর কৃষকদের কোনো ফলপ্রসূ সম্পর্ক ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২৯ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বাংলা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির সফলতার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন দূরীভূত করার ব্যাপারে বিরাট আশাবাদ সৃষ্টি হয়। এ সময় বাংলার নেতা ফজলুল হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তার সামনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে পড়েছিল। বাংলার কৃষকদের প্রকৃত দরদী বন্ধু ফজলুল হক সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর। ফজলুল হক এই ঐক্যের প্রতীক।" পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট দেশব্যাপী যে প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যা বয়ে যায় তাতে মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন দল ভেঙে যায়।

মওলানা ভাসানী সাধারণ মানুষের পক্ষে এবং শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ভাসানী অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি মুসলিম লীগের

রাজনীতি করতেন এবং পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করতেন। পাকিস্তানকে সমর্থন করার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাঁর অবদান ছিল গণমুক্তির ব্যাপারে। তিনি নিপীড়িত প্রজাদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন জমিদারদের বিরুদ্ধে। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি আসামে চলে যান। শাসক শ্রেণীর শোষণমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল আমৃত্যু। এমনকি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ব্রিটিশ শাসনাধীনের অবিভক্ত বাংলায় রাজনীতি করেছেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোনো কোনো অধ্যায়ে তাঁর ভূমিকা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দেশ বিভাগের এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয় বলে মনে করেছেন। পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর অবদানের কারণে তাঁকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এইসব স্মরণীয়-বরণীয় নেতাদের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে আমরা সংক্ষেপে বিবিসি পরিচালিত একটি জরীপের ফলাফল উল্লেখ করতে পারি। 'শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?' বি বি সি শ্রোতাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে মতামত জরীপ করে যে ফলাফল পায় তাতে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের জাতির জনক। সঙ্গত কারণেই তাই বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি গবেষণার জন্য গৃহীত হয়েছে।

সেই প্রাচীনকালে জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সুশাসন পাবার অত্যন্ত স্বল্প অথচ স্বর্ণোজ্জ্বল অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল ব্যাপী অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্যাতিত হতে হতে অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যখন বাঙালি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তখনও শোষক-গোষ্ঠী জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হচ্ছিল না। ঠিক সেই সময়টাতে বঙ্গবন্ধু বাঙালির শোষণ আর বঞ্চনার কথা বারবার উল্লেখ করে এর প্রতিকার তথা স্থায়ীভাবে এর অবসানের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন জনগণ তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যে সময় বাঙালিদের সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন সে সময় এ দেশে চলছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। পাকিস্তানি শাসন গণতান্ত্রিক ছিল না, আবার এই শাসন ব্যবস্থায় শুধু পাঞ্জাবিরাই প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল, একচেটিয়া ভাবে। এ সময় বাঙালিদের ওপর অবর্ণনীয় শোষণ চলছিল। যাইহোক বঙ্গবন্ধু যে অর্থে 'জনগণ' পদবাচ্যটি ব্যবহার করেছেন তার সাথে ফরাসী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ রুশো প্রদত্ত 'জনগণের' সংজ্ঞার মধ্যে আমরা মিল অমিল খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। রুশো বক্তব্যে 'জাতি', তার 'বিভিন্ন অংশের মানুষ', 'সার্বভৌম ক্ষমতা' এবং 'সামাজিক বন্ধন' এই কথাগুলো এসেছে। প্রথমে 'জাতি' ও 'তার বিভিন্ন অংশ' এই উপ-ধারণা দুটোর কথা ধরা যেতে পারে। এই উপ-ধারণা দুটো দ্বারা বোঝা যায় যে একটি জাতি কোনো একক সত্তা নয়। বহু সত্তার একটি মিলিত রূপ হচ্ছে একটি জাতি। এই সত্তাগুলোকেই সম্ভবত এক একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই

অংশগুলোর মধ্যে একটি সামাজিক বন্ধনের কথা বলা হচ্ছে। তৃতীয়ত এই সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হবে 'সার্বভৌম ক্ষমতার' দ্বারা। প্রশ্ন হলো সার্বভৌম মমতাটা কি যা মানুষকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে? রুশো এখানে আর একটি ধারণার অবতারণা করেন। আর তা হচ্ছে 'সাধারণ ইচ্ছা'। রুশোর মতে 'সাধারণ ইচ্ছা' সার্বভৌম। রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যে সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সাধারণ ইচ্ছার বাহ্যিক রূপ। সেই অর্থে সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম মানে হচ্ছে রাষ্ট্র সার্বভৌম। সাধারণ ইচ্ছা হচ্ছে স্বেচ্ছা প্রণোদিত ইচ্ছা। এখানে জোর জবরদস্তির কোনো অবকাশ নেই। ১৯৭১ সালে এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। বিশেষত ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে বাঙালি জনগণেরও সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ যার নেতৃত্বে বাঙালি জনগোষ্ঠীর এই সাধারণ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 'জনগণ' বলতে বঙ্গবন্ধু এই বাঙালি জনগোষ্ঠীকেই বুঝিয়েছেন। হাজার বছর যাবত চলে আসা আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিড়গা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি জনগণের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্নটি এ কারণে প্রাসঙ্গিক যে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় জনগণের সব অংশ না হলেও অন্ততপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভূমিকা তথা অংশগ্রহণই অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে বিশেষ একজন নেতা কেন উল্লেখযোগ্য হবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই যে কথা বলা সমীচীন তা হলো বিশেষ একজন বা কয়েকজনের সক্রিয় ভূমিকা পালন ছাড়া 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' প্রকৃত অর্থেই বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা সম্ভব নয়। জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চর্চা তথা গণ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এই বিশেষ এবং গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছিলেন বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার পাটগাতী ইউনয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বাংলা ১৩৭২ সালের ৩রা চৈত্র, ইংরেজি ১৭ মার্চ ১৯২০ সালের মাগরেবের নামাজের সময় রাত আটটায় জন্ম নেয়া একটি শিশু। পরবর্তীকালে যিনি দেশের জনগণ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসরত একটি জনগোষ্ঠী কর্তৃক সার্বভৌমত্ব অর্জন ও সরকার নির্বাচিত করার সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে স্বাভাবিক। কারণ একটি ভূখণ্ডের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সবকিছুই 'জনগণ' কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্বাচিত হয়। অতএব জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টিই রাষ্ট্রের সবচেয়ে মৌলিক লক্ষ্যবস্তু। হিসেবে যদি জনগণের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত একজন মানুষজনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কি অবদান রাখতে পারেন? সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তনের এই ভূভাগে জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য এর বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করতে তিনি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। আর সেই সংগ্রাম সফল হবার পরিণতিতে ত্রিশ লাখ বাঙালির আত্মত্যাগ, প্রায় আড়াই লাখ মা-বোনের ইজ্জত এবং প্রায় তের হাজার ভারতীয় সেনার জীবনের বিনিময়ে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্ব কতদূর স্থায়ী হতে পেরেছে। এ প্রশ্নের তাৎক্ষণিক ও প্রাথমিক উত্তরে বলা যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় তাতে জনগণের সার্বভৌমত্ব শুধু কথার কথায় পরিণত হয়। বাস্তবে সামরিক শাসন অথবা জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে চলতে থাকে কতিপয় ব্যক্তির শাসন। যদিও ১৯৯০-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফল পরিণতিতে এদেশে পাঁচ বছর পরপর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্বের বিদ্যমানতার প্রমাণ হাজির করা হয়ে থাকে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অবর্তমানতার বাংলাদেশে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই থেকে যায়। এর উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের অনেক কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে তা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর ও বিরক্তিকর প্রশ্ন হলেও এ প্রশ্নের পজিটিভ উত্তর দেয়া কঠিন, যদিও নেগেটিভ উত্তর দেয়া সহজ। কারণ যারা গণতন্ত্রের অথবা নির্বাচনের ধার ধারেন না তারা অতি সহজেই এ প্রশ্নের না-বোধক উত্তর দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন সেইসব সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিবেকবান মানুষদের পক্ষে এর সহজ উত্তর দেয়া খুবই জটিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ফরাসী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জ্যাঁ জ্যাক রুশো সার্বভৌমত্বের ধারণা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বে সার্বভৌমত্বের ধারণা স্থান পেয়েছে। সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব একমাত্র জনগণের অধিকারভুক্ত। তাঁর মতে জনগণের সার্বভৌমত্ব একটি কর্পোরেট সংস্থার মতো ক্রিয়াশীল থাকে। সরকার হচ্ছে শুধু এজেন্ট, যাকে জনগণ ক্ষমতা দিয়েছে যা আবার প্রত্যাহার সংশোধিত করা যায়। এই প্রত্যাহার বা সংশোধনের বিষয়টি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ইঙ্গিত বহন করে। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এদেশে যে সরকার বজায় ছিল তা ছিল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। রুশোর কথায় জনগণের সার্বভৌমত্বের এজেন্ট। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট গভীর রাতে নির্বাচিত সরকার প্রধানকে সপরিবারে হত্যার ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষে জনগণের সার্বভৌমত্বকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধরা যায়। আর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের যারা বেনিফিশিয়ারি তারা ওই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর থেকে গণতন্ত্রের নামে জনগণের সার্বভৌমত্বকে বিভিন্ন কৌশলে পদদলিত করতে থাকে। এইসব কৌশলগুলোর মধ্যে

অন্যতম হচ্ছে, (১) জনগণের মতামত ছাড়াই সংবিধানে সংশোধনী সংযুক্ত করা। সবচেয়ে মারাত্মক যে কাজটি এই সংশোধনীর দ্বারা করা হলো তা হচ্ছে পবিত্র সংবিধানের ধর্মীয় বিভাজনের পথকে স্বীকার করে নেয়া। যেখানে সব ধর্মের মিলিত রক্তস্রোতের দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেই রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে সব ধর্মাবলম্বী মানুষদের সমান অধিকার থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এবং ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল সেখানে তাই ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকেরা গণতন্ত্রের নামে দেশকে বিভাজনের পথে ঠেলে দেয়। দৃশ্যতঃ তারা স্থায়ীভাবেই এ দেশে জনগণের সার্বভৌমত্বকে বিলুপ্ত করে যা করছিল তাতে একটি অরাজকতার পরিস্থিতিতে দেশ পতিত হয়েছিল। (২) রুশোর মতে 'জনগণের এজেন্ট' হিসেবে সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায় সেই নির্বাচনকেও সামরিক শাসকেরা কলুষিত করেছে। প্রথমে রেফারেন্ডামের নামে প্রহসন করে। পরবর্তীকালে নির্বাচনে টাকা ও পেশীশক্তির প্রদর্শনীর স্থায়ী পথ করে। (৩) যে নেতার নেতৃত্বে এ দেশের জনগণ স্বাধীনতা ও মুক্তির অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়েছিল তাঁর স্মৃতিকে চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। (৪) যেসব ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবহা যথা-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরা। (৫) শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা করা। (৬) ধর্মান্ধতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া (৬) ১৯৭৫ সালেল ১৫ই আগস্টের পর থেকে দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় পাকিস্তানের কায়দায়। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের পর থেকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হতে থাকে যে স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তান (লাহোর) প্রস্তাবেরই পূর্ণ বাস্তবায়ন। অর্থাৎ পাকিস্তান যেমন মুসলমানদের জন্য স্বাধীন হয়েছে তেমনি বাংলাদেশও বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এমনকি যারা কোনো ধর্মেরই অনুসারী নয় তাদের সকলের মিলিত রূপ হিসেবে যে 'জনগণ', বাংলাদেশ সেই জনগণের জন্য। আর এমন এক মিলিত রূপের 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আজীবন আদর্শ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'জনগণের' উন্নত জীবনের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার যখন অহর্নিশি কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং তার সুফলও জনগণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছিল ঠিক তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাল রাতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে দেশকে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি ধর্মীয় ঔপনিবেশিক শাসন করা শুরু হয়। যার ফলে স্বাধীনতা লাভের আটত্রিশ বছর পরেও 'জনগণের' আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না হবার কথা নির্বাচিত সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ

হাসিনার কণ্ঠে শোনা যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করার পরে বঙ্গবন্ধু 'জনগণের' উন্নত জীবনের আশার কথা বলেছিলেন। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরেও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ত্যাগ আর সংগ্রামের কথা বলে, তাদের (অর্থাৎ জনগণের) উন্নত জীবনের জন্য করণীয় সবকিছু করার অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে চরম দুঃসময়ের কাল চলতে থাকে। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয় এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা। বিশেষত এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের যারা বেনিফিশিয়ারি সেই শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচারণায় লিপ্ত হতে থাকে। এ সময়ের নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার অন্যতম উপদান ছিল হিন্দু এবং ভারত বিরোধিতা করা। যেমন বলা হতো নৌকায় ভোট দিলে বাংলাদেশের মসজিদে উলুধ্বনি হবে, নৌকায় ভোট দিলে ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে, জয় বাংলা জয় হিন্দ, লুঙ্গী ছাইড়া ধুতী পিন্দ প্রভৃতি। এইসব অপপ্রচারের মধ্যেও সংখ্যালঘু হিন্দু জনগণ তথা এ দেশের আপামর জনসাধারণের হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলকে মুছে ফেলা যায়নি। কারণ জনগণের মনের কথা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর হাতে গড়া সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় বঙ্গবন্ধু একজন মহান মুক্তিদূত। যুগ যুগ ধরে বাঙালিরা যে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে তার অতিরিক্ত এদেশের হিন্দু জনগণ বেশি করে শোষিত হয়েছে। যার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর থেকে হিন্দুরা এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে, ফলে দেশত্যাগ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার পর কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসলেও পুনরায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা চলতে থাকে তারই জের ধরে এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতে থাকে। ফলে পুনরায় হিন্দুরা এদেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যেতে থাকে। এ দেশের এক শ্রেণীর বৈষম্যবাদী এবং শোষক চরিত্রের মানুষ হিন্দুদের এই চলে যাবার জন্য হিন্দুদের মানসিকতাকেই দায়ী করেন। রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের চোখে পড়ে না। যেন তারা চোখে ঠুলি এঁটে বসে আছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই অবহেলিত মানুষদের হৃদয়ের দুঃখ বেদনার কথা বারবার বলেছেন, যেমন বলতেন বঙ্গবন্ধু। প্রকৃতপক্ষে জনগণের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রামে লিপ্ত হন তাঁরা ঠিকই জনগণের কোন অংশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন তা বুঝতে পারেন। তাদের দুঃখে তারা ব্যথিত হন। এই অবহেলিত জনগণের জন্য তারা কাজ করে যান। তাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সমস্যার বিষয়টি খুব দ্রুত আঁচ করতে পারেন। আর তাদের অসুবিধার বিষয়গুলো দূর করতে তারা সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান বিশ্বে অবহেলিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলা যায়। লং

ওয়াক টু ফ্রিডম নামে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বইতে তিনি বলেছেন, একটি জাতি সর্বোচ্চ সম্মানিত নাগরিকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে তা দিয়ে নয় বরং সবচেয়ে নিচের লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে তা দিয়ে ওই জাতি কেমন তা বিচার করা যেতে পারে। পরাধীন বাঙালির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু যেমন কাজ করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনাও তেমনি কাজ করে যাচ্ছেন। কারণ বাংলাদেশের জনগণ তো বঙ্গবন্ধুরই জনগণ।

নোট ও তথ্যসূত্র :

১. Amartya Sen (2006), Identity and violence, The Illusion of Destiny, London : Penguin Books, P. xiv.

২. জিয়াউর রহমান, "একটি জাতির জন্ম", দৈনিক বাংলা (অধুনা বিলুপ্ত দৈনিক সংবাদপত্র) ২৬ মার্চ ১৯৭২।

৩. David McCrone (1998), The Sociology of Nationalism, London and New York : Routledge, pp. 174-175.

৪. George H Sabine and Thomas L Thorson (1973), A History of Political Theory, New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., p.163.

৫. A. Appadoral (1975), The substance of Politics, Mdras : Oxford University Press, p. 12.

৬. Margaret G. Herman (1987), "Ingredients of Leadership", in Margaret G. Herman ed., Political Psychology, San Francisco : Jossey-Bass Publishers, p.169.

৭. George H Sabine and Thomas L Thorson (1973), A History of Political Theory, New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., p.476.

৮. Zillur R. Khan (1984), Martial Law To Martial Law, Leadership Crisis in Bangladesh, Dhaka : TheUniversity Press Ltd., p.96.

৯. অরুণ কুমার গোস্বামী (২০০৭), 'মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস নীতি", নিবন্ধমালা, চতুর্দশ খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪(২৩৪)

১০. Jawaharlal Nehru (1942), Glimpses of World History, being further letters written in prison, and containing a rambling account of History for young people, New York : John Day Co.

আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি

শেখ মুজিবুর রহমান

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থবাদীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ-দফা দাবি, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকদের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকস্তিানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬ দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমি স্বার্থ শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম; তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক। এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারি দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশ্মনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন; সে-চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন

দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষত, আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি তাঁহারা সকলে অবিলম্বে ৬ দফা ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তি কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের এই বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ-দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখন দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্বপাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁৎকিয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ঠ সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কী? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাসীন আইনসভাই ভাল, এ বিচারের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণ-ভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার—এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমি স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদেরকে এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসংগত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনে রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তাই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন টেলিগ্রাম পোস্টাপিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ-দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমি স্বার্থবাদী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে, 'স্টেট' অর্থে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেট্স্' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র—সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে 'ইউনিয়ন' বা ফেডারেশন বলিয়া

থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্বপাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে বিকল্প বা অল্টার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট্ ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে; কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোন সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবু শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসামান্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক

বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ড প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরি-উক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নক্‌শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকস্তিান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোন পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোন বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইন্‌সিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতিমিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন, সরকারি স্টেট্ ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাংকে ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাংকের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি—এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মতো একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউব ওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল

ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনদিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ, সেভিং মানেই ক্যাপিটাল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষত পাট-চাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানিরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ, এই অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এ নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমি স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ত অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব, এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমি স্বার্থবাদীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁহারা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্বপাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনা সুপারিশ করা হইয়াছে। এইটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁহারা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁহারা এই খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষাবাহিনী পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সেই টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোন হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোন দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল্ ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশ ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠারো বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলালেই দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাস্তিানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশি আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে, আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশি মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য-মূল্য ত দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট-চাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্যদাম দিতে পারেন না।

এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোন প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সেই আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার

প্রতিকার করিয়া পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানির হাতে পূর্বপাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এই দাবি অন্যায়ও নয় নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাহা ত করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এই অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানির বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়?

শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা-বাহিনী গঠন করুন, অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন, নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতে পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে:

এক. তাঁহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এই দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মতো দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষনের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা ত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশি মিশনসমূহ তাঁহাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব-পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তমহ্ত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মতো আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বরসংখ্যা ছিল ৪৪; আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানির ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানি মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলের সকল বিষয়ে সমতাবিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার, থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই

পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানির। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি.আই.ডি.সি. আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি.আই.টি. আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্ প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমন উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ-বোধেই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে-নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা, যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের ইচ্ছা করিয়া যারা জানিয়া শুনিয়া যাহারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে-নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশ্মনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপারাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তাঁহারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাস্তিানে বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এনজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত

মুরুব্বিরাই এঁদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এঁদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এঁরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এঁদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্‌ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছে আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ঠা চৈত্র ১৩৭২

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১৭ এপিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সালে ২৬-এ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুনতি গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে।

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি

এবং

এতদ্দ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন

এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমাপ্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করলাম।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ থেকে আটত্রিশ বছর পূর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে অমানবিক নিয়ম-কানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতিমিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচার তত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। একহাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই—আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে—There is nothing like a good beginning for a speech. বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগতত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এ যুগান্তকারী ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা—যা পুরো বক্তৃতার মূলভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতাকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ মার্চের এ বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধস্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের

গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেতো এ বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত বক্তৃতা সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

জনযোগাযোগে যেসব speech idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ এই বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিক রচিত এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি। কী অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? ...বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধন সৃষ্টিতে ধ্বংস question and then answer পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমানকালের যৌক্তিক বাবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এ বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে । বহু গবেষণার পর যোগাযোগতাত্ত্বিকদের declarative বাক্য সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, "২৮ তারিখ কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। সরকারি কর্মচারীদের বলি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না।"

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যাঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিতি করানোই নয়, বরং তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তার এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহমূলক বক্তব্য—"তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু—আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।" সাড়ে সাতকোটি বাঙালি এ বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোনো হেরফের কখনও যে ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্ম-মৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি "আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব" বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন, "তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার

বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।" কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান, উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্যচয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ণ যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনাসঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য—আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্তমানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর গুলি হচ্ছে। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।" সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় আজকাল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত। যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, "তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, অপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার পরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষ হত্যা করা হেয়ছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গেলেও বঙ্গবন্ধু put up the attribution first-এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তার মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন—"ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না" কিংবা "ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম" ইত্যাদি। সার্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting function) যা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বারবার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদানকালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে কোন তারতমা ঘটতো না—তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য :

"আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যানা জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল, কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না।"

জনযোগাযোগে ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এ বিধানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন— তিনি বলেছেন— 'আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন" কিংবা "আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য

করতে চেষ্টা করব" ।

সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফললাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের (posing a challenge) প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি । বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে যখন বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক । মনে রাখবা রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ"— তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগবিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালীতে পরম দক্ষতায় কিভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন । যেকোনো বক্তৃতার সংজ্ঞানির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত । বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষবাক্য "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা—যা ৭ মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত । যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায় । যেখানে বলা হয় 'don't drag out your condlusion' আমরা পরিশেষে বলছি—একটি কথা বলে শেষ করছি বা পরিশেষে এ কথাটি না বললেই নয় ইত্যাদি ভূমিকা করে বক্তব্য শেষ করি । কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি speech definition- এ প্রবেশ করেছেন—যা আধুনিক তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এবং যা ছিল আটত্রিশ বছরর পূর্বে অকল্পনীয় ।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ সালের ৪ জুন তার বক্তব্যে বলেছিলেন, We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender " Lnvwfb we shall fight ছিল বক্তৃতার সংজ্ঞা ।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সংজ্ঞা অংশ ছিল 'I have a dream' উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ : "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal, I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character".

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয় । একাত্তরের ৭ মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল—তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা ।

মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক

স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতাবিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এ ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আবশ্যিক পাঠক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমাদের প্রত্যাহিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক ... public uddness-এ অন্যতম শর্ত।

এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নগীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'The best argument is that which seems merely an explanation' অর্থাৎ সর্বোত্তম যুক্তি হচ্ছে শুধুই সঠিক ব্যাখ্যা। তৎসময়ের ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এ ভাষণটিকে সব সময়ের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

সাত মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দচয়নে মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত । বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোনো টীকা বা নোট ব্যতিরেকে ছেদহীনভাবে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তখনই বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদনিবন্ধে। এ বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীননতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যাবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) বিখ্যাত উক্তি : "The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do" আমাদের স্মরণে আসে। ৭ মার্চ একাত্তরের এ ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, পৃথিবীর এটি একটি অন্যতম ভাষণ। কারণ এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা।

এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে, জীবনসত্য অনুধাবনে পথ দেখাবে ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলনকে দেবে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা।

যুগান্তর : ১৫ আগস্ট, ২০০৯

বঙ্গবন্ধু ও তার স্বপ্নের বাংলাদেশ

ফারাজী আজমল হোসেন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বৃটিশ উপনিবেশ আমলেই জন্মেছিলেন ক্ষণজন্মা এই শ্রেষ্ঠ সন্তান। তার ছেলেবেলা ও কৈশোর কেটেছে বৃটিশ শাসকদের পরাধীনতার মধ্যে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় গিমাডাঙা-টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে টুঙ্গিপাড়ার কাদাপানিতে বেড়ে ওঠা শেখ মুজিব কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। সেখান থেকে ১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমর্থনে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটে সামিল হয়ে তিনি গ্রেফতারবরণ করেন। এ সময় তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত এলে তিনি রুখে দাঁড়ান। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণকালে ১৯৪৯ সালে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের পর টানা প্রায় সাড়ে তিন বছর তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। ছাত্র অবস্থার শুরু থেকে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানী শাসকদের অত্যাচার-নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তখনই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে থাকেন ধীরে ধীরে। এরপর এলো '৫২-র ভাষা আন্দোলন।

এ আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু সক্রিয় অংশ নেন। '৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর পাশাপাশি তরুণ নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ৫৮-তে জেনারেল আইয়ুব খান মার্শাল 'ল জারি করে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু এই জংলি আইনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন। '৬২-র ছাত্র আন্দোলনে তিনি ছিলেন নেপথ্য নায়কের ভূমিকায়। তার নেতৃত্বে '৬৬-তে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা আন্দোলন শুরু হয়। এতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে তাকে গ্রেফতার এবং তার বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করে। বঙ্গবন্ধুকে জেলে আটকে রেখেও পাকিস্তানীরা বাঙালির ৬ দফা আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হয়। '৬৯-এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় ছাত্র-জনতার

ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলন। এ আন্দোলনে আইয়ুবের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী। আর এ বছরই জেল থেকে মুক্তির পর ঢাকায় এক বিশাল ছাত্র-জনতার সমাবেশে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। '৭০-র জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তদানীন্তন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" অতঃপর '৭১-র ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাক হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মূহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর তাকে পাকিস্তানীরা বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় বাংলার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর নামে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জিত হয়। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে '৭২-র ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপরই দেশবাসী তাকে জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত করে। স্বাধীনতার পর বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক দেয়।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন। একটি সুখী-শোষণহীন সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। ধ্বংস স্তূপ থেকে তিনি যখন বাংলাদেশকে পুনর্গঠন এবং দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই '৭৫-র ১৫ আগস্ট কালরাতে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ঘাতকরা বাঙালির সব স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করে দেয়। সারা দেশ শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিন ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে যান। দীর্ঘ দিন তারা নির্বাসিত জীবন কাটান। ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তার আদর্শকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু ঘাতকদের সেই আশা পূরণ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর প্রতিফোঁটা রক্ত থেকে তার আদর্শের শতশত সৈনিক তৈরি হয়েছে। শত দমন-পীড়ন-নির্যাতন ও অগণিত আদর্শের কর্মীকে হত্যা করেও বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা '৮১-র মে মাসে দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে শুরু হয় ভোট-ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। '৯৬-র নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও বঙ্গবন্ধুর গড়া আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে।

শেখ মুজিব আমার পিতা

শেখ হাসিনা

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মত সাজানো সুন্দর একটা গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গীপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখা নদীর একটা হলো বাইগার নদী। নদীর দু'পাশে তাল, তমাল ও হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালী গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এ গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁসে গড়ে উঠেছিলো জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে ওঠে আরো অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদী জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামে বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থা প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষ টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রী এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দু'টো দালানের বসতি ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোও জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান-কোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে আর আশপাশে বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমানও এ বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার আব্বা, তাই আমার দাদির বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত

হবে। আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গীপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি কেমন করে বাসা গড়ে তোলে, মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করতো। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তার ভালো লাগতো। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথাবলা ও শিস দেয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তিনি যা বলতেন তারা তাই করতো। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোটবোন হেলেনের ওপর। ওই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এ জন্য ছোটবোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ লক্ষ্য করে। এই খালের পাড়েই ছিল কাচারি ঘর। আর এই কাচারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গীপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান।

এরপর আমার দাদি তাকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। তার একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তার এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন।

তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা লেখাপড়া করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তার কৈশোরবেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন কিভাবে তার খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন, গ্রামবাসীর কাছে ছিলেন মিয়াভাই বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ-সরল মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ ছানা আর মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সবসময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতো। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্টবেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আপসোসেরও সীমা ছিল না যে কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুশ-নদুশ হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন।

এই চার বোনের মধ্যেই দুই বোন বড়ো ছিলেন। ছোট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এ জন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড়ো দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদের দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো-আঠারো জন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে। আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তার বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তার দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন চার বছরের বড়ো। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্জিয়ান) মুরুব্বী করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তার মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানুষ হন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুর প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুবতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়তো।

আব্বা যদি ধারে কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনও আমি যখন ঐ সব এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়াশোনা করতো। ৪/৫ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হবে। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসতো আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায়, আব্বা তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ-ভাত খাওয়ার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো, কারণ আর কিছুই নয়, কোন ছেলে গরিব ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ-রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন। দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুরি সময় হতো, তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে, রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের

চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিবে ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন। আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনদিনই বকা-ঝকা করতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে। স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে ৪ বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তার নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসতো, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোন কাজে কখনও তারা বাধা দিতেন না এবং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার আব্বার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আব্বার একজন স্কুল মাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা ও চাল, জোগাড় করে গরিব, মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তার সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোন অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে জেলে থাকেন।

কৈশোরোই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুল ঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করাবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এ সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এ সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় দাঙ্গা হয়, তখন তা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজো ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো ২ দিন বা ৩ দিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুফুর খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনও পিছপা হননি। পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন

বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এ সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা ঘোষণা করলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদি হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট আর আমার ছোট্ট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি। একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন। সে সময় আমাদের ২ ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা, দাদা-দাদীর কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনও দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি আব্বা আব্বা বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড় পুকুর আছে, যার পাশে বড় খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা ২ ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল, পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি? কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না। আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি; আমার মা, কামাল, জামাল ও ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী। যাদের হাতের মেহেদির রঙ বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুফাতো ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে আক্রমণ করেছে– আব্দুল রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুফা)। ৪ বছরের শিশু পুত্র বাবু খুনিদের হাত তেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন– তাকেও তারা হত্যা করেন। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজো ফুফু।

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তারা কেউ বেঁচে নেই– আজ যে বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাবো না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার

শেখ হাসিনা

অনেক রাত হবে। দোতলায় মায়ের ঘরে খাটে আমরা সবাই। আম্মা, আব্বা, ভাই, বোন– কেউ শুয়ে, কেউ বসে খুব গল্প করছে। আব্বাও অনেক কথা বলছেন, আমরা শুনছি। সেই আগের মতো ৩২ নং বাড়িটায় সবাই আছি। কিন্তু বাড়িটা একদম বিধ্বস্ত। এখানে ওখানে গুলির দাগ। আমার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে আলনা। একটা আলমারি রাখা আছে। বড় একটা আয়না রয়েছে, ওই আয়নায় কারা যেন গুলি করেছে, ফলে অর্ধেক আয়না ভেঙে গেছে। বাড়ির ইটগুলো বুলেটের আঘাতে কেমন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। একটা ইটের অনেকখানি বেরিয়ে আছে। এদিকে দরজায় একটা শাড়ি ছিঁড়ে দু'টুকরো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মায়ের কোলের কাছে শুয়ে ছিলাম আমি। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম...

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগল যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। কেন যেন মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্নটা পুরো দেখা হল না। ফোনটার ওপরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখি যে সেই আগের মতো সবাই একসঙ্গে ওই বাড়িতে– মনে হয় যেন একুশটি বছর আমাদের জীবনে আসেনি। মনে হয় মা-বাবা-ভাইদের স্বপ্নে দেখি ও কাছে পাই বলেই বুঝি বেঁচে আছি। সারাটা দিন নানা রাষ্ট্রীয় কাজে ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎসভা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থেকে কাটিয়ে দেই। কিন্তু রাতে যখন ঘুমুতে যাই, তখন যেন চলে যাই অন্য জগতে সে জগত শুধু আমার, একান্ত আমার, একুশ বছর আগের জীবন।

অনেক স্মৃতিভরা ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়ির জীবনে যেন চলে যাই। সেই আগের মতো সবাই আছে। একসঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কখনও রাগ করছি, ভাইবোন খুনসুটিপনা করছি। কখনও মিছিল আসছে, কত স্মৃতি। স্মৃতি বড় মধুর, আবার স্মৃতি বড় বেদনার আর যন্ত্রণারও। ঘুম ভেঙে বাস্তব জগতে এলেই সে যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। যত দিন বেঁচে থাকব, এ যন্ত্রণার স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে হবে।

১৪ আগস্ট ১৯৯৫-এ বাড়িটিকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আজ সেই জাদুঘর দেখতে আসে। প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার স্মৃতিবিজড়িত নিদর্শনসমূহ। আজ খুব আনন্দ হয়, আমরা জনগণকে তাদের প্রিয় নেতার বাড়িটি দান করতে পেরেছি বলে। জনগণের সম্পত্তি হয়েছে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি। এটাই আমাদের বড় তৃপ্তি। আমরা

তো চিরদিন থাকব না। কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাড়টি জনগণের সম্পদ হিসেবে সব স্মৃতির ভার নিয়ে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে। এখানে আমাদের সান্ত্বনা।

আমরা ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর এই বাড়িটিতে আসি। তারপর থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ সভা এই বাড়িতে হয়েছে। সেই '৬১ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত কত ঘটনা এই বাড়ি ঘিরে। মাঝখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে '৮১ সালের ১১ জুন পর্যন্ত এ বাড়ি বন্ধ ছিল। আব্বা শাহাদতবরণ করার পর ওরা বাড়িটি সিল করে দেয়, তারপর আর কেউ প্রবেশ করতে পারেনি।

মনে পড়ে, ১৯৬২ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। মণিভাই এই বাড়ি থেকেই নির্দেশ নিয়ে যেতেন, পরামর্শ নিতেন। ১৯৬২ সালে আব্বা গ্রেফতার হন। তখনকার কথা মনে পড়ে খুব। আমি ও কামাল পেছনের শোবার ঘরে থাকি, মাঝখানে বাথরু, তারপরই মা'র শোবার ঘর। তখনও বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠি, তখন কেবল দুটো শোবার ঘর আর মাঝের বসার ঘরটা হয়েছে। তার অর্ধেকটায় খোকা কাকা, স্নোভাই, মণি ভাইসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকত। মাঝখানে পর্দা ছিল বাক্স-স্যুটকেস দিয়ে, এপাশে খাবার জায়গা। সামনে পশ্চিম দিকে ছোট একটা বসার ঘর তখনও অসমাপ্ত। এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে পুলিশ। জানালার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আর একজন অত্যন্ত সতর্কভাবে গুটিগুটি পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আমি পর্দার পাশে, ঘর অন্ধকার, আমাকে দেখতে পায়নি। তাড়াতাড়ি কামালের খাটের কাছে গেলাম। ওকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। ও চোখ খুলল, 'হাসুপা, কী?'

আমি বললাম, 'পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।' এ কথা বলেই তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডাকলাম। আম্মা ও আব্বা তখন টের পেয়ে গেছেন। মা বললেন, 'তোমার আব্বাকে ওরা অ্যারেস্ট করবে।' ওই বাড়ি থেকেই আব্বাকে বন্দি করে নিয়ে গেল ওরা। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আব্বা জেলে থাকলেন।

১৯৬৪ সালের অক্টোবরে রাসেলের জন্ম। তখনও বাড়ি দোতলা হয়নি, নিচতলাটা শেষ হয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণে আমার ঘরেই রাসেলের জন্ম হয়, মনে আছে। আমাদের সে কী উত্তেজনা! আমি, কামাল, জামাল, রেহানা, খোকা কাকা অপেক্ষা করে আছি। বড় ফুফু, মেজ ফুফু তখন আমাদের বাসায়। আব্বা ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচার কাজে। আয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করা হয়েছে সর্বদলীয়ভাবে, বাসায় আমাদের একা ফেলে মা হাসপাতালে যেতে রাজি নন। তাছাড়া এখনকার মতো এতো ক্লিনিকের ব্যবস্থা তখন ছিল না। এসব ক্ষেত্রে ঘরে থাকারই রেওয়াজ ছিল। ডাক্তার নার্স সব এসেছে। রেহানা ঘুমিয়ে পড়েছে, ছোট মানুষটা আর কত জাগবে? জামালের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু, তবু কষ্ট করে জেগে আছে নতুন মানুষের আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। এদিকে তর্ক– ভাই না বোন? ভাইদের চিন্তা, আর একটা ভাই হলে তাদের খেলার সাথী বাড়বে। বোন হলে আমাদের লাভ– আমার কথা শুনবে, সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরানো যাবে, চুল বাঁধা যাবে, সাজিয়ে ফটো তোলা যাবে অনেক রকম করে। অনেক কল্পনা, অনেক

তর্ক, সেই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমরা প্রতিটি মুহূর্ত গুনছি। এর মধ্যে মেজ ফুফু এসে খবর দিলেন, ভাই হয়েছে। সব তর্ক ভুলে গিয়ে আমরা খুশিতে লাফাতে শুরু করলাম। ক্যামেরা নিয়ে ছুটলাম। বড়ফুফু রাসেলকে আমার কোলে তুলে দিলেন। সে কী তুলতুলে শরীর! আমি চুমু খেতে গেলাম, ফুফু বকা দিলেন। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, ঘাড় পর্যন্ত একদম ভেজা। আমি ওড়না দিয়ে ওর চুল মুছতে শুরু করলাম। কামাল-জামাল সবাই ওকে ঘিরে দারুণ হৈ চৈ।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িগুলো তখনও প্লাস্টার হয়নি। মা খুব ধীরে টাকা জমিয়ে এবং হাউস বিল্ডিংয়ের লোনের টাকা দিয়ে বাড়িটি তৈরি করেন। কাজেই অত্যন্ত কষ্ট করেই মা'কে এই বাড়িটি করতে হয়েছে। আব্বা মাঝে মাঝেই জেলে যেতেন বলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যেত। যে কারণে এ বাড়ি শেষ করতে বহুদিন লেগেছিল। আন্দোলনের সময় বা আব্বা বন্দি থাকা অবস্থায় পার্টির কাজকর্মে বা আন্দোলনের খরচের টাকাও মা জোগাতেন। অনেক সময় বাজার-হাট বন্ধ করে অথবা নিজের গায়ের গয়না বিক্রি করেও মাকে দেখেছি সংগঠনের কাজের জন্য অর্থের জোগান দিতে। কাজেই ধীরগতিতেই বাড়ির কাজ চলছিল। দোতলার সিঁড়ি আমার খুব প্রিয় জায়গা ছিল। হাতে একটা বই নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়তে খুব ভালো লাগতো। কেন, তা আজও জানি না। আরজু বা শেলী আসলে আমরা সিঁড়িতেই বসতাম, গল্প করতাম। কী যে আনন্দ ছিল! চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ওখানে গিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম। স্কুল ছুটি হলেই বরিশাল থেকে আরজু আসত। ছোট ফুফুর বদলির চাকরি। আব্বার ভগ্নীপতি বলে আইয়ুব-মোনায়েম সব সময় তার প্রতি কড়ানজর রাখত আর ঘনঘন বদলি করত। কোথাও সাত মাস, কোথাও নয় মাস– যখন যেমন ইচ্ছা। হবিগঞ্জ থেকে রামগড়, রামগড় থেকে ঠাকুরগাঁ, আবারও হবিগঞ্জ– এমনি বদলি চলতোই। ঢাকা হয়েই যাওয়ার পথ ছিল। রাস্তা-ঘাট তখন এত ছিল না। প্রায়ই ওরা ঢাকায় আসত। তাছাড়া ছুটিতে তো কথাই নেই– স্কুল ছুটির সময় মেজ ফুফু-খালা সবাই আসতেন। মাটিতে ঢালাও বিছানা। বারান্দায় চুলা পেতে রান্না। আর সব মিলে লুকোচুটি খেলা। দিনরাত খেলার আর শেষ নেই। যেহেতু বাড়ির কাজ শেষ হয়নি। কাজ চলছে, কাজেই লুকোবার জায়গাও অনেক ছিল। বাসায় যখন বেশি ভিড় হতো অথবা মিটিং থাকত, আমি ও শেলী ছাদের উপর বসে পড়তাম। অনেক সময় পানির ট্যাংকির উপর বসে পা ঝুলিয়ে গলা ছেড়ে জোরে জোরে পড়তাম। বড় হয়ে অনার্স ক্লাসের পড়াও এভাবে পড়েছি।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বাধল, যুদ্ধের আগে ১৯৬৪ সালে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হল। দাঙ্গায় বহু মানুষকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়া হয়। দেশে শান্তি স্থাপনের এবং দাঙ্গা থামানোর জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিশ্রম করে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনলেন। এটা ছিল সরকারের একটা চাল। সরকারবিরোধী আন্দোলন থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নেয়ার এক কৌশল। কত ঘটনা যে মনে পড়ে। এই বাড়ি যখন তৈরি হয়, ইট ভেজানোর জন্য পানির হাউস তৈরি করা হয়েছিল। চাচী হেলাল ও মিনাকে নিয়ে ঢাকায় এলেন। রেহানা, জামাল, হেলাল, মিনা সারাদিন

বারান্দায় খেলা করত। একদিন আমি বারান্দায় রাখা মোড়ায় বসে বই পড়ছি। আর হেলাল বারান্দায় রাখা কাঠের দরজা-জানালার পাল্লার স্তূপের উপর বসে খেলছে। একবার নামছে, একবার উঠছে। এর মধ্যে হঠাৎ ও হাততালি দিয়ে উঠল 'মিনা সাঁতার কাটে মিনা সাঁতার কাটে' বলে। জামাল দেখল, মিনা হাউসে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাউসে নেমে মিনাকে টেনে তুলল। আমি ছটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে ভেতরে এলাম। বেশি পানি খায়নি, তবে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বড় একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল। মিনা আমাদের সবার আদরের। আব্বা ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি এই খবর শুনলে আমাদের উপর দিয়ে যে কী ঝড় যাবে, ভাবতেও ভয় পাচ্ছিলাম।

১৯৬৬ সালের কথা। কয়েকদিন ধরে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা চলছিল। আমার তখন উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের কয়েকটা বিষয়ের পরীক্ষা, যার নম্বর দ্বিতীয় বর্ষে যোগ হবে। কিন্তু পড়ব কি, মিটিং চলছে বাড়িতে, মন পড়ে থাকে সেখানে। একবার পড়তে বসি, আবার ছুটে এসে জানালার পাশে বসে মিটিং শুনি, সবাইকে চা বানিয়ে দেই। যাক সেসব। বিকেলে নারায়ণগঞ্জে বিশাল জনসভা হল ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য। আব্বার ফিরতে বেশ রাত হল। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে জনসভার গল্প শুনলাম। সেই জনসভায় আব্বাকে ছয় দফার উপর একটা সোনার মেডেল উপহার দেয়া হয়েছিল। রাত বারোটায় আব্বা বিছানায় শুতে গেলেন। আমি পড়তে বসলাম। এ বছরই বাড়ির দোতলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই দোতলার পেছনের উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার। দক্ষিণের বড় জানালা, আমি খুব জোরে পড়তাম ঘুম তাড়ানোর জন্য। এর মধ্যে নিচ থেকে মামার চিৎকার শুনলাম– 'পুলিশ এসেছে, বাড়িতে ঢুকতে চায়, গেটের তালা খুলতে বলে।' আমি বাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে মামা দাঁড়িয়ে। আমি পুলিশ অফিসারকে বললাম, 'আব্বা অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন। এখন রাত দেড়টা বাজে, এখন কি করে ডাকব? তাছাড়া সকালের আগে কি করে বন্দি করবেন? আপনারা অপেক্ষা করুন।' আমি তাদের গেটের বাইরে চেয়ার দিয়ে বসতে বললাম এবং তখন কিছুতেই ডাকতে পারব না সে কথা জানালাম। আমি বারান্দা থেকে ঘর পেরিয়ে মাঝের বসার ঘরে এসে শুনি টেলিফোন বাজছে, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম– মা'র ঘরের ছোট জানালা খোলা। আব্বা কথা বলছেন টেলিফোনে। ওপার থেকে কে কী বলছেন না শোনা গেলেও আব্বাকে বলতে শুনলাম, 'তোমাকে যখন নিতে এসেছে, তবে তো আমাকেও নিতে আসবে।' আমি জানালার পাশ থেকে বললাম, 'নিতে আসবে না আব্বা, এসে গেছে অনেক আগে।' আব্বা উঠে দরজা খুললেন। ততক্ষণে বাড়ির সবাই জেগে গেছে। রাসেল খুব ছোট, শুধু ও-ই ঘুমিয়ে আছে। দোতলায় চায়ের ঘরে গিয়ে কেটলিতে চায়ের পানি চাপালাম। চোখের পানি বাঁধ মানে না। চোখের পানি চেপে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, আর আব্বার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছি। মা অনেকগুলো এরিনমোর তামাকের কৌটা দিলেন– পরে পাঠাতে অসুবিধা হয়। লেখার জন্য কাগজ, কলম, খাতা কিছু বইপত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী গুছিয়ে দিলেন। আব্বাকে ওরা নিয়ে গেল। ছোট রাসেল অবুঝ, অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কিছুই

বুঝবে না, জানবে না। সকাল হয়ে গেল, পড়াশোনা আর হল না। মনে হল বাড়িটা বড় শূন্য– ফাঁকা। এত দিনের কর্মচাঞ্চল্য হঠাৎ করে যেন থেমে গেল। সারাটা দিন কারও খাওয়া-দাওয়া হল না। আত্মীয়-স্বজন যারা খবর পেল, দেখা করতে এলো। আবার এতদিন যাদের দেখেছি চেনামুখ, আর দেখা গেল না। তবে সুখে-দুঃখের সাথী যারা, তারা ঠিকই দেখা করল। একে একে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মীকে ওরা গ্রেফতার করল।

১৯৬১ সালে এই বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কোনও মতে তিনটা কামরা করে আমরা এসে ঠি। এরপর মা একটা একটা কামরা বাড়াতে থাকেন। এভাবে ১৯৬৬ সালের শুরু দিকে তোতলা শেষ হয়। আমরা দোতলায় উঠে যাই। ছয় দফা দেয়ার পর কাজকর্মও বেড়ে যায়। নিচতলাটা তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যতিব্যস্ত। নিচে আব্বার শোবার কামরাটা লাইব্রেরি করা হয়। ড্রেসিংরুমে সাইক্লোস্টাইল মেশিন পাতা হয়। লাইব্রেরির কামরায় টাইপরাইটার মেশিন। আব্বা আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নেন বন্দিখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আওয়ামী লীগের সব নেতা এবডো ছিলেন অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতিতে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই ছাত্রদের সংগঠিত করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করা হয়। আব্বা অবশ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি বেড়াতে যেতেন বিভিন্ন জেলায়। সেখানে দলকে সংগঠিত করার কাজ ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রতি জেলা, মহকুমা, থানায় গোপন সেল গঠন করেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দলকে সংগঠিত করার কাজ গোপনে চলতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৬২-তে বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতা এ বাড়িতে এসেছে গোপনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ নিতে ও আলোচনা করতে। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি আব্বাকে ঢাকা জেলখানা থেকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি আমরা জেলগেটে গিয়ে আব্বার দেখা পেলাম না। কোথায় নিয়ে গেছে, বেঁচে আছেন কিনা কিছুই জানি না। ছোট রাসেল, অবুঝ কিছুই বোঝে না, আব্বা আব্বা করে কেবল কাঁদে। জেলগেট থেকে ফিরে এসে এই বাড়ির মেঝেতে গড়িয়ে আমরাও অনেক কেঁদেছি। এরপর শুরু হল মিথ্যা মামলা, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আব্বাকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র। গর্জে উঠল বাংলার মানুষ, শুরু হল আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির জনগণের চাপে আব্বাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল ষড়যন্ত্রকারীরা। সেদিন এই বাড়ির সামনে মানুষের ঢল নেমেছিল। সমস্ত বাড়িই যেন জনতার দখলে চলে যায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনে সময় সব শ্রেণীর, সব পেশার মানুষ এসে আন্দোলনে সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যেত। আব্বা কখনও গেটের পাশে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে, কখনও বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমরা আব্বার পাশে এসে দাঁড়াতাম, হাজার হাজার মানুষের ঢল নামত তখন এই বাড়ির সামনে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২টা ৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে

ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পৌঁছে দেয়া হল পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। যে মুহূর্তে এই খবর পাকিস্তান সেনাদের হাতে পৌঁছাল, তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১টা ৩০ মিনিটে এসে আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজও মনে পড়ে সেই স্মৃতির। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা, তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল, ওই জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ পুনরায় এই বাড়ি পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনও মতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাংচুর করে। বাথরুমের বেসিন, কমোড, আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়– দীর্ঘ নয় মাস ধরে বাড়ি লুট হতে থাকে। পাক সেনারা এক গ্রুপ লুট করে যাওয়ার পর আর এক গ্রুপ আসত। সোনাদানা জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা এক কাপড়ে সব বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

ছয় দফা দেয়ার পর অনেক সোনা-রূপার নৌকা, ৬ দফার প্রতীক দলের পক্ষ থেকে আব্বাকে দেয়া হয়েছিল। সেগুলো আমার ঘরের স্টিলের আলমারিতে রাখা ছিল। সব লুট করে নিয়ে যায় পাক সেনারা। যাক ওসবের জন্য আফসোস নেই, আফসোস হল বই নিয়ে। আব্বার বহু পুরনো কিছু বইপত্র ছিল। জেলখানায় বই দিলে সেগুলো সেন্সর করে সিলগালা করে রাখত। ১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন, কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল, যা সব সময় আবার সঙ্গে যেত। জেলখানার বই বেশির ভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন আব্বা। কিন্তু আমার মার অনুরোধে এই বইকটা আব্বা কখনও দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলী, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নার্ড শ, রাসেল, শেলী ও কীটসসহ বেশকয়েকখানা বই। এর মধ্যে কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়, তারপর পাস হয়ে সিল মারা হয়। পর পর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলোতে ছিল। মা স্মৃতিবিজড়িত এই বইগুলো খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলো এনেছেন কিনা। যদিও আব্বাকে অনেক অনেক বই জেলে পাঠাতে হতো। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মার সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সবসময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই, সেই বইগুলো ওরা নষ্ট করেছে। বইয়ের প্রতিও ওদের আক্রোশ কম ছিল না।

আমার খুবই কষ্ট হয় ওই বইগুলোর জন্য। ঐতিহাসিক দলিল হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তার সবই হারালাম।

১৯৮১ সালে আমি ফিরে এসে বাড়িটি খুলে দিতে বলি, কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমতি দেয়নি। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতিও পাইনি। মিলাদ পড়ানোর জন্য বাড়ির দরজা জিয়াউর রহমান খুলে দেননি। রাস্তার উপর বসে আমরা মিলাদ পড়ি। জেনারেল জিয়া সরকারের পক্ষ থেকে থাকার জন্য আমাকে বাড়ি দেয়ার

প্রস্তাব পাঠানো হয়। আমি একজন স্বৈরশাসকের হাত থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করি। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবারকে একটি বাড়ি, একটি ফোন, ভাতা, গাড়ি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে (যেমন জেনারেল এরশাদ সরকারের কাছ থেকে জেনারেল জিয়ার স্ত্রী ও পরিবার গ্রহণ করতেন।) আমরা কোনও দিনই কোনও কিছু গ্রহণ করিনি। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার এই বাড়ির দরজা খুলে দেন। দেশে যখন আবার মার্শাল ল জারি হয়, এই বাড়িটি বিরোধী দলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। যদিও দোতলা বা সিঁড়ি আমরা ব্যবহার করিনি কখনও। কেবলমাত্র শোবার ঘর আর লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করেছি। এ ঘরে অনেক বৈঠক করা হতো। ১৯৮৩ সালের ২১ জানুয়ারি মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতা করি। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ বহু ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেছে। আবার ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর এরশাদ আমাকে এখানেই গ্রেফতার করে রাখে। ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন পর্যন্ত এই বাড়িতে গৃহবন্দি হিসেবে অবস্থান করে আমি রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। এই বাড়িটি যখন ১২ জুন ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেয়া হল, তখন চারপাশের গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ধুলোবালি, পোকা-মাকড়ে সারা বাড়ি ভরা। ঘরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলির দাগ, কাঁচ ভাঙা, বইগুলো বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভেতরে এখনও বুলেট রয়েছে। একটা বইয়ের নাম শ্রদ্ধাঞ্জলি। বইটির উপরে কবি নজরুলের ছবি, বইটির ভেতরে একখানা আলগা ছবি একজন মুক্তিযোদ্ধার, বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষত-বিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের উপর গুলি। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয়, তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। বইটির দিকে তাকালেই যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কেন ওরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে? মায়ের ঘরের আলমারির সব জিনিস বিছানার উপর স্তূপ করা। ঘরের মেঝেতে বড় বড় গুলির আঘাত। দোতলায় মার শোবার ঘর। এই ঘরেই খুকী, রোজী, জামাল, রাসেলকে খুনিরা হত্যা করেছে। মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাকে ওখানেই গুলি করেছে। আব্বার বিছানার পাশের টেবিলটায় রক্তের ছোপ এখনও শুকিয়ে আছে। পূর্বদিকের দেয়ালজুড়ে রক্তের দাগ। ছাদের উপর মাথার মগজ গোছা গোছা চুলসহ লেগে আছে। এই ঘরেই হত্যাকারীরা ওই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারপর দু'হাতে লুটপাট করেছে। দোতলার সিঁড়িতে এখনও রক্তের দাগ রয়েছে। দোতলায় জামালের ঘরের বাথরুমের বড় আয়নায় গুলির আঘাতে বড় একটা গর্ত হয়ে আছে। দোতলার বসার ঘরের পশ্চিম পাশের ঘরটা ভাঁড়ার ঘরের মতো, এখানে ইস্ত্রি করার টেবিলটার পাশে ডিনার ওয়াগান, কাচের ও রূপার জিনিসপত্র ভরা। উত্তর দিকে একটা শেলফ, যেখানে মায়ের হাতের আচারের বৈয়ামগুলো। এখনও সেই আচারের ঘ্রাণ রয়েছে। একটা টিনে কিছু আতপ চাল ছিল, এত বছর পরও তেমনই আছে। মিটসেফে সব জিনিসপত্র। পাশে একটা আলমারির

ভেতরে তোয়ালে ও বিছানার চাদর থাকত, ঠিক সেভাবেই আছে। শুধু ঘরের মধ্যে মাটিতে স্তূপীকৃত কাপড় আর ধুলা। সেগুলোতে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। এই ঘরে কেন এত রক্তমাখা কাপড়? জানি না সেদিন কি ঘটেছিল? ওই খুনিরাই বলতে পারে, যাদের এতটুকু হাত কাঁপেনি, এভাবে গুলি চালাতে। মার বিছানা ও বালিশ গুলিতে ঝাঁঝরা, জামালের ঘরের বিছানা ও বালিশগুলির আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন। অনেক দুর্লভ ছবি, জরুরি কাগজপত্র, দলিল, ব্যাংকের চেকবই সব খুনিরা নিয়ে গেছে। ছবিগুলো সব নষ্ট করেছে, ছিঁড়েছে– পরবর্তী সময়ে পোকায় কেটেছে।

১৯৮৭ সালে জেনারেল এরশাদ আমাকে এই বাড়িতে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। সমস্ত বাড়ির জিনিসপত্র ১২ বছরে একদম নষ্ট হয়ে যায়। কারণ খুনিরা শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ড করেই ক্ষান্ত হয়নি, হত্যার পর লুটপাটও করেছে। এই লুটপাট কয়েকদিন ধরে চলেছে। মা, রেহানা ও জামালের ঘরেই লুটপাটের চিহ্ন বেশি। মার ঘরের আলমারির সমস্ত কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিছানার উপর ছড়ানো। তোষক-বালিশগুলোর একদিক বুলেটে ঝাঁঝরা, আবার অনেকগুলো বালিশ ছেঁড়া। দীর্ঘদিনের অযত্নের ফলে মাকড়ার জাল, পোকা ও ধুলায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বা ও মার ঘরের পাশে যে ড্রেসিংরুম, তার আলমারিতে যেসব কাপড় ছিল, সব দলা করে রাখা ও পোকায় খাওয়া। মনে হয় যেন আলমারি খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। কেন? অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র খুনিরা নিয়ে গেছে। মেঝে ভর্তি পুরু ময়লা, পোকা-মাকড়, আরশোলা। সমস্ত ঘর ও আলমারিতে উইপোকা। সব কিছুর উপর দিয়ে কী যে ঝড় বয়ে গেছে, তা ভাষায় বর্ণনা করে বোঝানোর শক্তি আমার নেই।

এই ঘরবাড়ির সর্বত্র আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া। কিন্তু দস্যু-দানবদের হাতে সব আজ এলোমেলো হয়ে ছড়ানো-ছিটানো। সর্বত্র মনে হয় নারকীয় পিশাচের হিংস উল্লাস ও লুণ্ঠনের স্পর্শ। এই বাড়িতেই আমি বন্দি। ধুলায় জমে যতই দিন যাচ্ছে, ততই নষ্ট হচ্ছে। বাড়িটাকে একদিন মিউজিয়াম করব, তার আগে পরিষ্কার করা দরকার, মনকে শক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। জিনিসপত্রগুলোতে হাত দেয়া কী যে বেদনাদায়ক, তা লিখে বোঝানো যাবে না। শুধু যারা এভাবে সব হারিয়েছেন, তারাই হয়তো বুঝতে পারবেন।

আমার মা অত্যন্ত পরিপাটি গোছানো স্বভাবের ছিলেন। প্রতিটি জিনিস অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতেন, যেন প্রয়োজনে সবকিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়। শীতের কাপড় এক আলমারিতে গোছানো, গরমেরগুলো অন্য আলমারিতে। তেমনি আলনায় আটপৌরে কাপড়, স্যান্ডেল, জুতা পর্যন্ত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। মা যখন আলমারি খুলতেন, দারুণ কৌতূহল হতো সবকিছু দেখার। অনেক সময় আমিও আলমারি খুলতাম। তবে মা যা যা বের করতে বলতেন, সেগুলো ছাড়া অন্য কিছুতেই হাত দিতাম না। তবে মা খুললেই হাত দিতে খুব ইচ্ছে হতো, কিন্তু সব আবার গুছিয়ে রাখতে পারব না বলে হাত দেয়া হতো না। আমার মায়ের হাতের সেই সুন্দর গোছানো সবকিছু আজ দানব খুনিদের হাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। মনকে মানিয়ে একসময় বালতি ভর্তি পানি, সাবান-কাপড়-ঝাড় নিয়ে সব ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। এত ময়লা যে একটা ঘর পরিষ্কার করতে দিনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কাজ করেও পাঁচ-ছয় দিন সময় লেগেছে।

নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে আমার মা যেভাবে যে জিনিস যেখানে রাখতেন, ঠিক সেভাবে ও সেখানে রাখতে চেষ্টা করেছি। দু'হাতে ময়লা সাফ করেছি আর চোখের পানি ফেলেছি। শুধু মনে হয়েছে, এই জন্যই কি বেঁচেছিলাম? কী দুর্ভাগ্য আমার, সবাই চলে গেল, আমি হতভাগিনী শুধু চোখের জলে ভাসছি আর এই বেদনা-যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কষ্টে দম বন্ধ হয়ে যেত। তখন কাজ বন্ধ রেখে অনেকক্ষণ আকুল হয়ে কেঁদে নিতাম। আবার এক সময় মনকে শক্ত করতাম। একটা জিনিসও ওরা অক্ষত রেখে যায়নি। যা পেয়েছে লুট করেছে, যা রেখে গেছে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখে গেছে। ফটোগুলো ছিঁড়েছে, কাগজপত্র-ডায়েরি-দলিলপত্র সব নষ্ট করেছে। যে ঘরে যত ধুলাময়লা ছিল, কিছুই ফেলিনি– বড় বড় পলিথিনের ব্যাগে ভরে রেখেছি। কেন যেন ফেলতে পারলাম না। মনে হল– যেন সব ছিল, সবাই ছিল, এইমাত্র বাইরে গেছে, আবার আসবে।

সবকটা ঘরই আমি আগের মতো করে সাজাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার মা যেটা যেভাবে যেখানে রাখতেন, ওই ভাঙ্গাচোরা জিনিসপত্র আবার সেইভাবে রাখতে চেষ্টা করেছি আমার মায়ের মতো করে। যখনই কোনও জিনিসে হাত দিয়েছি, বিশেষ করে মায়ের আলমারি খুলে গোছাতে গেছি, মনে হয়েছে, এইমাত্র বুঝি মা পাশে এসে দাঁড়াবেন, বকবেন, ঘাঁটাঘাঁটি করিসনে– গোছানো জিনিস নষ্ট হবে বলে সাবধান করবেন। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে, মা তো আমার নেই। সব আছে, এই ঘর এই বাড়ি– মনে হয় মার নিঃশ্বাস যেন শুনতে পাই পাশ থেকে, তার মমতার স্পর্শ যেন অনুভব করি।

অনেক স্মৃতিভরা ৩২ নম্বর সড়কের এই বাড়িটি। বাড়িটি আর আমাদের নেই। ওটা এখন জনগণের সম্পত্তি। ট্রাস্ট করে জনগণের জন্য দান করে দিয়েছি– আমার আব্বা শুধু তো আমাদের ছিলেন না, তার থেকেও বেশি ছিলেন জনগণের। আমরা সন্তান হিসেবে তাকে যতটুকু পেয়েছি, এদেশের জনগণ তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছে। জনগণের কল্যাণে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জেলে কাটিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। আমরা আর কতটুকু তাকে কাছে পেয়েছি। এই বাড়িটি এত স্মৃতিভরা। এর ভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই, রেহানারও নেই। আমরা আনন্দিত এ বাড়িটিই তাই আমাদের কাছে জনগণের উদ্দেশে দান করে দিতে পেরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের দীর্ঘদিনের। আমরা আজ গৌরববোধ করি, আমাদের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি আজ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রিয় তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে।

শেখ হাসিনার লেখার পাদটীকা

১৪ আগস্ট ১৯৯৫ সালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়িটিকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ লেখা রচিত।

জীবনে-মরণে সুখ-দুঃখের সাথী

শেখ হাসিনা

মাত্র তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। পিতার নাম শেখ জহুরুল হক, মাতার নাম হোসনে আরা বেগম। দাদা শেখ কাশেম চাচাতো ভাই শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ফজিলাতুন্নেছার বিবাহ দেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়া করেন। পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকার কারণে গ্রামে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেন। টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ বাড়িতে পরিবারের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য মৌলভী এবং বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক রাখার রেওয়াজ ছিল। পরবর্তী জীবনে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিলেন। স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। মনেপ্রাণে একজন আদর্শ বাঙালি নারী ছিলেন। জীবনে কোনো চাহিদা ছিল না, কোনো মোহ ছিল না। বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত থাকতেন রাজনীতি নিয়ে, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, পরিবার-পরিজনদের খোঁজখবর রাখা, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা ইত্যাদি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি করতেন। আত্মীয়স্বজন ও দলীয় কর্মীদের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন তিনি। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সন্তানদের গড়ে তোলেন। মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করার পর গোয়েন্দা সংস্থা বেগম মুজিবকে কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতারের হুমকি দেয়।

বঙ্গবন্ধু জীবনের সব থেকে সুন্দর সময়গুলো কারান্তরালে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। তার অবর্তমানে মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দলকে সংগঠিত করা, আন্দোলন পরিচালনা করা, প্রতিটি কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঊনসত্তরের গণ-অভুত্থানের বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন নেপথ্যে থেকে। তার স্মরণশক্তি প্রখর ছিল, আন্দোলন চলাকালের প্রতিটি ঘটনা জেলখানায় সাক্ষাৎকারের সময় বঙ্গবন্ধুকে জানাতেন এবং প্রয়াজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ নিয়ে আসতেন। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে সে নির্দেশ জানাতেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চোখ বাঁচিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সভা ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বাড়িতে চলাকালে নিজের হাতে রান্নাবান্না করতেন এবং তাদের খাদ্য পরিবেশন করতেন। এ সংগঠনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ১৯৭১ সালেল ২৫ মার্চ, রাত একটার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ধানমন্ডির ৩২ নং

সড়কের বাড়ি আক্রমণ করে প্রচণ্ড গুলিগোলা চালিয়ে এবং পরদিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় আবার বাড়ি আক্রমণ করে। শেখ জামাল, রাসেলকে নিয়ে বেগম মুজিব ওই বাড়িতে ছিলেন। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শেখ কামাল ২৫ মার্চ রাতে ছাত্রদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চলে যায়। পিতার গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পেয়ে কামাল কার্ফুর ভেতরেই গেরিলা কায়দায় ৫০টি বাড়ির দেয়াল টপকে সন্ধ্যায় মাকে দেখতে আসে।

বাড়ি আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল টপকে সন্তানদের নিয়ে বেগম মুজিব পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। দিনের পর দিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে দিন কাটান। অবশেষে হানাদার বাহিনী তাকে মগবাজারের একটা বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ধানমন্ডির ১৮ নং রোডের একটা বাড়িতে এনে বন্দি করে রাখে। বন্দি অবস্থায় ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক মানসিক যন্ত্রণা ও অত্যাচার ভোগ করেন। ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির উপরে হানাদার বাহিনী কর্তৃক টানিয়ে রাখা পাকিস্তানি পতাকা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেন। পা দিয়ে মাড়ান ও আগুন লাগিয়ে দেন। নিজেই জয় বাংলা স্লোগান দিতে শুরু করেন। এ সময় হাজার হাজার মানুষ বাড়িতে ছুটে আসতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে জামাল ফিরে আসে, পরে কামাল আসে। তখনও তিনি জানেন না—স্বামী জীবিত আছেন কি-না, ফিরে আসবেন কি-না? সে সময়টা ছিল তার জীবনে সব থেকে কঠিন সময়। অবশেষে ৮ জানুয়ারি বিবিসি রেডিওর মাধ্যমে প্রথম জানা গেল, বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন। বাসায় জরুরি ভিত্তিতে টেলিফোন লাগানো হলো। প্রথম ফোনে গলার আওয়াজ শুনলেন। তারপর থেকে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসা পর্যন্ত হাতে তসবিহ ও জায়নামাজেই সময় কাটালেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। প্রথমেই গেলেন তার প্রিয় জনতার মাঝে, পরে এলেন পরিবার-পরিজনের কাছে। বেগম মুজিব আশ্রয় পেলেন স্বামী বিশাল বুকে।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তার পাশে থেকে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি-সংসার গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করলেন বেগম মুজিব। বিশেষ করে লাঞ্ছিতা মা-বোনকে সহযোগিতা করা, তাদে চিকিৎসার ব্যবস্থা, ব্যক্তিগতভাবে তাদের পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া ও সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সর্বদা স্বামীর পাশে থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে যান। দেশ ও দেশবাসীর জন্য সমগ্র জীবন তিনি আত্মত্যাগ করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনককে নির্মমভাবে খুনিরা হত্যা করে। হত্যার পর বেগম মুজিবকেও হত্যা করে। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তিনি লুটিয়ে পড়েন শোবার ঘরের দরজার সামনে। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ঘটে। বঙ্গবন্ধুর সুখ-দুঃখের সঙ্গী মরণকালেও সঙ্গী হয়ে রইলেন।

সারাটা জীবন তিনি শুধু ত্যাগই করে গেছেন। প্রয়োজনে নিজের গহনা বিক্রি করে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তারই আত্মত্যাগের মহিমায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রয়েছে অবদান। মৃত্যুর কোলে ঘাতকের আঘাতে

তিনি ঢলে পড়লেন। একজন মুসলিম নারী হিসেবে যা তার প্রাপ্য তাও তো তিনি পাননি। কাফন-দাফনটুকুও তাদের দেওয়া হলো না। রক্তাক্ত পরনের কাপড় নিয়ে শহীদী মৃত্যুবরণ করলেন। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূদের সঙ্গে একইসঙ্গে চলে গেলেন। নীরবে তিনি করে গেলেন কত বড় আত্মত্যাগ বাংলার মানুষ কি তার কথা মনে রাখবে? ফেলবে কি দু'ফোটা অশ্রু—এই মহতী নারীর জন্য।

তিনি অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস, মনোবল প্রেরণা জুগিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন স্বামীকে। তাই তো বাংলার মানুষ পেয়েছে আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। পেয়েছে আত্মপরিচয়ের সুযোগ। কিন্তু জাতি হিসেবে আত্মপরিচয়ের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কত রক্ত ঝরেছে, কত অশ্রু বিসর্জন হয়েছে। নীরবে কত আত্মত্যাগের কাহিনী ঘটে গেছে। কে কতটুকু সে খবর রাখে? আজ বাংলার মানুষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে তার জন্য কত মানুষের কত অবদান, সব কি জানা গেছে? কত অব্যক্ত কথা রয়ে গেছে।

যে ঘটনা ঘটেছে, যে কাহিনী পর্দার আড়ালে রয়েছে তার কতটুকু আর লিখে প্রকাশ করা যায়। এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের কাছে একটি আকুল আবেদন—তারা যেন একবার খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে এই না বলা ইতিহাস, না জানা কথা।

সমকাল

সৌজনে বিডি নিউজ

একনজরে বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের নিকট বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে আমরা যে স্বাধীন দেশে বসবাস করছি, সে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অতি দীর্ঘ হলেও '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ দুটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আর এই দুটি অংশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। আমরা তার বর্ণাঢ্য জীবনের নানা দিক নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করব।

পারিবারিক পরিচিতি

বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটগাতী ইউনিয়নের টুঙ্গিপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। বাবা-মায়ের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয়। বড় বোন ফাতেমা, মেজ বোন আছিয়া, সেজ বোন হেলেন, ছোট বোন লাইলী ও তার একমাত্র ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার। বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম ছিল খোকা। বঙ্গবন্ধু ছাত্র থাকাকালেই ১৯৩৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রীর নাম ফজিলাতুন্নেসা এবং তাদের পাঁচ সন্তান ছিলেন। যথা : শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবন

বঙ্গবন্ধু ১৯২৭ সালে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক পড়ালেখা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। তার ২ বছর পর ভর্তি হন মাদারীপুর ইসলামীয়া হাইস্কুলে। তার চোখে অপারেশন হওয়ায় কয়েক বছর শিক্ষা বিরতি ছিল। ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি আইন বিষয়ে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি আন্দোলন, সংগ্রাম ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন এ দেশের আপামর জনগণের জন্য। ছাত্র জীবনেই তিনি শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কাজী নজরুল ইসলামসহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন

বঙ্গবন্ধু ১৯৩৯ সালে জেলা ও প্রাদেশিক ছাত্রলীগের কাউন্সিলর, ১৯৪০ সালে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ও গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালে ইসলামীয়া কলেজে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধু মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে বেঙ্গল মুসলিম লীগের সাথে জড়িত হন ও কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ইসলামীয়া কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামীয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ইস্ট পাকিস্তান ছাত্রলীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার যখন বলেন, Urdu would officially be the state language of Pakistan, তখন প্রতিবাদ করে তিনি জেলে যান এবং জেলেও তিনি ১৩ দিন Hunger Strick করেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ মুক্তি পান এবং মুক্তিপ্রাপ্ত অন্য নেতাদের সম্মানে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি একই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯৪৯ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের ইস্ট পাকিস্তান ইউনিটের যুগ্ম সম্পাদক এবং ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ যুক্তফ্রন্ট থেকে নির্বাচন করে তিনি 'East Bengal Legislative Assembly'র সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালের ৫ জুন গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি শিল্প, বাণিজ্য, দুর্নীতি দমন, গ্রাম রক্ষা ও শ্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। এ বছর যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ৩০ মে তিনি 'মন্ত্রী' পদ থেকে পদত্যাগ করে সংগঠনকে পূর্ণ সময় দিতে থাকেন এবং ৭ আগস্ট চীন ও রাশিয়া সফর করেন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইউব খান সামরিক শাসন জারি করলে ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। মিথ্যা মামলায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়। আবার মুক্তি পান ১৯৬১ সালের ৭ ডিসেম্বর। মুক্তি পেয়ে গঠন করেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ। আবার গ্রেফতার হন ১৯৬২ সালে, ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান হন। তখন তিনি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম-অমুসলিম সকলকে নিয়ে এ সংগঠনকে ঢেলে সাজানো। বঙ্গবন্ধু আইউব খানের বেসিক ডেমোক্রেসির বিরোধিতা করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। ফলে ১ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয় তাকে। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন ১৯৬৬ সালে। একই বছর তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এ বছরে ৩ মাসে ৮ বার

গ্রেফতার হন। মাঝখানে তার বিরুদ্ধে এবং ৩৪ জনকে আসামী করে ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয় এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফা এবং গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশে প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-জনতার সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিশেষ করে ৫ ডিসেম্বর '৬৯ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'East Pakistan would be called Bangladesh' ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ২টি আসন ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের সব আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সে এক ঐতিহাসিক ও অতুলনীয় ভাষণ দান করেন বঙ্গবন্ধু। ২৬ মার্চ রাতে আবারও বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করা হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় ফয়সালাবাদ জেলে। দেশ স্বাধীন হলে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। ১১ এপ্রিল ১৯৭১ তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন, যা ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের ২য় প্রধানমন্ত্রী হন, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ পর্যন্ত এ পদে আসীন ছিলেন। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ তিনি বাংলাদেশের ৪র্থ প্রেসিডেন্ট হন, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সপরিবারে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ পদে আসীন থাকেন। ২ জানুয়ারি ১৯৭৫ তিনি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, ৬ জুন বাকশাল গঠন করেন এবং বাকশালের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ফলে তিনি আজীবন প্রেসিডেন্ট হন ও বিরোধীদল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। গঠিত হয় রক্ষীবাহিনী। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানা জার্মানীতে ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে জাতিসংঘ, OIC, IDBসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস-্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু শান্তিতে অবদান রাখার জন্য জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৪ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন। তিনি রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর বহু দেশ। ৫৫ বছর জীবনের রাজনৈতিক অংশে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করানো, চোরাকারবারী বন্ধ, দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসাসহ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ছিল তার স্বপ্ন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মিলে ১৬ জনকে হত্যা করে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী অফিসার। পারিবারিক জীবন প্রাচুর্যের সীমাবদ্ধতা ও আভিজাত্য না থাকলেও যে একজন মানুষ এ রকম বরেণ্য নেতা হতে পারেন, তার উদাহরণ রেখে গেলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে। তৃতীয় সন্তান মুজিবকে খোকা বলে ডাকতেন শেখ লুৎফর রহমান ও মোসাম্মৎ সায়রা বেগম দম্পতি। ৭ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। দুই বছর পর গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে মিশনারি স্কুলে। কিন্তু ১২ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তার লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে। চার বছর পর আবার স্কুলে ভর্তি হন। চাচাতো বোন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সে।

১৯৪০ সালে মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স (এখনকার এসএসসি) পাসের পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এ বছরই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পরের বছর মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে মুজিব ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের 'ষড়যন্ত্রের' প্রতিবাদে ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকেন। ধর্মঘট পালনকালে সহকর্মীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন মুজিব। ছাত্র আন্দোলনের মুখে ১৫ই মার্চ তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের বছর ২১শে জানুয়ারি মুক্তি পান মুজিব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবি আদায়ে ধর্মঘট ঘোষণা করলে মুজিব সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ১৯শে মার্চ কর্তৃপক্ষ তাকে জরিমানা করে। এ নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন মুজিব। ১৯শে এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৩শে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। কারাবন্দি মুজিব এর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসে মুক্তি পেয়েই খাদ্য সঙ্কটের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ায় ১৪ই অক্টোবর তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এবার প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয় মুজিবকে।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে বন্দি অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালনের জন্য সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান মুজিব। এ দাবিতে ১৪ই ফেব্রুয়ারি জেলখানায় অনশন শুরু করেন তিনি।

২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজের মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহীদ হন। মুজিব জেলখানায় এর প্রতিবাদে টানা ১৭ দিন অনশন করেন। ১৯৫৩ সালের ৯ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিই পায় যুক্তফ্রন্ট। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। ১৫ই মে তিনি প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ৩০শে মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০শে মে মুজিব করাচি থেকে ঢাকায় ফেরেন এবং গ্রেপ্তার হন। ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি পান।

১৯৫৫ সালের ৫ই জুন মুজিব গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭ই জুন পল্টন ময়দানের জনসভায় আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করে। দলকে সব ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে ২১শে অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয়। মুজিব আবার দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংগঠনকে সুসংগঠিত করতে ১৯৫৭ সালের ৩০শে মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরের বছরের ৭ই অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ই অক্টোবর মুজিবকে গ্রেপ্তার করে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। প্রায় চৌদ্দ মাস পর মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেটে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের এক সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও মুজিব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরালোভাবে তোলা হয়। ১লা মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন।

১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেপ্তার হন মুজিব। ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাকে প্রধান আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও মামলায় আটকদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে—যা গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলি আর বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১লা ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায়। ২২শে ফেব্রুয়ারি চাপের মুখে সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে মুজিবসহ আসামিদের মুক্তি দেয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়। এ সময় তিনি ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানান। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ই মার্চ তিনি বৈঠক ত্যাগ করে ঢাকা চলে আসেন। ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন।

১৯৭০ সালের ৬ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টির মধ্যে ৩০৫টি আসন পায় দলটি। ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু ১লা মার্চ তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আওয়ামী লীগ ২রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল ডাকে। হরতালের পরদিন বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। ৭ই মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু অনিবার্য হয়ে ওঠা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়ে ঘোষণা দেন—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৬ই মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর আলোচনা হয়। ২৫শে মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। বলা হয়ে থাকে এ সময় পাকিস্তানী বাহিনী আসলে দমন অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতেই নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন। এতে তিনি বলেন, 'সম্ভবত এটাই আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তিনি সবাইকে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানান। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। এরপর ২৭শে মার্চ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষণাপত্রটি

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিকবার পাঠ করেন। ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেন এবং তাকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। ১০ই এপ্রিল বঙ্গন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ হয়। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশকে সহায়তাকারী ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বাংলাদেশী মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে নতি স্বীকার করে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩-এ নতুন সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৩টি। এরপর ৩রা সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিসহ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৬ই জুন বঙ্গবন্ধু এক বিতর্কিত উদ্যোগে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য তাকে এটি করতে হচ্ছে এবং এটি দেশের জন্য ভাল হবে।

মানবজমিন
২০ নভেম্বর ২০০৯

বিবিসির শ্রোতা জনমত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

বাংলাদেশ যে আজ একটি স্বাধীন দেশ আর আমরা সেই স্বাধীন দেশে বাস করি তার পেছনে রয়েছে অনেক ইতিহাস। আর মুক্তির সে ইতিহাসের মহানায়ক হচ্ছেন জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই নিরলস চেষ্টা আর নির্ভীকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠেছিলো একটি নির্যাতিত পরাধীন জাতি। তারা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরাজিত করেছিলো বিশ্বের অন্যতম এক সামরিক বাহিনীকে। এ সবই সম্ভব হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের সঠিক নির্দেশনা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায়। আর এ কারণেই এ দেশের ঘরে ঘরে শেখ মুজিবুর রহমান এক অবিস্মরণীয় নাম হয়ে উঠেছেন।

জন্ম ও ছেলেবেলা

শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা। পিতা-মাতার ছয় সন্তানের ভেতর মুজিবের স্থান ছিলো তৃতীয়। আর পুত্রদের ভেতর বড় ছিলেন তিনি। ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ (১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র) জন্মগ্রহণ করেছিলেন জাতির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমান মাদারীপুর দেওয়ানি আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন। সৎ, দয়ালু আর প্রতিবেশীদের মঙ্গলকামী বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমানের মা সাহেরা খাতুনও ছিলেন যেমন ধার্মিক তেমনি স্নেহপরায়ণ। গ্রামের গরিব-দুঃখি ও অসহায় মহিলাদের সাধ্যমতো দান-খয়রাত করতেন তিনি। এতিম অসহায়দের আশ্রয় দিতেন নিজের বাড়িতে। আর বাবা-মায়ের এই ভালো গুণগুলোরই উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আর বাবা-মায়ের ভালো গুণগুলোর উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব, যুবক-বৃদ্ধ, শ্রমিক-মজুর, কুলি-মুটে সবাইকে স্বাধীনতার দাবিতে একতাবদ্ধ করা। দেশকে স্বাধীন করা। দেশের মানুষকে মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যের দুর্গ গড়ে তোলা।

শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা জীবন

ছোটবেলা থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। তাঁর ছিলো চমৎকার সাংগঠনিক শক্তি। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দল গঠনে উৎসাহের অন্ত ছিলো না তাঁর। ছোটরা তাঁকে ডাকতো খোকা ভাই বলে। ওটাই ছিলো শেখ মুজিবের ডাক নাম।

গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় তাঁর। গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শেষ হলে ১৯২৭ সালে মুজিবকে ভর্তি করা হয় গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে খুব বেশিদিন লেখাপড়ার সুযোগ পাননি তিনি। কারণ এগারো বছর বয়সে ১৯৩১ সালে মাদারীপুরের ইসলামিয়া হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয় শেখ মুজিবকে। এখানে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। এ রোগের কারণে চোখও নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। পরে কলকাতায় তাঁর চোখের চিকিৎসা করানো হয়। ইসলামিয়া হাইস্কুলেও বেশিদিন থাকা হয়নি শেখ মুজিবের। কারণ এরই মাঝে তাঁর পিতাকে বদলি করা হয়েছিলো গোপালগঞ্জ সদরে।

পরে গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয় শেখ মুজিবকে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নাম ছিলো গিরিশ চন্দ্র। এ স্কুলে মাঝেমধ্যেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। অন্য স্কুলের ছেলেদের সাথে আয়োজন করা হতো ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা। কিশোর মুজিব অংশগ্রহণ করতেন সে সব খেলায়। আর এজন্যে স্কুলের বন্ধুরা অধিনায়ক হিসেবে মেনে নিয়েছিলো কিশোর মুজিবকে।

শেখ মুজিব যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন (১৯৩৯) তখন উপমহাদেশ জুড়ে চলছিলো ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। এসব আন্দোলন যাঁরা পরিচালনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর শের-ই-বাংলা ফজলুল হক। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪০ সালে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক আর খাদ্যমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী এসে হাজির হন গোপালগঞ্জে। এ কথা জানতে পেরে মুজিব ছুটে যান তাঁদের কাছে। তাঁদের প্রশ্ন করে জেনে নেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের কথা শুনে শিহরিত হতেন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমান যখন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের ছাত্র তখনই তিনি বিয়ে করেন তাঁর চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেসাকে। ফজিলাতুন্নেসার ডাক নাম ছিলো রানু।

গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা (মেট্রিক সমমান) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেন শেখ মুজিব। তারপর পড়াশোনার জন্য চলে যান কলকাতায়। সেখানে গিয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই অপরের অভাব মোচন করার মানসিকতা অর্জন করেছিলেন তিনি। কলকাতায় তখন মুসলমান ছাত্রদের থাকার জন্যে মাত্র দুটো ছাত্রাবাস ছিলো। একটি ধর্মতলা স্ট্রীটে—নাম বেকার হোস্টেল। অন্যটি কারমাইকেল হোস্টেল। শেখ মুজিব বেকার হোস্টেলে থাকতেন।

সবেমাত্র মুসলমান সমাজে তখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তনের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিলো কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের মাঝেও। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা। তাই মুসলিম ছাত্রাবাস দুটোতে বিরামহীনভাবে চলতো রাজনৈতিক আলোচনা। আর শেখ মুজিবের জন্য এমন একটা পরিবেশ তাঁকে পরবর্তীতে জাতির মহানায়ক হতে সাহায্য করেছিল। এর ফলে কলকাতায় এসে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে খুব বেশি দেরি হয়নি তাঁর। আর যখন কোনো সাহায্য সহযোগিতার দরকার পড়ত তিনি উপদেশ নিতেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর।

ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছিলো একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন—'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। সে সময়কার বড় বড় নেতারাই ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য। শেখ মুজিবুর রহমানও যোগ দেন মুসলিম লীগে। চালিয়ে যেতে থাকেন সভা-মিছিল। প্রথম সারির নেতাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন শহর থেকে গ্রামে—গ্রাম থেকে শহরে, দিনের পর দিন। ফলে নেতাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। রাজনীতিই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান।

খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে একবার ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাবার কথা ছিলো। তিনি তখন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। রাত আটটার সময় ছাত্রদের সভা শেষ হলে মিছিল নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এ মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন কে? ছাত্র মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়া তো চাট্টিখানি কথা নয়! তার ওপর পুলিশের খাতায় নাম উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলোই। তাই নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে পাওয়া যাচ্ছিলো না কাউকেই। এমন সময় শেখ মুজিব মিছিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকারের কথা জানাতে যাচ্ছি আমাদেরই প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সুতরাং ভয় পাবারও কিছু নেই। এ মিছিলের নেতৃত্ব আমিই দেবো যদি কারো কোনো আপত্তি না থাকে।

অবশেষে তাই হলো। নির্ভীক মুজিবের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন ছাত্রের সেই মিছিল গিয়ে পৌঁছলো প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে। খাজা নাজিমুদ্দীন ঘরে ঢুকেই জানতে চাইলেন রাতে মিছিল নিয়ে তাঁর বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য কি? শেখ মুজিব বললেন তাঁদের দাবি-দাওয়ার কথা। সব শুনে তুখোড় রাজনীতিক নাজিমুদ্দীন বললেন, আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে। এখন নিজ নিজ হোস্টেলে ফিরে যাও।

মুজিব বললেন, আপনারা তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। নেতাদের কাছে মুসলমান ছাত্ররা শুধু বারবার প্রতিশ্রুতিই পেয়ে আসছে—সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমরা কি করে বুঝবো আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন?

শেখ মুজিবের এই নির্ভীক ও স্পষ্ট অভিযোগ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। পথে নেমে সিদ্ধান্ত হলো এবার সবাই মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পার্লামেন্টারি

সেক্রেটারি বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর কাছে। তাঁকেই জানানো হবে ছাত্রদের সমস্যার কথা।

বগুড়ার ঝানু রাজনীতিবিদ ছিলেন মোহাম্মদ আলী । তিনিও মিষ্টি কথায় মিছিলকারীদের বিদায় করে দিলেন তাঁর বাসভবন থেকে। শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। আন্দোলন চালাতে হবে আরো শক্ত হাতে। এজন্যে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীর তখন খুব নাম-ডাক ছিলো ছাত্রনেতা হিসেবে। তিনি তখন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়ছিলেন। থাকতেন কারমাইকেল হোস্টেলে। শেখ মুজিব সোজা চলে যান তাঁর কাছে। ফজলুল কাদের চৌধুরীকে অনুরোধ করেন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে। মুজিবুরের অনুরোধ মেনে নেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বে সত্যি সত্যিই ছাত্রদের আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। ফলে সরকার ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মুজিব যখন ইসলামিয়া কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তখন তিনি ফরিদপুর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আর সভাপতি ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান। একবার তিনি প্রস্তাব করলেন সমিতির পক্ষ থেকে বাংলার নতুন গভর্নরকে সংবর্ধনা জানাতে হবে। কিন্তু মুজিব বললেন, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। আমরা চাইছি ইংরেজ শাসনের অবসান। সেখানে কি করে তাদেরকে সংবর্ধনা দেবো? এটা ভারতবাসীদের জন্যে অপমানজনক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে, আর আমাদের জন্যে হবে হঠকারী সিদ্ধান্ত। না, আমি একমত নই আপনার সাথে। লতিফুর রহমানও ছিলেন দেশদরদী রাজনীতিবিদ। শেখ মুজিবের দৃঢ়তা আর সুচিন্তিত মতামত শুনে সেদিন আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর বললেন, সত্যি, এমন গভীর করে ভেবে দেখিনি আমি। তোমার কথাই সত্যি।

শেখ মুজিব ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে ফরিদপুর যান। ফরিদপুর জেলার প্রতিটি গ্রামে ঘুরে, পথে-প্রান্তরে ছুটে ছুটে প্রচারণা চালিয়ে যান মুসলিম লীগের পক্ষে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথম থেকেই নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন শেখ মুজিবকে। মুজিবের ফরিদপুর প্রচারণার পর দুজনার সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরো অন্তরঙ্গ। একজন হয়ে ওঠেন অন্যজনার আরো কাছের মানুষ। আর এভাবেই বিস্তার লাভ করে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবিসির শ্রোতা জনমত জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন।

বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যার বজ্রকণ্ঠ ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্তি ও স্বাধীনতার পথনির্দেশ করেছিল। শেখ মুজিবকে কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মনোনীত করেছেন, বিবিসি, বেতারের এ প্রশ্নের জবাবে জাপানের নাগাসাকি শহর থেকে মণিকা রশিদ বলেন, আজ আমরা সারাবিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যে যেখানেই বসে যা কিছু করছি বা বলছি তার কোনোটাই সম্ভব হতো না যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়টাতে না পেতাম। তিনিই বাঙালি জাতিকে প্রথম বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, সর্বোপরি বাঙালি জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। তার ৭ মার্চের ভাষণ মন্ত্রের মতো সমগ্র বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর একটি সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়াইয়ে নামতে এবং সেই লড়াইয়ে জিততে উদ্দীপ্ত করেছিল।

ইংল্যান্ডের ওয়ারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনাত হুদা বলেন, বাঙালি জাতিকে ইমাজিন করার ক্ষেত্রে বহু সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। কিন্তু বাঙালি জাতি যদি হয় একটি স্বপ্নের নাম, আকাঙ্ক্ষার নাম, সংগ্রামের নাম এবং সফলতার নাম তবে তার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আবহমানকালের শাশ্বত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বপ্নকে মুজিব বাস্তবায়িত করেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ বাঙালি জাতি হিন্দুর নয়, মুসলিমের নয়–এটা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ সকলের। যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি। মুজিব তার অসাধারণ প্রজ্ঞা, মেধা, ত্যাগ, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছেন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণকারী শেখ মুজিব স্কুলজীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬০-এর দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা।

'সাপ্তাহিক এখন' পত্রিকার সম্পাদক আতাউস সামাদ বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে এসে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দলটিকে শক্তিশালী করেছিলেন। তবে যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে না পারায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, শেখ সাহেব সাহস করে ছয় দফা ঘোষণা করেন, তাও করলেন তিনি লাহোরে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটা সম্মেলনে গিয়ে তিনি এই ছয়দফা ঘোষণা করলেন। যার ফলে তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে যে মামলাটি হয় তাতে এক নম্বর আসামী করা হল। এরপর তাকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু হল। যেটা ছাত্রদের ১১ দফায় রূপ নিল। এবং ওখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হল।

'৭০-এর নির্বাচনে শেখ মুজিব তার নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকেই মূল বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এ ব্যাপারে সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন, বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী যে প্রচারণাগুলো করেছেন তার অনেকগুলো জায়গায় আমি তার সঙ্গে গিয়েছি। তিনি সবখানেই ছয় দফার কথা বলতেন এবং ছয় দফা না হলে একটা আঙুল তুলে বলতেন আমার দাবি 'এই' অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করতে হবে।

দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দেশে ফেরার পর তিনি বলেছিলেন,

"দুশো বছর ইংরেজ আমলে ইংরেজরা বাংলাদেশকে শোষণ করেছে, তারপর ২৩ বছর যা কিছু হাড়-মাংস ছিল পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গেছে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে আর কেউ শোষণ করতে পারবে না। কোনো শক্তি এ দুনিয়ায় নেই এবং এটা শোষণহীন সমাজ হবে এবং এখানে হবে গণতন্ত্র, এখানে হবে সমাজতন্ত্র। বাংলার জমি উর্বর, দুনিয়ায় তুমি ঘুরেছ আমিও দুনিয়া দেখেছি কিন্তু এমন সোনার দেশ, এমন সোনার মাটি কোথাও দেখেছ তুমি? যদি আমার দেশে মানুষকে বিদেশিরা শোষণ না করত তাহলে আমার দেশের মানুষ এমন দুঃখি হতো না। যদি শোষণ বন্ধ করতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা হবে।"

বিবিসির মতামত জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক ভাষ্যকার সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমি তার নেতৃত্বের তিনটি বড় গুণ দেখি। প্রথমত তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, দৃঢ়চেতা ছিলেন এবং আপোসহীন ছিলেন। যেটা আমাদের দেশের নেতৃত্বের বড় অভাব আমরা দেখেছি। অন্যরা আপোস করে ফেলেন এবং ওইভাবে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান না। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য দেখেছি তার নেতৃত্বে সেটা হল এই যে, তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রধান দ্বন্দ্ব কী, সেটা খুব সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি এটা জেনে নিয়েছিলেন। ওই রাষ্ট্রে বাঙালির সঙ্গে রাষ্ট্রের অর্থাৎ পাকিস্তানি রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ব্যক্তি হিসেবে তার মধ্যে অসাধারণ গুণ ছিল। তার আকর্ষণ শক্তি ছিল প্রখর। তিনি জনগণকে বুঝতেন, জনগণের সঙ্গে মিশতে পারতেন। তাদের ভাষা জানতেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। কাজেই আমরা দেখব যে তার মধ্যে বীরত্ব ছিল এবং নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ছিল। এসব কিছুর সমন্বয় ঘটেছিল যা অসাধারণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি একটু গোড়া থেকে শুরু করতে চাই কিছু তাত্ত্বিকভাবে। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৯৪ সালে দি আটলান্টিক মান্থলি পত্রিকায় গ্যারি উইলস নামে একজন গবেষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'হোয়াট মেকস এ গুড লিডার।' সেখান থেকে সামান্য একটু উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি— লিডারস হেভ এ ভিশন অলওয়েস রেসপন্স টু ইট। 'লিডারস অর্গানাইজ দ্যা প্ল্যান' এ উদ্ধৃতি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে নেতার তার অন্তত তিনটি বিষয় থাকতে হবে—তিনি একদিকে নেতা, তার অনুসারী আছে এবং নেতা তার অনুসারীদের নিয়ে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে এগোবেন। যেমন ধরা যাক সেই '৫০-র দশক থেকেই মোটামুটিভাবেই যখন তিনি প্রথম বলেছিলেন যে পাকিস্তান কন্সটিটিউশন এসেম্বলিতে ইস্ট পাকিস্তান বলা যাবে না, পূর্ব বাংলা বলতে হবে। বাংলাদেশের ধারণা তার মধ্যে ছিল স্পষ্ট। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হল—একটা দুর্লক্ষ্য সামনে রেখেই জনগণকে অনুসারী করেছিলেন এবং সেই জন্য ওই জায়গাটিতে আমাদের জন্য বড় উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় যে আমরা '৪৭ থেকে '৭১—এ সময়টাতে অনেক নেতা পেয়েছি। যাদের অবদান কম নয় কিন্তু তাদেরকে

ছাড়িয়ে জনগণের মুখপাত্র হয়ে ওঠা, জনগণের ভাবনা, চেতনা, অভিলক্ষ্য, স্বপ্ন সবকিছু তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ড. কামাল হোসেনকে নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করতে বলা হলে তিনি বলেন, আমি উনার ক'টি অসাধারণ গুণের কথা বলব। একটা হল যে, বাংলাদেশের মানুষের মনের অবস্থা উনি যেভাবে বুঝতে পারতেন এবং সেটাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন—কয়েকটি ঘটনার মধ্য থেকে সেটা বোঝা যায়। সর্বপ্রথমে '৫৯ সালে যখন উনার সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন তো মার্শাল ল দেশে। তখন বলেছিলাম, এই ভয়াবহ অবস্থা আমাদের আর কতদিন সহ্য করতে হবে? তখন উনি হেসে বলেছিলেন, পাঁচ বছর, খুব বেশি হলে দশ বছর। তারপর তারা টিকতে পারবে না। এদেশের মানুষ মেনে নেবে না। '৫৯-এ যেটা বলেছিলেন '৬৯-এ যখন আইউব খান বিদায় নিচ্ছে আমি রাউন্ড টেবিল কনভেনশনে উনার কর্মী হিসেবে গেছি। ওখানে আমি বলেছিলাম, আপনি তো '৫৯-এ একথা বলেছিলেন পাঁচ বছর না হলে দশ বছর। কিন্তু একদম মাপা দশ বছরে সে বিদায় নিয়েছে। আরেকটা ছিল যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আইউব খান বলল যে ছয়দফা মানবে না নির্বাচন ঘোষণা দেবে উনি সেটা গ্রহণ করতে পারলে গ্রহণ করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সেটা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। এই যে ওখানে বসে তাৎক্ষণিক ঘটনার মূল্যায়ন করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হল এবং দেখা গেল যে হ্যাঁ সারা বাংলাদেশের মানুষ সেটা গ্রহণ করেছে এবং যখন আমরা ফিরে আসলাম যখন উনি ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলেন যারা তাকে সমর্থন করেননি মানুষ তাদেরকে খুঁজতে শুরু করল যে তারা কোথায়? তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বঙ্গবন্ধুকে নেতা হিসেবে তারা সবাই গ্রহণ করল। বাঙালির একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

বিবিসির জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, আজ প্রমাণিত হলো ইতিহাস কথা কয়। ইতিহাস তার অমোঘ নিয়মে চলে। ইতিহাস সত্যকেই প্রকাশ করে। ইতিহাস প্রতিশোধ নেয়। ইতিহাসকে যারা বিকৃত করে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আওয়ামী লীগের এক বিশাল ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ধন্যবাদ জানাই বিবিসির শ্রোতামণ্ডলীকে, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বাঙালি জাতিকে, ধন্যবাদ জানাই বিবিসি জরিপে অংশগ্রহণকারীদের, যারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বীকৃতিকে আবারও তুলে ধরেছেন। এ গর্ব সমগ্র বাঙালি জাতির।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এ দেশের দুঃখি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র চাওয়া-পাওয়া। যার জন্য জীবনে তিনি জেল, জুলুম, হুলিয়া কোনো কিছুই পরোয়া করেন নি। শত যন্ত্রণা, দুঃখ, কষ্ট-বেদনাকে তিনি সহ্য করেছেন। ফাঁসির মঞ্চও যাঁর কাছে ছিল তুচ্ছ—তিনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ হাসিনা তার আবেগময় ভাষণে বলেন, আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শহীদ তিতুমীর, সূর্যসেন, কবি জসীমউদ্‌দীনসহ অন্যদের, যারা বাঙালি জাতিকে তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম লেখনি আর মেধা-প্রজ্ঞা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একটি নাম—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি বাঙালি জাতিকে এনে দিয়ে গেছেন তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। একটি দেশ, একটি জাতি, একটি মানচিত্র উপহার দিয়ে গেছেন বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ স্মরণ করি বাঙালি জাতির সেইসব বীর শহীদদের কথা, যারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে জীবন দিয়ে গেছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তার ভাষণে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্তির মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে। এই স্বাধীনতা ও মুক্তির নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন আর সংগ্রামের ইতিহাস। '৫২, '৬২, '৬৬ আর '৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থানের পথ পেরিয়ে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে আনে তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ মানুষের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন বাঙালির হাজার বছরের সেই শ্রেষ্ঠ ঘোষণা– 'এবারের সংগ্রাম-আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাঙালি জাতি জীবন বাজি রেখে বঙ্গবন্ধুর ওই ঐতিহাসিক ঘোষণাকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। পৃথিবীর আর কোনো ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এই ঐতিহাসিক ভাষণের মতো এতোবার বাজানো হয়নি, এতো বার মানুষ শোনেনি। এমনভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেনি।

এই ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বাসভবন থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্তও আমরা জানতাম না তিনি বেঁচে আছেন কিনা? ১০ জানুয়ারি বীরোচিত সংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন তার স্বপ্নের স্বাধীন-সার্বভৌম

বাংলাদেশে। ফিরে এসে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করেছিলেন—দ্রুত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সমস্যা মিটিয়ে জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী প্রক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে এই ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বাসভবনেই নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিনও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোসহীন থেকে জীবন দিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধু তার বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের রক্তঋণ শোধ করে গেলেন।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর এই ২৯টি বছর ধরে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ওই একটি নাম মুছে ফেলার জন্য অনেক অপতৎপরতা চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার জন্য নানাভাবে তারা ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, ইতিহাসকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি কোনোদিন। আজ প্রমাণিত হয়েছে ইতিহাস সব সময় সত্যকে তুলে ধরে। সত্যকে প্রকাশ করে। ইতিহাস তার আপন গতিতে চলে। হত্যা করে কিংবা ইতিহাস বিকৃত করে বাঙালির হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা যায় না। যাবে না।

বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ রেহানা লন্ডন থেকে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত করায় বিবিসির শ্রোতাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। এ থেকে আবারও প্রমাণিত হলো ইতিহাস যার যে স্থান প্রাপ্য—তার জন্য সেই স্থানই নির্ধারণ করে। ইতিহাস সত্যকেই প্রকাশ করে। তিনি বলেন, কেউ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাঙালির মানসপট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবেন আপন ত্যাগী মনোভাব ও রাজনৈতি দূরদর্শিতার কারণে।

অন্তরঙ্গ আলোকে বঙ্গবন্ধু

এবিএম মূসা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, তার বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে গতকাল। এ উপলক্ষে আমরা স্মরণ করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে সর্বোচ্চ পর্বতমালার উচ্চতা মাপা যায় না। মাত্র দেড় শতাব্দী আগে একজন বাঙালি ভূজরিপকারী পর্বতশৃঙ্গটির উচ্চতা নির্ণয় করেন–ন্যূনধিক ২৯ হাজার ফুট। পর্বতমালার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে নয়, হিলারি-তেনজিংয়ের মতো পর্বত-অভিযানে চূড়ায় উঠেও নয়, শত মাইল দূরে বিহারের কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে তিনি এই উচ্চতা নির্ণয় করেন। তবে গজ-ফিতা দিয়ে হিমালয়-সদৃশ শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক উচ্চতা অনুমান করা যেত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বা হৃদয়ের বিশাল ব্যাপ্তি গজ-ফিতা দিয়ে মাপা সম্ভব ছিল না। শুধু কাছে-দূরে থেকে তাঁর জীবনকালের কীর্তি ও অর্জন, রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর সফলতা-বিফলতা, স্বল্পকালীন রাষ্ট্র পরিচালনাকালে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা অথবা দুর্বলতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেত। আমাদের অনেকের, যাঁদের তাঁর পাদদেশে যাওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে, আমরা তাঁর কীর্তি ও কর্মধারার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন বোধ করিনি, এখনো করি না। আমাদের আছে শুধু কাছে পাওয়ার, অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে যাওয়ার মধুর স্মৃতি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, রাজনীতির প্রবাদপুরুষ, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিকে, শেখ মুজিবুর রহমানকে অতিসন্নিকটে দেখার সামান্য স্মৃতি রোমন্থন করব। তাঁর ব্যক্তিত্বের আলোকচ্ছটার একটুখানি ঝলক অন্তরঙ্গ আলোক দু-চারটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব। আমি ২৪ বছরের সান্নিধ্যকালে বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি, একচোখা দৃষ্টিতে মুজিব ভাইকে দেখেছি। বঙ্গবন্ধু বলতাম না। তাই তো আমাকে দেখলেই বলতেন, 'বন্ধুবন্ধু সবার বন্ধু, তোমার বন্ধু নয়?' এম. আর. আখতার মুকুল, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও আমি ছিলাম সাংবাদিকদের মধ্যে তাঁর অতি প্রিয় তিনজন। একসঙ্গে দেখলেই বলতেন, 'এই রে সারছে! আপদ, বিপদ আর মুসিবত একসঙ্গে। কী জানি কী ফ্যাসাদে ফেলবে!' ফ্যাসাদে তাঁকে ফেলেছি বহুবার। শুধু দুটির কথা বলব। সে দুটি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও তা বঙ্গবন্ধুর একটি ভিন্ন পরিচয় ফুটিয়ে তুলবে। তরুণ শেখ মুজিবের সঙ্গে একান্ত

পরিচয় হয়েছে একবারের চোখে দেখায়– পঞ্চাশের দশকের প্রথম বছরে তাঁর আয়োজিত একটি যুব সম্মেলনে। পরে সুদীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকের পেশাগত কর্তব্য পালনের সুবাদে অথবা অবসর মুহূর্তের পরম সান্নিধ্যের সুযোগে তাঁকে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কাছে পেয়েছি। ব্যক্তি মুজিব স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ও অনেককে এতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন যে, রাজনীতিতে কীর্তিমান ইতিহাসের মহাপুরুষ বা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে অন্য কোনো মানদণ্ডে যাচাই করে দেখিনি। মজার ব্যাপার হলো, এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও আবদার আর অনুযোগ করে তাঁর কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ বা অনুকম্পা পাইনি। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে অনুযোগগুলোর– তাঁর ভাষায় 'মুসিবত'-এর কয়েকটি উদাহরণ দেব।

পাকিস্তান থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরের দিন ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২। বঙ্গবন্ধু আমাকে ধামন্ডির অস্থায়ী বাসভবনে ডেকে পাঠালেন। তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম মহাপরিচালকের পদে নিয়োগ দিলেন। আমি বিব্রতবোধ করে বললাম, 'নেতা, আমি সংবাদপত্রের লোক, টেলিভিশন বুঝি না।' বঙ্গবন্ধু রেগে বললেন, 'আমাকে বুঝিস তো?' উত্তর দিলাম, 'সবটা না হলেও বোধহয় অনেকখানি বুঝি।' তিনি বললেন, 'যা, তাতেই হবে।'

বহু বছর পর ভেবেছি, সত্যিই তো বঙ্গবন্ধুকে যারা বুঝেছিল, তারাই শুধু বাঙালিকে চিনেছিল, বাংলাদেশকে ভালোবাসতে পেরেছিল। কয়েক মাস পর বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'ও আমার দ্বারা হবে না। টেলিভিশন ছেড়ে দেব।' এরপরও নিস্তার নেই, আমাকে অধুনালুপ্ত দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর সম্পাদকের পদে নিয়োগ দিলেন। ওই একই বছর তৎকালীন জার্মান দূতাবাসের প্রেস সচিব মিস্টার ব্রিম আমাকে ও প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব আমিনুল হক বাদশাহকে তাঁর দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির জন্য বর্তমানের সুগন্ধা পুরোনো গণভবনের দোতলায় বাদশাহকে নিয়ে একদিন দুপুরে দোতলায় প্রধানমন্ত্রীর বিশ্রামঘরে ঢুকে পড়লাম। তিনি 'আবার কী মুসবিত' বলে আবেদনপত্রটি হাতে নিলেন। পড়লেন, আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে দরখাস্তে কী যেন লিখে ফেরত দিলেন, 'এবার বিদায় হও।' আশান্বিত দৃষ্টিতে দরখাস্তের নিচের লেখাটি পড়লাম, 'দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের বিদেশযাত্রার অনুমতি দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত–শেখ মুজিব।' নতমস্তকে দুজন বেরিয়ে এলাম। পরিতাপের বিষয়, পঁচাত্তরে দেশত্যাগের সময় তাঁর হাতের লেখা এই অমূল্য নিদর্শনটি হারিয়ে ফেলেছি।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশ নিলাম ও নির্বাচিত হলাম। নির্বাচনী এলাকায় যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ি দরকার। এ সময় একদিন দেখা হলো কর্নেল জাফর ইমামের (বীর উত্তম) সঙ্গে। তিনি তখন মিলিটারি পুলিশের প্রধান। পদবি ছিল মার্শাল জেনারেল বা সে-জাতীয় কিছু। তিনি আমাকে জানালেন, সেনাবাহিনীর বেওয়ারিশ গাড়ি উদ্ধার অভিযানে পাওয়া একটি জিপ আছে অর্ডিন্যান্স ডিপোতে। দেখা করলাম (বর্তমান ডেপুটি স্পিকার) অর্ডন্যান্সের পরিচালক কর্নেল

শওকতের সঙ্গে। আগরতলা মামলা চলাকালীন অন্যতম আসামি কর্নেল শওকতের সঙ্গে আদালতেই পরিচয়। একাত্তরে কলকাতায় পাশাপাশি থাকার কারণে ঘনিষ্ঠতা। শওকত ভাই বললেন, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি লাগবে।' এরপর গণভবনে গেলাম প্রধানমন্ত্রী সমীপে, হাতে জিপটি বরাদ্দ চেয়ে আবেদনপত্র। তিনি বুকপকেট থেকে ঝরনা কলম বের করে আবেদনপত্রে লিখলেন, 'জীবনে কখনো কোনো অন্যায় আবদার প্রশ্রয় দেই নাই, ভবিষ্যতেও দেব না। আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।' দুর্ভাগ্য, এই মহামূল্যবান পত্রটিও হারিয়ে গেছে।

আজকে স্বল্প পরিসরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখার সময় যখন অনেক মধুর স্মৃতি, জানা-অজানা অন্তরঙ্গ কাহিনী রোমন্থন করছি, তখন শেষ দিনটির কথাও বলতে হয়। আজও ভাবলে রহস্যজনক মনে হয়, কেন জানি পঁচাত্তরের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে যাওয়ার পথে একটি অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তাঁর একান্ত কাছে ছিলেন পরিচিত সচিব ও অতিরিক্ত সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরী, ড. মশিহুর রহমান, মাহে আলম, ড. ফরাসউদ্দিন, নুরুল ইসলাম, অনু ইসলাম– তাঁদের বদৌলতে গণভবনে ছিল আমাদের অনেকের অবারিত দ্বার। ৩২ নম্বরের বাড়ির পেছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাওয়া যেত, সেটিও ছিল আমাদের সহজগম্য। পঁচাত্তরের প্রথম থেকেই সেসব পথে নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন আগে উল্লিখিত সচিব-উপসচিবদের স্থলাভিষিক্ত একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা আবদুর রহিম। যখন অতীত পর্যালোচনা করি, তখন ভাবি ১৫ আগস্টের আগের দিনগুলোতে পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাসভাজন-নিকটজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল কেন?

সদর প্রবেশপথ থেকে টেলিফোনে রহিম সাহেবের অনুমতি নিয়েই ১৪ আগস্ট পড়ন্ত বেলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দিনের কাজ শেষে তিনি গণভবনের ছোট্ট বাগানে পায়চারি করছেন। পাশে মহীউদ্দিন আহমদ, বরিশালের ন্যাপ মহীউদ্দিন নামে যাঁর পরিচিতি ছিল। পেছনে তাঁর পরমপ্রিয় তোফায়েল আহমেদ। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে পেছনে তাকালেন। যাঁর দুই ঠোঁটে সাদা কৌতুকী হাসির আভা দেখা যেত, তাঁর চোখেমুখে দেখলাম বিষণ্নতার ছায়া! আমি বহুদিন আগে যে কারণে গিয়েছিলাম, সেই একই কারণে, লন্ডনের সানডে টাইমস-এর আমন্ত্রণে একটি সেমিনারে যোগ দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আবেদনটি শুনলেন। বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'চলে যেতে চাস? যা, ফিরে এসে দেখা করবি তো?' মাঝেমধ্যে বেদানবিধুর মনে একান্ত বসে ভাবি, তিনি কেন সেদিন ফেরা কথাটি বলেছিলেন?

আমার তোলা বঙ্গবন্ধুর সেই ছবিটি

পাভেল রহমান

ামাদের আবাহনীর ফটোগ্রাফার পাভেল'–কামাল ভাই (শেখ কামাল) আমার পরিচয় দিয়ে বললেন বঙ্গবন্ধুকে। তিনি গণভবনের সবুজ লনে বসেছিলেন। সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে। সেদিন ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। বঙ্গবন্ধু আমার হাতটা ধরে বললেন, 'বাহ্, চমৎকার নাম তো!' তিনি খানিকটা বিস্মিত। কামাল ভাইকে বললেন, 'তোদের আবাহনীতে আবার ফটোগ্রাফারও আছে নাকি!' ১৯৭৪ সালের সেই সন্ধ্যায় আবাহনী ক্রীড়াচক্রের কর্মকর্তা আর খেলোয়াড় সবাই মিলে আমরা গিয়েছিলাম গণভবনে, বঙ্গবন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে।

আগের কথা বলি। আমি তখন যশোর জিলা স্কুলের ছাত্র। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলছে আদালতে। ইত্তেফাকে প্রকাশিত আদালতপাড়ার রিপোর্ট পড়তে পাড়া-মহল্লায় ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে বঙ্গবন্ধুকে আমার চেনা শুরু।

তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল জয় বাংলা বাহিনী। আমি ছিলাম সেই বাহিনীর সদস্য। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জয় বাংলা বাহিনীর সদস্যরা পল্টনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর চার খলিফা নামে পরিচিত আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে (ইরাকের রাষ্ট্রদূত) আমরা মার্চ করে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিতে যাচ্ছি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটির দিকে। দূর থেকে দেখছিলাম বঙ্গবন্ধু বাড়ির সামনে লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়ে। 'আইজ রাইট' বলে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি, তিনি হাত তুলে সালাম নিচ্ছেন। সেই তাঁকে আমি সামনাসামনি প্রথম দেখি।

এরপর বহুবার আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলেছি। তবে তাঁর শেষ ছবি তোলার ঘটনাটি আমার মন থেকে কখনই মুছবার নয়। সেদিন ছিল শেখ কামালের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। আমরা ৩২ নম্বরের বাড়িতে। তৃতীয় তলায় কামাল ভাইয়ের ঘরের সামনে বড় ছাদ। সেখানে আধো আলো, আধো অন্ধকারে কে যেন বসে আছেন একাকী। মুহূর্তে বুঝে ফেলি, তিনি কে। ফ্ল্যাশের আলোতে পুরো ছাদটাই যেন আলোর সমুদ্দুর। বাঙালির প্রাণপ্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু আমার সামনে। কাঁধের ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিয়েই শাটার ক্লিক! খোলা ছাদটায় বঙ্গবন্ধু তখন আধো আলো আধো অন্ধকারে চেয়ারে পা ভাঁজ করে বসে। হাতের পাইপটায় টান দেয়ার সময় হালকা লাল আলোর আভায় মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে থেকে থেকে। পরনে লুঙ্গি আর সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। পুরোটাই বাঙালি। বঙ্গবন্ধুর পায়ের কাছে আবাহনীর হারুন ভাই (প্রাক্তন সাংসদ) একান্তে বসে।

ফ্ল্যাশের আলোতে ততক্ষণে চোখে ধাঁধা লেগেছে বঙ্গবন্ধুর। 'কে? কে রে আমার ছবি তুললি?' গমগম করা ওই আওয়াজেই আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। 'তুই জানিস, আমি কে?'

'আপনি বঙ্গবন্ধু' কোনোমতে বললাম। হারুন ভাই ততক্ষণে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। 'ও আমাদের পাভেল'। বঙ্গবন্ধু এবার বললেন, 'আমি কি শুধু বঙ্গবন্ধু? আমি তো দেশের প্রেসিডেন্টও। প্রেসিডেন্ট কি গেঞ্জি পরে ছবি তোলে?' আমি হতচকিত। প্রেসিডেন্ট কি গেঞ্জি পরে ছবি তোলে– তাই তো, এ প্রশ্ন তো আমার মাথায় আসেনি আগে! দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তাঁর ছবি তুলেছি গেঞ্জি পরা অবস্থায়! তাঁর কাছে যেতে আমি কোনোদিন এত সব প্রটোকল নিয়ে ভাবিনি। বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধুই। তিনি যে 'প্রেসিডেন্ট'ও, এটা কখনো মাথায়ই আসেনি। আর তিনিও রাষ্ট্রপতিসুলভ প্রাতিষ্ঠানিকতার দেয়াল তুলে আড়াল করেননি নিজেকে। মাথা নিচু করে তাঁর থেকে হাত দুয়েক দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি অপরাধীর মতন। পায়ের আঙুল দেখা না গেলেও নখ খোঁটার চেষ্টা করছি। এবার তাঁর বজ্রকঠিন গলা, 'তোর পানিশমেন্ট হবে।' শুনে আরও ভীত হয়ে গেলাম। আড়চোখে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছি। তিনি আবারও বলে উঠলেন, 'তোর পানিশমেন্ট হবে।' 'শরীফ'–যেন হুংকার। ডাকলেন এডিসি ক্যাপ্টেন শরীফ আজিজকে (পরে জেনারেল)।

গলা তো শুকিয়েছে আগেই, এবার হাঁটুর নিচটাও কাঁপছে। আমি ভাবছি, 'পানিশমেন্ট'টা কী হতে পারে। কেউ কী তবে ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছেঁচড়ে নামাবে আমাকে? হাতে থাকা বাবার প্রিয় ক্যামেরাটি কেড়ে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলবে? নাকি ফিল্মটা বের করে কচুকাটা করবে? মাথার ভেতরে এসব ভাবনার ঝড়। পানিশমেন্ট! গরম হয়ে উঠেছে কান। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এডিসি শরীফ আজিজ ছুটে এলেন। আমার হৃদস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। ক্যাপ্টেন শরীফকে কী বলবেন তিনি!

'শরীফ, আমার শার্টটা নিয়ে আয়'– বললেন বঙ্গবন্ধু। এবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমি শার্টটা পরব। তুই আমার আরেকটা ছবি তুলবি। এটা তোর পানিশমেন্ট।'

তখন সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে চারপাশ। কিন্তু পুরো পৃথিবী যেন ঝলমলে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল আমার সামনে। আকাশে যেন তারার ফুলঝুরি। ক্যামেরায় আমার যত ফিল্ম আছে, আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলে চলেছি। মনে হলো, দৌড়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু এঁকে দিই গালে।

শার্ট পরলেন তিনি। ক্যামেরা তুলতেই কোত্থেকে যেন ছুটে এসে ছোট্ট রাসেল ঝাঁপিয়ে পড়ল বঙ্গবন্ধুর কোলে। একটু পরেই এলেন কামাল ভাইয়ের বন্ধু, আবাহনীর কর্মকর্তারা। একটা গ্রুপ ছবি তোলা হলো। বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন, 'তোমরা সবাই আবাহনীর, আর আমি ওয়ান্ডারার্সের চিফ প্যাট্রন।' সঙ্গে সঙ্গে রাসেল অভিমানে গলা ফোলাল। বলল, 'তুমি ওয়ান্ডারার্স? তোমার সঙ্গে ছবি তুলব না।' বলেই সে দৌড়ে চলে গেল। তার কথায় হেসে উঠল সবাই। এই ফাঁকে বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুইও দাঁড়া আমাদের সঙ্গে।' শরীফকে ডেকে বললেন, 'একটা ছবি তুলে দে।'

বাংলাদেশের স্রষ্টা, গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি, অথচ অতি সাধারণ মানুষটির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

প্রথম আলো

ঢাবিতে বিশাল প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষা
১৫ আগস্ট তিনি আসবেন, এলেন না

সাইদুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আগমনকে কেন্দ্র করে পুরো ক্যাম্পাস সেজেছিল নতুন সাজে। ১৪ আগস্ট ক্যাম্প জুড়ে ব্যস্ততা ছিল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির। পুরো জাতির দৃষ্টি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। আমন্ত্রণপত্র বিলিবণ্টন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় বঙ্গবন্ধু আসবেন। অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে জাতি এক গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল যখন তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে সপরিবারে। ১৫ আগস্ট এলো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু আর এলেন না। সূর্যোদয়ের আগেই ঘটে যায় সেই মহাপ্রলয়। রচিত হল জাতির কলঙ্কিত অধ্যায়। চারদিকে ব্যাপ্ত করে নেমে আসে নিঃসীম অন্ধকার। এভাবেই বাঙালি জাতি আবার অস্তিত্বের সংকটের অতল সাগরে নিমজ্জিত হল।

তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন নিবন্ধ থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি বোস অধ্যাপক ড. আবদুল মতিন চৌধুরী, সিন্ডিকেট, শিক্ষক সমাজ ও ডাকসুর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি ১৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার দিনক্ষণ ঠিক করেন। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন এ সংবাদ জেনে গেছেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারসহ সমগ্র দেশবাসী। বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪২ সদস্যবিশিষ্ট একটি অভ্যর্থনা পরিষদ গঠন করেন। বিশাল কর্মীবাহিনী নিয়ে গঠিত হয় স্বেচ্ছাসেবী ব্রিগেড। যার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন শেখ কামাল। ডাকসুর কার্যক্রমও বেড়ে যায়। দিনক্ষণ ছাড়াই ডাকসু কক্ষে আলোচনা সভা। আলোচনা সভার বিষয়, একটায় বঙ্গবন্ধু ক্যাম্পাসে আসবেন, এ ব্যাপারে ডাকসুর করণীয় কি হবে। বঙ্গবন্ধুর আগমনে সমগ্র ক্যাম্পাস আনন্দে থৈ থৈ করছিল। ডাকসুর পক্ষ থেকে ভবনসমূহের দেয়ালে সুন্দর সুন্দর কথামালার সমাহার চোখে পড়ার মত। দেয়াল লিখনগুলোর মধ্যে ছিল– এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। '৭৫-এর আগস্ট মাসটির প্রথম দিন থেকেই ডাকসুর কর্মকর্তারা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন

ডাকসুর কার্যক্রম পরিচালিত হত কলাভবনের নিচতলা থেকে। ১ আগস্ট থেকে অভ্যর্থনা কমিটির শুরু হয় মহড়া। শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ভবনসহ প্রতিটি হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এ অভিযানে অংশ নেন। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল কড়া পুলিশী ব্যবস্থা।

আকস্মিকভাবে ১৪ আগস্ট সকাল ১১টার দিকে লাইব্রেরী ও দুপুরে সায়েন্স এনেক্স ভবনে দুইটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। শুধু তাই নয়, জগন্নাথ হলের উভয় গেট ও শামসুন্নাহার হলের দেয়ালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালন ও মুসলিম বাংলা কায়েম আহ্বান সংবলিত অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা কয়েকটি পোস্টার কে বা কারা লাগিয়ে যায়। ব্যাপারটি খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও কেউ যাতে নাশকতামূলক কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজসজ্জা নষ্ট না করতে পারে এবং পরিবেশ ক্ষুণ্ন না হয়, সে জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সাময়িক আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও পরে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই বোমা ও পোস্টারিং-এর পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল তার হদিস আজও অজানা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বোমাবাজি ও পোস্টারিং-এর আসল তাৎপর্য বোঝা যায় পরে। বঙ্গবন্ধুর খুনিরাই ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাড়িটিকে অরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দিকে সংশ্লিষ্ট সরকারি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কড়া নজর রাখা এবং তাদের ব্যস্ত রাখার কৌশল গ্রহণ করে এ ঘটনা ঘটায় বলে তৎকালীন বিভিন্ন মহল থেকে সোচ্চার কণ্ঠে বলা হয়।

সেদিনের সেই আমন্ত্রণপত্রটি আজও সংরক্ষিত আছে ডাকসু সংগ্রহশালায়। ওই আমন্ত্রণপত্রের বিষয়বস্তু ছিল এ রকম– "জাতির জনক, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাগমন উপলক্ষে আগামী ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বেলা ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিসি ও সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।' তবে বঙ্গবন্ধু আর ক্যাম্পাসে আসেননি। আসতে চেয়েছিলেন তার সাক্ষী হয়ে আজও টিকে আছে ডাকসু সংগ্রশালার সংগ্রাহক গোলাপ চন্দ্র দাসের কাছে ১৫ আগস্টের সেই আমন্ত্রণপত্রটি।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময়সূচি

বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সর্মসূচি : সকাল ৯.৫৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে শহীদদের মাজার জিয়ারত, ১০টায় কলাভবন প্রাঙ্গণে ইউওটিসির গার্ড অব অনার পরিদর্শন, সকাল ১১টার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানমালা পরিদর্শন শেষে সকাল ১১টায় টিএসসিতে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দান। এছাড়াও ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীও, যার উদ্যোক্তা ছিলেন বিভাগীয় ছাত্র শেখ কামাল, বঙ্গবন্ধুর পরিদর্শনের কথা ছিল। বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে ১২ আগস্ট জাতীয় ছাত্রলীগ একটি লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ করেছিল।

খ্যাতিমানদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুগ্ধ হয়ে বেশ কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচি উ থান্ট কঠোর ভাষায় বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ এনে গোপন বিচার করলে পূর্ব বাংলার অবস্থা...ভয়ংকর হবে।'

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করার পর আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ার। মঞ্চ থেকে নামতেই বঙ্গবন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি শুধু বাঙালি জাতিরই নেতা নও, এমন দিন আসবে যেদিন তুমি তৃতীয় বিশ্বের সমগ্র নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব দেবে।' কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'মুজিব তোমার মতো আমারও শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম। কিন্তু বন্ধু সাবধান, সুযোগ পেলেই শোষক শ্রেণী তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।' দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তির দূত নেলসন ম্যান্ডেলা বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'শোষিতের অকৃত্রিম বন্ধু' বলে। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত বঙ্গবন্ধুর করুণ মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তৃতীয় বিশ্ব একজন যোগ্য নেতৃত্বকে হারালো।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা এবং জনগণের সার্বিক সংগ্রামের ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' জনৈক মার্কিন অধ্যাপক বঙ্গবন্ধুকে 'পলিটিক্যাল পয়েট' বা 'রাজনৈতিক কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, 'পাকিস্তান সরকার যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ন্যায়বিচার ও মানবতা প্রদর্শন করে। কোর্ট মার্শালে শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে তাতে শুধু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি হবে না বরং উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি নেমে আসবে, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা হবে।'

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডট বলেছিলেন, শেখ মুজিবকে হত্যার পর বাঙালি জাতিকে আর বিশ্বাস করা যায় না।

সংগ্রহ : জাকিরুল ইসলাম
ইত্তেফাক : ১৯ নভেম্বর ২০০৯

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড

কাজী আব্দুল হান্নান

ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু হত্যামামলা দেশের নৃশংসতম একটি হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিক ঘটনাবলিকে প্রকাশ্যে এনেছে। গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ঘাতকরা কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করে জাতির জনক ও তার পরিবারের ওপর চরম আঘাত হানে, সে কাহিনী এই মামলায় উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড কীভাবে ঘটেছিল এ নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য লোকমুখে শোনা যায়। তবে আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঘটনাটিই আইনত সত্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ মামলায় প্রতিষ্ঠিত কাহিনী হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ সময় তার সেক্রেটারি ছিল পরবর্তীকালের অন্যতম ডাকসাইটে আমলা মাহবুব আলম চাষী। ১৯৭৪ সালে ভয়াবহ বন্যার পর বন্যা-উত্তর কর্মসূচিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির পরিচালক করা হয় মাহবুব আলম চাষীকে। খন্দকার মোশতাক তাকে এই পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে কুমিল্লার বার্ডে এই কর্মসূচির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক খুরশিদ আলম, মাহবুব আলম চাষীসহ আরও অনেকে। নিজের চোখে দেখা এই ঘটনার সাক্ষ্য দিয়েছেন খুরশিদ আলম। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিকেলে একটি আর্মি জিপে সাদা পোশাকে মেজর আবদুর রশিদ এবং অপর এক সামরিক অফিসার রেস্ট হাউসে আসে এবং খন্দকার মোশতাকের কক্ষে প্রবেশ করে। মাহবুব আলম চাষী এ সময় তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে নিয়ে সেই কক্ষে যায়। সেখানে তারা ৩০ বা ৪০ মিনিট কথা বলার পর মাগরিবের আজানের আগে সেনা অফিসার দু'জন চলে যায়। পরে মে বা জুন মাসে মোশতাকের গ্রামের বাড়ির এলাকায় একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে মোশতাকের বাড়িতে চা-পানের সময় মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন

নীতিনির্ধারণী কর্মসূচির সমালোচনা করতে থাকে। খন্দকার মোশতাককে সেদিন এসব নীতিনির্ধারণী কর্মসূচির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কটাক্ষ করতে দেখা যায়। সে বছর জুন-জুলাই মাসে দাউদকান্দি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে পরিবার পরিকল্পনার এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং বর্তমানের আলী আশরাফ এমপি উপস্থিত ছিলেন। পরে মাহবুব আলম চাষীও আসে। সম্মেলন চলাকালে আর্মির জিপে আসে মেজর আবদুর রশিদ, মেজর ফারুক, মেজর শাহরিয়ার এবং আরও কয়েকজন সেনা অফিসার। সম্মেলন শেষে মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী, মেজর রশিদ, মেজর ফারুক এবং মেজর শাহরিয়ার মোশতাকের গ্রামের বাড়ি যায়। আসামিদের এই তৎপরতা ছিল গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ এবং এসব বৈঠকের আলোচনায় তারা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সময় বেছে নেয়া হয় ১৫ আগস্ট বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কর্মসূচিকে সামনে রেখে।

ঘাতকদের প্রস্তুতি

সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা গেছে, কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন না পেয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়ার আগে লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ১৯৭৩ সালে কুমিল্লায় ছিল। মেজর ডালিম, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, মেজর আজিজ পাশা প্রথম ফিল্ড আর্টিলারিতে সেখানে কর্মরত থাকাকালে তাদের সঙ্গে শাহরিয়ারের ঘনিষ্ঠতা হয়।

ওই সময়ে ঢাকার লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের এক আত্মীয়ার বিয়েতে ডালিমের স্ত্রীসহ কয়েকজন লাঞ্ছিত হওয়ার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর ল্যান্সার ইউনিটের ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কিছু অফিসার ও অন্যান্য র‍্যাঙ্কের কিছু সেনাসদস্য আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি আক্রমণ ও তছনছ করে। এ ঘটনার পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ডালিম, নূর চৌধুরীসহ কয়েকজনের চাকরি যায়। শাহরিয়ার চাকরি ছাড়ার পর ঢাকায় পুরনো টিভি-ফ্রিজ মেরামতের ব্যবসা শুরু করে। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'শেরী এন্টারপ্রাইজ' ছিল মেজর ডালিম, মেজর নূর চৌধুরী, আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদার ওঠাবসার কেন্দ্র। সেখানে তারা আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করত। এ সময় দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ ভারতে প্রশিক্ষণ শেষ করে এর অধিনায়কের দায়িত্বে যোগদান করায় ডালিম একদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুরো ঘটনা তাকে জানিয়ে প্রতিকারের জন্য সে সাহায্য কামনা করলে রশিদ তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়।

অপরদিকে প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সারের দায়িত্ব মেজর মোমিনের কাছে ছেড়ে দিতে হওয়ায় এবং তার অধীনে সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হওয়ায় সৈয়দ ফারুক রহমান ক্ষুব্ধ ছিল। ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদীতে তার সঙ্গে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনায় সে আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিল। তার ওপর ডালিমের স্ত্রীকেন্দ্রিক ঘটনা-পাল্টা ঘটনায় ডালিম, নূরসহ কয়েকজনের চাকরিচ্যুতি ঘটে। তৎকালীন ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা চলত। একদিন তিনি ফারুককে বলেছিলেন, দেশ বাঁচানোর জন্য একটা কিছু করা দরকার। তখন গুরুত্ব না দিলেও ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর মেজর খন্দকার আবদুর রশিদের সঙ্গে দেশের অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব আলোচনার সূত্রে তারা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে ভিত্তিতেই এপ্রিল মাসের এক রাতে ফারুক জিয়াউর রহমানের বাসায় গিয়ে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে পরামর্শ চায়। জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি কী করতে পারি, তোমরা করতে পারলে কিছু কর। বিষয়টি রশিদকে জানানোর পর পলিটিক্যাল বিষয়টি সে দেখবে বলেছিল। রশিদ পরে আত্মীয়তার সুবাদে খন্দকার মোশতাক এবং জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

মেজর খন্দকার রশিদ ঢাকায় আসার পর আর্টিলারির দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মহিউদ্দিনের সঙ্গে সুযোগ পেলেই রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলত। ১৯৭৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি একদিন রেজিমেন্ট লাইনে মহিউদ্দিনকে পেয়ে সে তার প্রাইভেট গাড়িতে তাকে হোটেল শেরাটনের পাশে রমনা পার্কের সামনের রাস্তায় নিয়ে যায়। সেখানে ডালিম ও নূর আসে। চারজন পার্কে গিয়ে ঝোপের আড়ালে কথাবার্তা বলে। ১৩ আগস্ট রাত ১০টা সাড়ে ১০টার দিকে ডালিম এবং নূর শাহরিয়ার রশিদের ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে যায়। শাহরিয়ারকে তারা খন্দকার আবদুর রশিদের বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে ডালিম ও রশিদের আলোচনাকালে রশিদ তাদের জানায়, ডোন্ট অরি– ফারুকও সঙ্গে আছে। ১৪ আগস্ট বিকেলে খন্দকার আবদুর রশিদ ও নূর একটি কারে চড়ে শাহরিয়ারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে সঙ্গে নিয়ে খন্দকার মোশতাকের আগামসি লেনের বাড়িতে যায়। মোশতাককে পরদিন সকালে বাড়িতে থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে তারা ফিরে যায়। শেরাটনের কাছে নূর ও শাহরিয়ার গাড়ি থেকে নামে; কিন্তু কথা হয় রাতে আবার দেখা হবে। বিকেল ৪টার দিকে ডালিমকে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ির আশপাশে ঘুরতে দেখা যায়।

রাত প্রায় ১০টা নাগাদ ডালিম, আজিজ পাশা, বজলুল হুদা এবং নূর চৌধুরী

ক্যান্টনমেন্টে শাহরিয়ার রশিদের বাসায় যায়। সেখানে ডালিম তাদের জানায়, সে চিফ অব জেনারেল স্টাফের কাছ থেকে আসছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আর্মি তলব করা হয়েছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর্মি মুভ করবে। মুক্তিযোদ্ধা অফিসার হিসেবে সে তাদের সহযোগিতা চেয়েছে। এরপর সে মেজর রাশেদ চৌধুরীকে নিয়ে আসে। শাহরিয়ারের বাসায় খাওয়া-দাওয়ার পর তারা আলোচনায় বসে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ডিউটিতে অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সাব্যস্ত হয় মেজর রশিদের দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির টেকনিক্যাল হেডকোয়ার্টারে রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে তারা একত্রিত হবে। এই আর্টিলারিটি সে সময় নতুন বিমানবন্দর এলাকায় নাইট ট্রেনিংরত ছিল।

অপারেশন পরিকল্পনা

এদিকে ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ কমান্ডিং অফিসার হিসেবে তার অফিসে অফিসারদের ডেকে রাতে নাইট ট্রেনিং হবে বলে জানিয়ে দেয়। রেজিমেন্টের সব ব্যাটারি, ফার্স্ট লাইন আর্টিলারি, ফার্স্ট লাইন স্মল আর্মসসহ গোলাবারুদ সন্ধ্যার আগে নতুন এয়ারপোর্টের কাছে বালুরঘাটে যাবে এবং বাকি সব অফিসার ও ফোর্স ইউনিট লাইনে হাজির থেকে সন্ধ্যায় মার্চ করে টঙ্গী রোড ধরে এয়ারপোর্ট যাবে বলে সে নির্দেশ দেয়। প্রত্যেক অফিসার ও জওয়ানকে তাদের ব্যক্তিগত হাতিয়ার সঙ্গে নিতে বলা হয়। রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে একে একে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসার ও জওয়ানরা এয়ারপোর্টের রানওয়েতে জড়ো হয়। রাত ২টায় তাদের পাঠানো হয় বালুরঘাট পজিশনে। সেখানে উপস্থিত সেনাসদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করেছে এবং দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী ল্যান্সার হেডকোয়ার্টারে রাত ১টায় পৌঁছায় ডালিম, রাশেদ চৌধুরী, হুদা, শাহরিয়ার, রশিদরা। সেখানে সমবেত এসব সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে ল্যান্সার ইউনিটের অস্ত্রাগার থেকে পোশাক ও অস্ত্র দেয়া হয়। পশ্চিম পাশের খোলা জায়গায় ইউনিটের ট্যাঙ্কগুলো সারিবদ্ধ রাখা ছিল। ৩টায় সেখানে উপস্থিত হয় দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসাররা। ম্যাপ হাঁটুতে রেখে ক্যাম্প টুলে বসে মেজর ফারুক এ সময় পাশে দাঁড়ানো মেজর খন্দকার আবদুর রশিদের সঙ্গে অপারেশনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে। ল্যান্সারের অন্যান্য অফিসার, জেসিও এবং এনসিও পর্যায়ের কর্মকর্তারাও সেখানে সমবেত ছিল। এ সময় মেজর মহিউদ্দিনের প্রশ্ন তোলায় পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে ফারুক সবাইকে উত্তেজিত করতে একটি বক্তৃতা দেয়। একইসঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী উপস্থিত অফিসারদের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। সে

বলে, শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশে বাকশাল কায়েম করেছেন। সেনাবাহিনীর পাল্টা রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন। চারটি বাদে সব খবরের কাগজ বন্ধ করে দিয়েছেন। গভর্নর নিয়োগ করেছেন। তিনি রাজতন্ত্র কায়েম করছেন। আমরা রাজতন্ত্র সমর্থন করতে পারি না। আর এসব করতে গিয়ে তিনি সেনাবাহিনীর বাজেট কমিয়ে দিয়েছেন। আর্মি বোধহয় থাকবে না। ডিসব্যান্ড হয়ে যাবে। বাংলাদেশে সরকার বদলানোর আর কোনো পথ নেই। চাবি একজন, শেখ মুজিব। তাকে দিয়ে 'প্রক্লামেশন' করিয়ে যদি 'চেঞ্জ' করা যায়। সে যদি রাজি না হয়, যদি 'রেজিস্টান্স' হয়, দেশ বাঁচবে না। আমরা কেউ 'সার্ভাইভ' করব না। কাজেই তাকে 'এক্সিকিউট' করা লাগবে। পলিটিক্যাল পরিবর্তন যেটা সেটা মেজর রশিদ 'ডিল' করবে। খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি করে রাষ্ট্র চালানো হবে।

অপারেশন পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে মেইন অপারেশনের দায়িত্ব মেজর ডালিমকে নিতে বলা হলে মাত্র কয়েকদিন আগে সেখানে সে কর্মরত ছিল বলে অসম্মতি জানায়। পরে দায়িত্ব দেয়া হয় আর্টিলারির মেজর মহিউদ্দিনকে। বঙ্গবন্ধু যাতে পালাতে না পারেন বা বাইরে থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে না পারেন, তাই পুরো এলাকা সিল করে দিয়ে সরাসরি কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসতে বলা হয়। কিন্তু বাধা এলে বা আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ হলে নিচে এনে 'এক্সিকিউট' করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের সাপোর্ট দিতে আর্টিলারি ট্যাঙ্ক রাখা হয়। রক্ষীবাহিনী বা অপর কোনো পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে ফিল্ড রেজিমেন্টকে বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে মোতায়েন করা হয়। এ সময় ডালিম জানায়, প্রেসিডেন্টের বাড়িতে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্ট থেকে গার্ড রয়েছে। তারা মহিউদ্দিনকে বাধা দিতে পারে। বজলুল হুদা এর আগে প্রথম ফিল্ড রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট ছিল বলে সে তাদের ম্যানেজ করতে পারবে ভেবে হুদা, নূর চৌধুরী এবং মেজর মহিউদ্দিনকে একসঙ্গে মূল অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। মেজর রশিদ দায়িত্ব নেয় জেনারেল জিয়া ও খন্দকার মোশতাক আহমদসহ অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের। ফারুকের দায়িত্বে থাকে ট্যাঙ্ক।

রাশেদ চৌধুরী ও শাহরিয়াররা থাকে ডালিমের সঙ্গে। তাদের বলা হয় ডালিম যাবে রেডিও বাংলাদেশ, মেজর শাহরিয়ার, মেজর রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মোস্তফা এবং ক্যাপ্টেন মাজেদ মিন্টো রোডে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে ফোর্স মোতায়েন করবে। সেখানে কাজ শেষ করে শাহরিয়ার রেডিও বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ক্যাপ্টেন মোস্তফাকে আগামসি লেনে খন্দকার মোশতাকের বাড়ি পাহারায় এবং রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে একজন অফিসারসহ শেখ মণির বাড়িতে পাঠাতে ফারুক নির্দেশ দেয়। মেজর আজিজ পাশাকে পিলখানার বিডিআরদের নড়াচড়া দেখলে সেদিকে

অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব দিয়ে ফারুক নিজে অবশিষ্ট ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ও সৈন্যদের নিয়ে রক্ষীবাহিনী সামাল দেবে বলে ঘোষণা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভোর ৪টায় তাদের যাত্রা শুরু হয়।

ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড

মামলায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী চার সাক্ষীর বর্ণনা থেকে সেদিনের চিত্র বেরিয়ে এসেছে। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে তার পিএ মুহিতুল ইসলামকে বলেন, 'সেরনিয়াবাতের বাড়িতে দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে লাগা।' কিন্তু চেষ্টা করেও লাইন না পেলে বঙ্গবন্ধু নিজেই দোতলা থেকে নিচে পিএ মুহিতুলের অফিস কক্ষে নেমে আসেন। পুলিশ কন্ট্রোল রুম না পেয়ে তিনি সেখান থেকে গণভবন এক্সচেঞ্জে নিজেই রিসিভার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। পৌনে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে লাগাতার গুলি আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধু টেবিলের পাশে শুয়ে পড়েন। কিছু সময় পর গুলি বন্ধ হলে কাজের ছেলে সেলিম ওরফে আবদুল দোতলা থেকে বঙ্গবন্ধুর চশমা ও পাঞ্জাবি নিয়ে আসে। সেখানে দাঁড়িয়েই সেগুলো পরে তিনি বারান্দায় গিয়ে বলেন, 'এত আর্মি পুলিশ সেন্ট্রি, এত গুলি হলো তোমরা কী কর' বলে তিনি দোতলায় চলে যান। শেখ কামাল ওপর থেকে নেমে বাড়ির আর্মি ও পুলিশদের তার সঙ্গে আসতে বলে বারান্দায় এগিয়ে যান। কিন্তু গুলি বন্ধ হওয়ার পর কালো ও খাকি পোশাক পরা কিছু সৈনিক হ্যান্ডস আপ হ্যান্ডস আপ বলতে বলতে দৌড়ে আসে। তারা গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তাদের মধ্যে থেকে বজলুল হুদা বারান্দায় দাঁড়ানো শেখ কামালের পায়ে গুলি করে। তিনি এ সময় 'আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল' বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করা হয়। একটি গুলি বাড়িতে কর্তব্যরত ডিএসপি নজরুল ইসলামের গায়ে লাগে। বজলুল হুদা ও নূর বাড়ির কাজের লোক এবং পুলিশদের গেটের সামনে লাইন করে দাঁড় করায়। সেখানে একজন এসবি অফিসারকে একজন আর্মি গুলি করে মারে। ল্যান্সার মেজর মহিউদ্দিন গুলি করতে করতে ফোর্স নিয়ে দোতলায় উঠে যায়। বঙ্গবন্ধুকে এ সময় তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তারা তাকে ঘিরে ফেলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। একই সময় বজলুল হুদা ও মেজর নূর কয়েকজন ফোর্স নিয়ে মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বাড়ির গার্ড বাহিনীর হাবিলদার কুদ্দুস শিকদারকে তাদের সঙ্গে আসার নির্দেশ দিয়ে দোতলায় উঠছিল। সিঁড়ি দিয়ে দু'এক ধাপ নামার মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু তাকে ঘিরে রাখা আর্মিদের উদ্দেশে বলেন,

'তোরা কী চাস, কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?' নিচের দিক থেকে ওপরে উঠে আসার মাঝের ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে মেজর নূর ইংরেজিতে কিছু একটা বলে। মেজর মহিউদ্দিন ও তার সঙ্গের ফোর্সরা একপাশে সরে যায়। বঙ্গবন্ধু আবারও প্রশ্ন করেন, 'তোরা কী চাস'? সঙ্গে সঙ্গে হুদা তার পাশের কারও কাছ থেকে একটি স্টেনগান নিয়ে এবং নূর তার হাতের স্টেনগান দিয়ে একসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। সিঁড়িতেই লুটিয়ে পড়েন জাতির জনক। তখন তার পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, এক হাতে সিগারেটের পাইপ, অন্য হাতে দিয়াশলাই। এরপর মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, মেজর বজলুল হুদাসহ সবাই নেমে দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে যায়। কিন্তু এর পরপরই মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ল্যান্সারের ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির সৈন্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করে। আজিজ পাশা বঙ্গবন্ধুর কক্ষের দরজা খুলতে বলে, কিন্তু ভেতর থেকে না খোলায় দরজায় গুলি করা হয়। বেগম মুজিব দরজা খুলে কক্ষে থাকা পরিবারের অন্যদের না মারার জন্য কাকুতি-মিনতি করেন। কিন্তু একদল ফোর্স বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বাড়ির চাকর রমাকে রুম থেকে বের করে নিয়ে আসে। বেগম মুজিব সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মারলে সেখানেই মারতে বলে তিনি আর অগ্রসর হতে না চাওয়ায় অন্যদের নিচে নেয়া হলেও তাকে আবার রুমে ফিরিয়ে নেয়া হয়। আজিজ পাশা সেখানে রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের হাতের স্টেনগান নিয়ে রুমের সবাইকে গুলি করে। সেখানে ছিলেন বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী রোজি এবং শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা।

দোতলা থেকে নামিয়ে শেখ নাসের ও রাসেলকে অন্যদের সঙ্গে লাইনে দাঁড় করানো হয়। এ সময় নাসের বলেন, 'স্যার আমি তো রাজনীতি করি না, কোনোরকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই।' পাহারারত একজন আর্মি অপর একজনকে এর জবাবে বলে, শেখ মুজিব 'বেটার দ্যান' শেখ নাসের। ঠিক আছে, আপনি ওই রুমে গিয়ে বসেন, বলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রিসিপশন রুমে এবং রুমের বাথরুমে নিয়ে তাকে গুলি করা হয়। শেখ নাসের পানি পানি বলে চিৎকার করতে থাকলে গুলি করে ফিরে আসা আর্মিটি অপর একজনকে বলে, পানি দিয়ে আয়। দ্বিতীয়জন গিয়ে তাকে আবারও গুলি করে।

মামলার বাদী মুহিতুল ইসলামকে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত শিশু শেখ রাসেল লাইনে দাঁড়িয়ে বলেছিল– 'ভাইয়া আমাকে মারবে না তো?' মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছিল রাসেল। শিশু রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ল্যান্সারের একজন হাবিলদারকে হুকুম দেয় আজিজ পাশা। তাকে দোতলায় নিয়ে মায়ের

লাশের কাছে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘাতক আর্মিটি ফিরে এসে পাশাকে জানায়, স্যার সব শেষ। এর কিছু সময় পর একটা ট্যাঙ্কে মেজর ফারুক বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেটে আসে। সেখানে আজিজ পাশা, নূর চৌধুরী, মহিউদ্দিন ও বজলুল হুদা তার সঙ্গে কথা বলে। ফারুক ট্যাঙ্ক নিয়ে ফিরে যাওয়ার পরপর একটি লাল কারে করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আনা হয় কর্নেল জামিলের লাশ।

মোক্ষলাভ

আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে হত্যাযজ্ঞ শেষ করে শাহরিয়ার এসে ডালিমের সঙ্গে রেডিও স্টেশনে যোগ দেয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর ঘোষণা দিতে থাকে ডালিম। রেডিও স্টেশনের সার্বিক দায়িত্বে থাকে শাহরিয়ার। সেখানে আনা হয় মোশতাককে। আসে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। তিন বাহিনীর তিন প্রধানকে হাজির করে আনুগত্যের ঘোষণা দেয়া হয়। তাহের ঠাকুর রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোশতাকের ভাষণ তৈরি করে রেকর্ড করায়। ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা ছিল পৃথক তারা সবই একত্রিত হয় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে। সেখানে সর্বেসর্বা ছিল ঘাতককুলের শিরোমণি সেনা অফিসাররা। যাদের কিছুসংখ্যককে পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে আত্তীকরণ করা হয়। এরা হলো তৎকালীন মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর আবদুল আজিজ পাশা, মেজর একেএম মহিউদ্দিন আহাম্মদ, মেজর বজলুল হুদা, লে. ক. এমএম রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম, আবদুল মাজেদ, ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, লে. ক. সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লে. ক. এসএইচ নূর চৌধুরী এবং মেজর আহম্মদ শারফুল হোসেন। তৎকালীন চিফ অব আর্মি স্টাফের অনুরোধে তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আত্তীকরণ করে বিদেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে রাখা হয়েছিল।

সমকাল

একটি লুঙ্গিতে মোড়ানো ছিল রাসেলের লাশ

মেজর আলাউদ্দিন

নৃশংসভাবে নিহত ১৮ জনের লাশ তিনটি বাড়ি ও হাসপাতালের মর্গ থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো দাফন করার এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন মেজর আলাউদ্দিন আহমেদ পিএসসি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর ঘটনাস্থল ধানমন্ডির বাড়িসহ আরও দুটি বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি।

আগ্নেয়াস্ত্রের বুলেটে ক্ষতবিক্ষত লাশ এবং সেগুলো দাফন করার দায়িত্ব পালন করে সে সময়ের ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন হেডকোয়ার্টারে কর্মরত স্টাফ অফিসার আলাউদ্দিন আহমেদ একটি প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিলেন নিজের দপ্তরে। এ ঘটনায় আবেগতাড়িত হয়ে পরে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি কবিতাও লিখেছিলেন তিনি। কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'একটি কালো রাত'।

মেজর আলাউদ্দিন পাকিস্তান থেকে ফিরে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। একপর্যায়ে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েও বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৮১ সালে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। পরে এরশাদ সরকারের আমলে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের পরিচালক পদে নিয়োগ পান এবং '৮৫ সালে চাকরিচ্যুত হন। মেজর আলাউদ্দিন ১৯৯৯ সালের ২২ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক ঘটনা সম্পর্কে মেজর আলাউদ্দিনের একটি স্মৃতিচারণা এর আগে একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম আলো এবার সংগ্রহ করেছে তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনটি। হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ইংরেজিতে লিখিত সেই প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হলো :

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫-এর ঘটনায় নিহতদের অবস্থা ও দাফন-কাফন :

১৯৭৫-এর ১৬ আগস্ট রাত তিনটায় ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডারের আদেশে আমি প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি যাই। স্টেশন কমান্ডার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। মেজর বজলুল হুদা ও তাঁর লোকজন পাহারা দিচ্ছিলেন বাড়িটি। হুদা আমাকে প্রথমে বাধা দিলেও পরে ঢোকার অনুমতি দেন।

এক. সড়ক নম্বর ৩২, শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি : সবগুলো লাশ সিঁড়ির গোড়ায় আনা হলো। রাখা হলো কাঠের কফিনে। বরফ আনা হয়েছিল। রক্ত, মগজ ও হাড়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল প্রথম তলার দেয়াল, জানালার কাচ, মেঝে ও ছাদে। বাড়ির সব বাসিন্দাকেই খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলির আঘাতে দেয়ালগুলোও ঝাঁঝরা হয়ে যায়। খোসাগুলো মেঝেতে পড়া ছিল। কয়েকটি জানালার কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ঘরের জিনিসপত্র, গিফটবক্স ও

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিয়েগুলোর উপহারের প্যাকেট। পবিত্র কোরআন শরীফও মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখলাম।

ক. শেখ মুজিবের বাড়িতে নয়জনকে হত্যা করা হয়েছিল। লাশগুলো (প্রদত্ত রিপোর্ট মতে) যে অবস্থায় পাওয়া যায় :

১. শেখ মুজিব : প্রথম তলার সিঁড়ির মাঝখানটায় যে সমতল অংশটি তার তিন-চার ধাপ ওপরে। চশমার ভাঙা কাচ ও একটি পাইপ সিঁড়িতে পড়ে ছিল।

২. শেখ কামাল : অভ্যর্থনা কক্ষে

৩. টেলিফোন অপারেটর : অভ্যর্থনা কক্ষে

৪. শেখ নাসের : নিচতলার সিঁড়িসংলগ্ন বাথরুমে

৫. বেগম মুজিব : মূল বেডরুমের সামনে

৬. সুলতানা কামাল : মূল বেডরুমে

৭. শেখ জামাল : মূল বেডরুমে

৮. রোজী জামাল : মূল বেডরুমে

৯. শিশু রাসেল : মূল বেডরুমে, তার দুই ভাবির মাঝখানে

দুই. বাড়ির সব বাসিন্দাকেই খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁদের সবাই তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণ হারান।

শেখ মুজিব : প্রথম তলার সিঁড়ির মাঝখানে যে সমতল জায়গাটা তার তিন-চার ধাপ ওপরে একেবারে কাছ থেকে গুলি করে শেখ মুজিবকে খুন করা হয়। তাঁর তলপেট ও বুক ছিল বুলেটে ঝাঁজরা। শেখ মুজিব সব সময় চশমা পরতেন এবং তাঁর ধূমপানের অভ্যাস ছিল। তাঁর চশমা ও তামাকের পাইপটি সিঁড়িতে পড়া ছিল। পরনে চেক লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। চশমার একটি গ্লাস ভাঙা। রক্তে পাঞ্জাবির রং ছিল গাঢ় লাল। একটি বুলেট তাঁর ডান হাতের তর্জনীতে গিয়ে লাগে এবং আঙুলটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

শেখ কামাল : কামালের বুক ও তলপেটে তিন থেকে চারটি বুলেট বিদ্ধ হয়। তাঁর পরনে ছিল ট্রাউজার। নিচতলায় তাঁকে খুন করা হয়।

টেলিফোন অপারেটর : তাঁকে নিচতলায় খুন করা হয়।

শেখ নাসের : শেখ নাসেরকে খুন করা হয় বাথরুমের কাছে। তাঁর হাত উড়ে গিয়েছিল। গুলিতে তাঁর দেহের বেশ কিছু স্থান ছিল ক্ষতবিক্ষত। তাঁর গায়ে কোনো পোশাক ছিল না এবং লাশ বিছানার চাদরে মোড়ানো ছিল।

বেগম মুজিব : বেগম মুজিবকে বুকে ও মুখমণ্ডলে গুলি করা হয়। তাঁর পরনে ছিল সুতি শাড়ি এবং কালো রঙের ব্লাউজ। গলায় মাদুলি বাঁধা একটি সোনার নেকলেস। কনিষ্ঠা আঙুলে ছোট্ট একটি আংটি। তখনো তাঁর পায়ে ছিল একটি বাথরুম স্লিপার!

সুলতানা কামাল : সুলতানা কামালের বুক ও তলপেটে গুলি লাগে। পরনে ছিল শাড়ি ও ব্লাউজ।

শেখ জামাল : শেখ জামালের মাথা চিবুকের নিচ থেকে উড়ে গিয়েছিল। পরনে ট্রাউজার। ডান হাতের মধ্যমায় ছিল একটি মুক্তার আংটি। সম্ভবত এটি ছিল তাঁর বিয়ের আংটি।

রোজী জামাল : তাঁর মুখটি দেখাচ্ছিল বিবর্ণ, মলিন। মাথার একাংশ উড়ে গিয়েছিল। তাঁর তলপেট, বুক ও মাথায় গুলি করা হয়। পরনে ছিল শাড়ি ও ব্লাউজ।

শিশু রাসেল : সম্ভবত আগুনে তার পা ঝলসে যায়। মাথা উড়ে গিয়েছিল। পরনে ছিল হাফপ্যান্ট। লাশ একটি লুঙ্গিতে মোড়ানো ছিল।

তিন. মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো ছিল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জামাল ও কামালের বিয়ের অনেক উপহারসামগ্রী এবং গিফট প্যাকেট। কিছু বাক্স ছিল ফাঁকা। কামালের কক্ষে রূপার তৈরি অনেক জিনিসপত্র দেখা যায়। সিঁড়িতে ছিল আল্পনা আঁকা। অভ্যর্থনা কক্ষটি ছিল নোংরা। আমি ওপরতলা থেকে শুনলাম নিচতলায় হুদা চিৎকার করছেন। তিনি এ বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র চুরি করায় কয়েকজন সিপাহিকে গালাগাল দিচ্ছিলেন।

চার. সড়ক নম্বর ১৩/১, ধানমন্ডি, শেখ মণির বাড়ি : মণি ও তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে তাঁদের এই বাড়িতে খুন করা হয়। তাঁদের বাড়ির দিকে 'সেনাবাহিনীর গাড়ি' আসতে দেখে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব ছেড়ে সরে যান। বাড়িটি ছিল আংশিক তছনছ করা। মেঝেতে স্পষ্ট রক্তের দাগ। মাঝের টেবিলে একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে কিছু ভিজানো চিঁড়া।

পাঁচ. ৩৭ মিন্টো রোড, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ি : মন্ত্রীর বাড়িটি ছিল ফাঁকা। ড্রয়িংরুম জুড়ে দেখা গেল জমাট বাঁধা রক্ত। বাড়িটার নিরাপত্তা পুলিশেরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল!

ছয়. সেরনিয়াবাত ও শেখ মণি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়। লাশগুলো ছিল বিকৃত। তাপ ও আর্দ্রতা লাশের ক্ষতি করে। লাশ থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। বনানী গোরস্থানে দাফনের জন্য আমরা লাশগুলো সেনানিবাসে নিয়ে এলাম। শেখ মুজিবের লাশ ছাড়া ৩২ নম্বর সড়কের অন্য সবার লাশও আরেকটি ট্রাকে করে সেখানে আনা হয়।

দাফন-কাফন সম্পর্কে প্রতিবেদন

১. মৃতদেহ সংগ্রহ : ১৫ আগস্ট ঘটনায় নিহতদের লাশ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়ক এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে সংগ্রহ করা হয়। দুটি ট্রাকে করে ১৮টি লাশ দাফনের জন্য আনা হয়। বনানী গোরস্থানে দাফনের জন্য গুলশান মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অনুমতি নেয়া হয়। এএসসি (আর্মি সার্ভিসেস কোর) সিপাহিদের একটি প্লাটুন গোরখোদকের কাজ করে। স্টেশন কমান্ডার আগেই আমাকে বলেছিলেন, ১৬ আগস্টের দিনের প্রথম আলো ফোটার আগেই যাতে দাফনের সব কাজ শেষ হয়ে যায়!

২. দাফন : আগস্ট মাসের তাপ ও আর্দ্রতায় কিছু লাশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে কোনো ফ্যান ছিল না। ৩২ নম্বরের লাশগুলোতে বরফ দেয়া ছিল। ফলে সেগুলোর অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো। সিপাহিদের কয়েকজন ছিল, খুবই গলা চড়িয়ে কথা বলছিল। শেখ মুজিববিরোধী মনোভাব প্রকাশ করছিল তারা। ফলে আমাকে গোটা পরিস্থিতিই সতর্কতার সঙ্গে সামাল দিতে হয়। অবশ্য কোনো লাশেরই যাতে অমর্যাদা না হয় আমি সেটি নিশ্চিত করেছিলাম। সিপাহিদের কয়েকজন কবর খুঁড়তে অনীহা প্রকাশ করে, লাশের খারাপ অবস্থার কারণে কয়েকজন এমনকি ছুঁতে পর্যন্ত রাজি ছিল না। আমি নিজে প্রথম মৃতদেহটি (বেগম মুজিবের) ওঠাই এবং চিরশয্যায় শায়িত করি। শেখ নাসেরের দেহাবশেষ একইভাবে দাফন করি। এরপর আর আমার সমস্যা হয়নি। চার নম্বর ছাড়া বাকি প্রায় সবগুলো কবর ঠিকভাবে খোঁড়া হয়। কারণ আমরা সূর্যোদয়ের আগেই সব সেরে ফেলার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম। গোরস্থানমুখী সড়কগুলোয় আমরা আগেই সিপাহি মোতায়েন এবং গোরস্থান এলাকায় 'কারফিউ' জারি করি। ভোরে ঘুম ভাঙা কিছু লোক ও পথচারী কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করলে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়।

৩. সাত নম্বর সারির চারপাশে বেড়া দেয়া হয় এবং অস্থায়ী চৌকি বসিয়ে ২৪ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য গোরস্থানটিতে দাফন কাজ বন্ধ ও দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

৪. মৃতদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র : কয়েকটি লাশের সঙ্গে কিছু গয়না পাওয়া যায়। একটি তালিকা তৈরি করে গয়নাগুলো স্টেশন কমান্ডারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

৫. শেখ মুজিবের দাফন : ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫ বেলা ১১টায় শেখ মুজিবের লাশ সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে করে ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়। কাফন কেনা হয় সিএসডি (ক্যান্টিন স্টোরস ডিপার্টমেন্ট) থেকে। এটি কেনা হয়েছিল বাকিতে! অর্ডন্যান্সের জিডিও (গ্যারিসন ডিউটি অফিসার) মেজর মহিউদ্দিন আহমদকে লাশের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়। একটি বিএএফ (বাংলাদেশ এয়ারফোর্স) হেলিকপ্টারযোগে লাশ দাফনের জন্য টুঙ্গিপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের গোসল ও জানাযা দেয়া হয়। জানাযায় শেখ মুজিবের চাচাসহ ডজনখানেক লোক শরীক হন! একটি অস্থায়ী চৌকি বসিয়ে কবরটি পাহারার জন্য রক্ষী মোতায়েন করা হয়। জিডিও টুঙ্গিপাড়া থেকে ফিরে সদর দপ্তরের মিলিটারি অপারেনসের ডিরেক্টরের কাছে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।

৬. নিহতদের বাড়িগুলো সিল করা হয় : শেখ মুজিব, শেখ মণি ও সেরনিয়াবাতের বাড়ি তালাবদ্ধ করে সিলগালা করা হয় এবং চাবি স্টেশন সদর দপ্তরে রাখা হয়।

৭. অনেক বাধাবিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সাধ্যমতো সর্বোচ্চ যত্ন ও মর্যাদার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করি।

বনানী গোরস্থান : সাত নম্বর সারিতে যাঁদের কবর দেয়া হয়

১. বেগম মুজিব, ২. শেখ নাসের, ৩. শেখ কামাল, ৪. সুলতানা কামাল, ৫. শেখ জামাল, ৬. রোজী জামাল, ৭. শিশু রাসেল, ৮. অজ্ঞাত পরিচয় ১০ বছর বয়সী একটি বালক, ৯. ফাঁকা, ১০. অজ্ঞাত পরিচয় ১২ বছর বয়সী একটি বালক, ১১. গৃহপরিচারিকা, বয়স ৪৫, ১২. অজ্ঞাত পরিচয় ১০ বছর বয়সী একটি ফুটফুটে বালিকা, ১৩. শেখ মণি, ১৪. মিসেস মণি, ১৫. অজ্ঞাত পরিচয় ২৫ বছর বয়সী এক যুবক, ১৬. অজ্ঞাত পরিচয় ১২ বছর বয়সী একটি বালক, ১৭. আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ১৮. অজ্ঞাত পরিচয় ২৫ বছর বয়সী এক যুবক।

নোট : নয় নম্বর কবরের নাঈম খানের লাশ লে. আবদুস সবুর খানের (এনওকে) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

মেজর আলাউদ্দিন আহমেদ
আর্টিলারি স্টেশন স্টাফ অফিসার
স্টেশন হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৮ আগস্ট, ১৯৭৫

প্রথম আলো
১৮ নভেম্বর ২০০৯

এই প্রথম কেঁপে উঠল তাঁর কণ্ঠ। যখন বলছিলেন, 'তারে কীভাবে মাটি দেসে, তাও তো জানি নে। তাকে গোসল করাতি দেবে না, মাটি দিতি দেবে না...যে কাপড় সে-ই রিলিফ দেসে, সেই কাপড় দিয়েই তারে মাটি দেসে!' খাদিজা হোসেনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হলো। বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর একমাত্র জীবিত বোনটিকে এরপর আর কিছু জিজ্ঞেস করা যায়? ঘরে জমাটবাঁধা নৈঃশব্দের ভাষাই তখন একমাত্র ভাষা।

নিজেকে ভেঙে পড়তে দেনটি পুরোটা সময়। মনের হাহাকার বেরিয়ে পড়তে চাইছিল ঠিকই, কিন্তু তা থেকে নিজেকে আড়াল রাখার চেষ্টাও করছিলেন তিনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দাফনের বর্ণনা দেয়ার মুহূর্তটিতে বেদনায় সিক্ত হয়ে গেল পরিবেশ। 'ভাবি আর আমি ১৯ দিনের ছোট-বড়। আমাকে কী যে ভালো বাসতেন! সারা জীবন কষ্টই করে গেছেন ভাবি। ভাই তো একদিন জেলে, একদিন বাইরে। ভাবিই তো চালিয়েছেন সংসার। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, পাকসাক করা, ঘরভর্তি মেহমানকে খুশি রাখা, বেড়ে খাওয়ানো...এক হাতে সামলেছেন। কোনো বেলায়ই ভাবি শুধু ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাত খাতি পারেননি। মেহমান থাকতই।'

'ভাই মাছ পছন্দ করত। আমার জামালটা পোলাও পছন্দ করত। আমার রোজী...ভাই বলল একদিন, 'লিলি, আমি তোর মেয়ে রোজীর সঙ্গে আমার জামালের বিয়ে দেব।'

বললাম, 'দেবেন। আপনি চালি পরে আমি কি না করতে পারব?' সেই যে ভাই, কী ভাই আমার...যাক, সেই ভাইয়ের বোন হয়ে বাঁইচে আছি। তিনটে বোন তো মারা গেছে। দুই ভাইও নাই। আমি একা বাঁইচে আছি। দুনিয়াতে বাঁচতি হয়, তাই বাঁইচে আছি। আল্লাহ বাঁচায় রাখসে, তাই বাঁইচে আছি।"

শেখ কামালের সঙ্গে সুলতানার বিয়ে হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বিয়ে হলো জামাল আর রোজীর। এরপর? এর পরের স্মৃতিচারণা করতে কার মন চায়? খাদিজা হোসেন ১৫ আগস্ট ভাই হারিয়েছেন, মেয়ে হারিয়েছেন, ভাগ্নে হারিয়েছেন, ভগ্নিপতি হারিয়েছেন...।

'বড় ভাইয়ের কবরের কাছে গেলে হু হু করে ওঠে বুক। বাঁচতে ইচ্ছা করে না। এই বেঁচে থাকার কি কোনো মানে আছে?' যেন নিজের মনেই বলে চলেন তিনি। 'আর বনানীতে যাদের কবর দেয়া হলো, তাদের মধ্যে কে কোথায় শুয়ে আছে, তা কি জানতি পারব কখনো?'

রোজীর বাবা সৈয়দ হোসেন জেল থেকে ছাড়া পান দুই বছর পর। তিনি সরকারের কাছে আবেদন করলেন, 'আমার মেয়ের কবর বুঝিয়ে দিন।' জানানো হলো, কবরগুলো কিনে নিতে হবে। ওরা আলাদা করে রোজীর কবর দেখাতে পারল না। পরবর্তী সময়ে সব কবর একসঙ্গে কিনে নেয়া হলো। কিন্তু কারও কবর আলাদা করে শনাক্ত করা যায়নি। এটা ১৯৭৭ সালের কথা। শেখ হাসিনা তখন কবরের মাটি কেনার টাকা পাঠিয়েছিলেন।

রোজীর বোন ডলি বলেন, 'রোজী আমার ছোট। একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিলাম আমরা। কত খেলেছি দুজন! আমাদের পরিবার ছিল সদাহাস্যোজ্জ্বল। সত্তরে আমরা সবাই মিলে রাঙামাটি গিয়েছিলাম। প্রকৃতির মধ্যে যেন আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেসব স্মৃতি এখন কষ্ট হয়ে বুকে বেঁধে।'

শেখ কামালের স্ত্রী হয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবারে এসেছিলেন সুলতানা। বোনের কথা বলতে গিয়ে সুলতানার বড় ভাই জাহাঙ্গীর এমডি জসিম বললেন, "ওর কথা মনে হলেই ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখটাই চোখে ভেসে ওঠে সবার আগে। মনে পড়ে, ১৯৭৩ সালে ভারতের দিল্লিতে যে অল ইন্ডিয়া গ্রামীণ স্পোর্টস হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশও অংশ নিয়েছিল। যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার সম্মান রাখতে পারবি তো?' সুলতানা বলেছিল, 'হ্যাঁ, পারব।' সুলতানা সেখানে লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছিল। ফিরে এসে ও বলেছিল, 'আমি বঙ্গবন্ধুকে দেয়া কথা রাখতে পেরেছি।' কিংবা মনে পড়ে, সত্তর সালে অল পাকিস্তান গেমসে লং জাম্পে রেকর্ড করেছিল সুলতানা। তখন সোনার মেডেল গলায় গর্বিত আমার বোনটির চেহারা এখনো মনে ভাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা ব্লু ছিল সুলতানা। ব্লেজার গায়ে বোনটির তৃপ্ত মুখশ্রী কি ভোলা যায়? যখন ওকে নিয়ে ভাবি, বুঝতেই পারেন মনের অবস্থা কী হয়। স্মৃতিগুলো সব সময়ই মধুর, কিন্তু তা বেদনাদায়ক শূন্যতা রেখে যায়। বোনের হত্যার বিচার তো আমার পক্ষে চাওয়া স্বাভাবিক। দুনিয়ার সব মানুষই অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচার চাইবে। এত দিন যে বিচার হয়নি, এটাই তো অবাক কাণ্ড। বিচার সভ্য সমাজের স্বাভাবিক ব্যাপার। এতদিন যে হয়নি, এটাই অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয়। এই বিচার আমাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হবে। বুঝতে হবে, হত্যা করে কেউ কোনো দিন বাঁচতে পারে না।"

হামিদা সেরনিয়াবাতও সেদিনের কথা ভুলতে পারেন না। "ভীষণ উচ্ছল ছিল বেবী নামের বোনটি। গুলির শব্দ শুনে বেবীকে ঘুম থেকে জাগালেন হামিদা। দুই বোন দৌড়ে গেলেন বাবার ঘরে। বেবী বঙ্গবন্ধুকে ফোন করেছিল। ঘাতকেরা আবদুর রব

সেরনিয়াবাতের বাড়িতে ঢুকে বলল, 'আপনারা ভয় পাবেন না।' বেবী বলল, 'ভয় পাব কেন, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাই না।' ভীষণ সাহসী আর একরোখা ছিল মেয়েটি। ঘাতকের বুলেট বিদীর্ণ করে দিয়েছিল ১৪ বছর বয়সী বেবীর হৃদপিণ্ড।"

হামিদা সেরনিয়াবাত (বিউটি) বললেন তাঁর বোনের কথা, "আরজু আপা আমার বোনদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে সহজ-সরল। কলেজজীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। বরিশাল মহিলা কলেজের জিএস ছিলেন। '৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মণি ভাইয়ের (শেখ মণি) সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯৭৫ সালে এমএ পরীক্ষা দিয়েছিলেন আপা। কিন্তু পরীক্ষার ফল জানার সুযোগ হয়নি তাঁর। ১৫ আগস্ট ঘাতকরা যখন তাঁকে হত্যা করে, তখন তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা।"

খাদিজা হোসেন বললেন, 'খুব হাসিখুশি ছিলেন আরজু মণি। সেরনিয়াবাতের মেয়ে। আগে বরিশালেই থাকত ওরা। স্কুল-কলেজ বন্ধ হলে সবাই টুঙ্গিপাড়ায় আসত। উৎসব লেগে যেত। দুইটা ছেলে থুয়ে গেছে আরজু, তাপস (সাংসদ) আর পরশ। তাপসরেও তো মাইরে ফেলতি চাইছিল। ওর মা-বাপরে মাইরে সাধ মেটে নাই, তাই ওরেও মারতি চাইসে।' এটুকু বলার পর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে খাদিজা হোসেনের বুক থেকে। তারপর বলেন, 'আমি কি শুধু ভাই হারিয়েছি? ভাবি হারিয়েছি? মেয়ে হারিয়েছি? তোমরা কিছু হারাও নাই? পৃথিবী কিছু হারায় নাই? এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দেখার জন্যই বোধ হয় আমি বেঁচে আছি। বঙ্গবন্ধুর পরিবার যে কীভাবে বেঁচে আছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। একেকজনের ওপর যে কী আঘাত...!'

১৫ আগস্ট যে তিনটি বাড়িতে আঘাত হেনেছিল ঘাতকেরা, তাঁদের সবাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়। পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যরা আজও সেদিনের কথা মনে করে শিউরে ওঠেন। বিচারের দিন কাছে চলে এসেছে। বিচার হবে। সব হারানো মানুষের মনের ক্ষত কতটা শুকাবে জানি না, তবে আপনজনেরা এ হত্যার বিচার চায়।

প্রথম আলো
১৮ নভেম্বর ২০০৯, বুধবার

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

এএফএম মুহিতুল ইসলাম

রাত সাড়ে আটটা থেকে নয়টার ভিতর বঙ্গবন্ধু গণভবন থেকে চলে এলেন। এসে উপরে উঠে গেলেন। তারপর তোফায়েল সাহেব এসেছিলেন। তোফায়েল সাহেব কিছু কথা বললেন। ওনারা সবাই চলে গেলে যথারীতি বঙ্গবন্ধু শুতে গেলেন...। বঙ্গবন্ধু প্রায় সাড়ে বারটা থেকে একটার মধ্যে যেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং সেদিনও ঠিক একইভাবে শুয়ে পড়েছিলেন। আমি গেটে এক আর্মি-সিপাহীর সাথে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত গল্প করে এসে আমাদের নির্ধারিত জায়গায় শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি ঠিক জানি না। হঠাৎ আমাদের যে মিস্ত্রি ছিল, মিস্ত্রি এসে আমাকে বলছে, 'স্যার, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে ডাকছেন।' আমি যে লুঙ্গিপরা অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থায় এসে টেলিফোন ধরলাম। আমি টেলিফোন ধরার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ করেছে, পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে টেলিফোন কর।' আমি টেলিফোন ঘুরাচ্ছিলাম, পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে পাচ্ছিলাম না, না পেয়ে আমি গণভবন এক্সচেঞ্জকে টেলিফোন করলাম, ওখানকার টেলিফোন অপারেটর রিসিভ করল। কিন্তু রিসিভ করে কোন কথা বলছিল না, আমি যত বলি 'হ্যাঁলো, আমি পিএ-টু-প্রেসিডেন্ট বলছি' ও তত শুধু 'এ্যা-এ্যা' শব্দ করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু উপর থেকে গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে নিচে নেমে এলেন। নেমে এসে আমাকে বললেন, 'কিরে, তোকে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে লাগাতে বললাম, লাগালি না?' আমি তখন বলেছিলাম, 'স্যার আমি কন্ট্রোলরুমকে লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাচ্ছি না। আমি গণভবন এক্সচেঞ্জকে পেয়েছি, কিন্তু কোন কথা বলছে না।' তখন উনি রিসিভারটা আমার হাত থেকে নিলেন। নিয়ে উনি নিজেই বলছিলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি... 'ঠিক সেই মুহূর্তে এই পিছনের জানালাতে বৃষ্টির মত গুলি আসতে থাকল। ইতিমধ্যে একটা গ্লাস এই জানলার বেশ বড় একটা গ্লাস আমার হাতের মধ্যে ফুটলো এবং কেটে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। সেটা দেখে বঙ্গবন্ধু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে টানছিলেন শুয়ে পড়ার জন্য। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় কাজের ছেলে আব্দুল ওপর থেকে উনার

পাঞ্জাবি আর চশমা নিয়ে আসে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে উনি পাঞ্জাবিটা পরলেন এবং চশমাটা হাতে নিয়ে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে বললেন, 'পুলিশ সেন্ট্রি, আর্মি সেন্ট্রি, এত গুলি চলছে, তোমরা কী করছ?' বলে উনি উপরে উঠে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর কামাল ভাই এলেন, নেমে এসে শুধু বললেন, 'পুলিশ সেন্ট্রি, আর্মি সেন্ট্রি, আসেন আমার সঙ্গে।' ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি এবং ডিএসপি সাহেব উনার পিছনে যেয়ে দাঁড়িয়ে আছি... হঠাৎ দেখি ৩-৪ জন কালো পোশাকধারী লোক উনার সামনে এসে হাজির হল। এসেই বলল, 'এই শুয়োরের বাচ্চা, সোজা হয়ে দাঁড়া!' বলার সাথে সাথে ডিএসপি সাহেব আমাকে পিছন থেকে টান দিলেন, ঘরের ভিতর আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। প্রায় জোর করে উনি আমাকে ধরে নিয়ে এলেন রুমের ভিতরে, আর ওরা সেই মুহূর্তে কামাল ভাইয়ের পায়ের উপর গুলি করল, কামাল ভাই জাম্প দিয়ে এখানে এসে পড়লেন– ঠিক আমার পাশেই, এমনভাবে পড়লেন যে, ওনার ধাক্কায় আমিও পড়ে গেলাম, আমার বডির হাফ পোর্শন ছিল টেবিলের নিচে আর হাফ পোর্শন টেবিলের বাইরে। ঠিক সেই মুহূর্তে কালো-পোশাকধারীরা কামাল ভাইকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করল। কামাল ভাইয়ের বুক ঝাঁঝরা হয়ে একটা গুলি লাগল ডিএসপি সাহেবের পায়ে, আর একটা লাগল আমার। কামাল ভাই এখানেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর ডিএসপি সাহেব আমাকে প্রায় টেনে ওনার রুমে নিয়ে গেলেন। ওখানে যেয়ে দেখি এসবির এক সাব-ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, পিস্তলটা তার পায়ের কাছে ফেলানো। আমাদের দু'জনকে ডিএসপি সাহেব প্রায় ধাক্কায়ে ধাক্কায়ে এই দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলেন। বাইরে যাওয়ার পর আমাগো তিনজনকে একজন আর্মি এসে চুল ধরে টেনে তুলল। টেনে তোলার পর আমাদেরকে লাইনে দাঁড় করাল। চেয়ে দেখি ওখানে পুলিশের আরো কিছু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও দাঁড়িয়ে রইলাম।... ৩-৪ জন সেন্ট্রিকে পাহারা দেয়ার জন্য রেখে গেল, তারপর তারা ভিতরে চলে গেল। আমরা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছি তখন উপরে বেশ গুলি-গোলার শব্দ শুনলাম। এক সময় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনলাম : "আমাকে কোথায় যেতে হবে?"... তার কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড একটা ব্রাশফায়ার শুনলাম, তারপর উপরে বেশ নিস্তব্ধতা নেমে এল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাদের কান্নার রোল পড়ে গেল। কান্নার পরে ফায়ার হচ্ছিল, তারপর কান্নার আওয়াজগুলো থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে নাসের কাকাকে উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। উনি যখন নেমে আসলেন দেখলাম যে, একটা শাড়ির পাড় দিয়ে উনার আঙ্গুলগুলো বাঁধা, তাতে মনে হয়েছিল যে, আঙ্গুলগুলো হয়তো নেই। উনি আমাদের লাইনে এসে দাঁড়ালেন, তখন একজন আর্মি বললো, 'চলেন, আপনি ঐ রুমে বসেন', বলে আমাদের লাইন থেকে উনাকে আমাদের অফিস রুমের এটাচড বাথরুমে নিয়ে এলো। নিয়ে এসে ওখানে

গুলি করলো। যে গুলি করল, গুলি করে সে আমাদের লাইনের কাছাকাছি এসে আবার দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে নাসের কাকা 'পানি-পানি' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তখন আরেকজন বললো, 'পানি দিয়ে আয়।' তখন যে গুলি করেছিল, সে এসে, আবার ফায়ার করল। তারপর... কিছুক্ষণ পরে দেখি যে রাসেলকে নিয়ে নিচে নেমে আসছে। রাসেল আমাকে দেখে, ও-যে গান পয়েন্টে ছিল ঠিক ভুলে গিয়ে, আমাকে এসে জড়িয়ে ধরেছে, ধরে বলে, 'ভাইয়া আমাকে মারবে না তো?' আমি বললাম, 'না ভাইয়া, তোমাকে মারবে না।'

ও যখন আমাকে জড়িয়ে ধরছে, একজন আর্মি ওকে ধরে নিয়ে গেটের ডানপার্শ্বে যে পুলিশ বাঙ্কার, ওখানে তাকে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে ওখানে আটকে রাখল। একজন সেন্ট্রি ছিল ওখানে। কিন্তু ওখান থেকে ও কান্নাকাটি করছিল যে, 'আমি মায়ের কাছে যাব।' তখন ওকে ঐ পুলিশ বাঙ্কার থেকে বের করে উপরে নিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনলাম, তারপর সমস্ত আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কর্নেল জামিল সাহেবের ডেডবডি দেখলাম ওনারই লাল টয়োটা গাড়িতে নিয়ে এখানে এনে রাখলো। ওনার ডেডবডির পা দুটো গাড়ির বাইরে আর বডির ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা গাড়ির ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে আব্দুল আর রমাকে নামিয়ে নিয়ে এল আমাদের লাইনে। তখন আমার পায়ে প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছিল এবং আব্দুলেরও গুলি লেগেছে, তারও খুব ব্লিডিং হচ্ছে। তখন এ বাসায় যে বুড়ি ছিল, রান্নার জন্য, সে বুড়ি আর্মিদের কাছে অনুরোধ করছে বারবার যে, 'দুটো ছেলে মারা যাচ্ছে, তোমরা তাদের হসপিটালে নিয়ে যাও।' কি মনে করে আব্দুলকে আর আমাকে– দু'জনকে দু'গাড়িতে করে আমাদেরকে হসপিটালে নিয়ে গেল। তারপর আর বলতে পারব না, এ বাড়িতে আর কি হয়েছিল।

সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২৫-৭২৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শেষের সেই দিন

তোফায়েল আহমেদ

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর আমার পদও বদলে গেল। ছিলাম রাজনৈতিক সচিব, হলাম রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী। সেই সঙ্গে করা হলো জাতীয় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকও। এতে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হলো। প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাটাতে হতো। সেদিনও তাই কাটিয়েছিলাম।

সেদিন, মানে ১৪ আগস্ট ১৯৭৫। আমি থাকি ধানমন্ডির ৩ নম্বরে। ঘুম থেকে উঠে রওনা দিলাম ৩২ নম্বরে। সময়মতো পৌঁছাতে হতো। কারণ বঙ্গবন্ধু সময় মেনে চলতেন। প্রতিদিন তিনি গাড়িতে উঠতেন ঠিক নয়টায়। আমি পৌঁছলাম সাড়ে আটটায়। নয়টা বাজতেই বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এলেন। তাঁর সচিবালয়ে তাঁর সচিব ও সহকারীদেরও অফিস ছিল ওখানে।

সকালের দিকটায় বেশির ভাগ আলাপই হলো দাপ্তরিক। পরদিন ১৫ আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবস। 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও গভীর হবে' শিরোনামে একটা বিবৃতি তৈরি করলেন। সেটা ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো।

১১টার দিকে একবার ৩২ নম্বরে গেলাম। ভাবির সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল। এরপর আর দশটা দিনের মতোই সাধারণ কাজে সকালের দিকটা কেটে গেল। শুধু টের পাচ্ছিলাম, বঙ্গবন্ধু খুবই উৎফুল্ল। কেন, সেটা টের পেলাম খাওয়ার সময়।

ঠিক দুইটায় সচিবালয় থেকে গণভবনে ঢুকতেন তিনি। ওখানে দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিতেন। আমার পরম সৌভাগ্য, বেশিরভাগ দিনই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুপুরের খাবারটা খেতাম। সেদিন খেতে বসে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই তো ডাকসুর ভিপি ছিলি, ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই রাজনীতিতে এলি। কাল কিন্তু তুইও আমার সঙ্গে যাবি।'

এবার বুঝলাম, কেন তিনি উৎফুল্ল। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

বঙ্গবন্ধু যাবেন সেখানে। অনুষ্ঠানটি নিয়ে বেশ উত্তেজিত মনে হলো তাঁকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা মিশ্র আবেগ ছিল তাঁর। খেতে খেতে বলতে লাগলেন সেসব

নিয়ে– কীভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কীভাবে সে জন্য তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছিল মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে। আমি রাজি হইনি।'

ব্যক্তিগত কিছু প্রসঙ্গও বঙ্গবন্ধু তুললেন। দিন পনেরো আগে আমার বড় ভাই মারা গেছেন। আগেও তিনি খোঁজ নিয়েছেন। সেদিন বললেন, 'তোর ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? খোঁজখবর নিস তো ঠিকমতো।'

এরপর বিশ্রামে গেলেন। পাঁচটায় বেরিয়ে রোজকার মতো গণভবনের বাগানে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। হাতে ছোট একটা লাঠি। হাঁটছেন আর কথা বলছেন। পেছন পেছন আমরা কয়েকজনও হাঁটছি। যত দূর মনে পড়ে, সাংবাদিক এবিএম মূসা ও বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মহীউদ্দিন আহমদও ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে বারবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ এল।

একটা জলাশয় ছিল গণভবনে। প্রতিদিনের মতো নিজ হাতে মাছগুলোকে খাবার দিলেন। এর মধ্যে মনসুর আলী ও কোরবান আলীসহ মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য এলেন দেখা করতে।

প্রতিদিন বিকেলে নানা শ্রেণীর লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন তিনি। লোকও আসত বিপুলসংখ্যক। সেদিন বিদেশিদের মধ্যে এসেছিলেন কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত সোন চুং। আমি ছিলাম সেই বৈঠকে। সেখানে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে কথা হলো।

এরপর আসতে শুরু করলেন সাক্ষাৎপ্রার্থীরা। বঙ্গবন্ধু কাউকে খালি হাতে ফেরাতেন না। সেদিনের দুজন মানুষের কথা খুব মনে আছে।

একজন এসেছিলেন মুন্সিগঞ্জ থেকে। মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমার কাছে কিছু টাকা রাখা থাকত। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, 'ওকে তিন হাজার টাকা দিয়ে দে।' আমি বললাম, গত মাসেই তো ওকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে, দিতে হবে না।' পরে সন্ধ্যায়, মোহাম্মদ হানিফ আমাকে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু আপনাকে নিষেধ করে আমাকে ডেকে ওই লোকটিকে তিন হাজার টাকা দিয়ে দিতে বলেছেন।'

যা হোক, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কাল রাতে ময়মনসিংহের এক লোক এসেছিল, কথা বলতে পারিনি। সে কি আজ এসেছে?'

লোকটি তাঁর স্ত্রীসহ সামনে এলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা সর্বস্ব হারিয়েছেন। সব শুনে বঙ্গবন্ধু তিন হাজার টাকা দিতে বললেন তাঁদের। টাকাটা দেয়ার পর বললেন, 'ওকে আরও দুই শ টাকা দে।'

আমরা হতবাক। তিনি লোকটিকে বললেন, 'তিন হাজার টাকা ভালো করে লুকিয়ে নিয়ে যাবেন। পথের যা খরচ এই দুই শ টাকা থেকে করবেন।'

এই হলেন বঙ্গবন্ধু।

ওই রাতে একটু আগে আগে বাসায় ফিরে গেলেন। আমি সঙ্গে যেতে পারিনি। তাঁর সচিবালয়ে একটা নৈশভোজ ছিল। তাঁর যুগ্ম সচিব মনোয়ারুল ইসলাম ও একান্ত সচিব মশিউর রহমান ডক্টরেট করতে যাবেন, সে উপলক্ষে। অনুষ্ঠান শেষে আমি আর মহীউদ্দিন আহমেদ গেলাম বঙ্গবন্ধুর বাসায়। বঙ্গবন্ধু তখন খাবার টেবিলে। আমাদের সঙ্গে দু-একটা কথা সেরে বললেন, 'তোফায়েল, কাল আগে আগে বাসায় চলে আসিস। একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।'

সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠে 'তোফায়েল' ডাকটিও আর শুনতে পাইনি।

এখন ড্রইংরুমভরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার ছবি নিয়ে বেঁচে আছি। কী যে গভীর আবেগের সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে। এই দুনিয়ার সব ঋণ হয়তো আমি শোধ করে দিতে পারব, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ পেয়েছি, তা কখনো শোধ হবে না।

তোফায়েল আহমেদ
বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন বিশেষ সহকারী,
বর্তমানে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য

সেই রাতের কথা

হামিদা সেরনিয়াবাত

প্রতিবছরই ১৪ আগস্ট বাবা আবদুর রব সেরনিয়াবাত (বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি) বরিশালে থাকতেন। এ দিন আমার দাদির মৃত্যুবার্ষিকী। কিন্তু ১৯৭৫ সালের এ দিনটিতে তাঁকে ঢাকাতেই ব্যস্ত রাখা হয়েছিল। এটাও ষড়যন্ত্রের কোনো অংশ হতে পারে, হয়তো নিয়তিই তাঁকে যেতে দেয়নি। আব্বার মন ছিল খুব খারাপ। বিকেলে আমাদের বাড়িতে মিলাদ পড়ানো হলো। বড় মামি (বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী), তাঁর দুই পুত্রবধূ খুকী ভাবি, রোজী, জামাল ও রাসেল মিলাদে এসেছিলেন। ছিলেন আমার বড় বোন আরজু আপা (শেখ মণির স্ত্রী), তাঁর দুই ছেলে পরশ আর তাপস। বাড়িতে তখন ছিল আরেকটি শিশু, আমার বড় ভাই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর ছেলে বাবু। বাবু, রাসেল আর আরিফ খেলনা পিস্তল হাতে খেলছিল। তখন কেউ কি জানত, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই অস্ত্র কেড়ে নেবে ওদের প্রাণ? আত্মীয়স্বজন বিদায় নিতে নিতে রাত ১০টা। সাড়ে ১০টায় আমরা আব্বার সঙ্গে খেতে বসলাম। রাতের খাবার আমরা আব্বার সঙ্গেই খেতাম। খাওয়া শেষে আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম। আব্বা, বড় ভাই ও শহীদ ভাই তখনো রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিলেন। আমার ফুফাতো বোনের বিয়ে ছিল ১৫ আগস্ট। এই উপলক্ষেই বড় ভাই আর শহীদ ভাই বরিশাল থেকে এসেছিলেন ঢাকায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে। ছোট বোন বেবীকে ডেকে তুললাম। ততক্ষণে গুলিতে ভেঙে পড়েছে ঘরের কাচ। আমরা দুই বোন দৌড়ে আব্বা-মায়ের ঘরে গেলাম। তাঁরাও ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ হচ্ছে। গুলির শব্দে ভাই, বাচ্চারা, ছোট ভাই–যে যার ঘর থেকে আব্বার ঘরে চলে এল। মা চিৎকার করে আব্বাকে বললেন, 'মিয়া ভাইয়ের (বঙ্গবন্ধু) বাসায় টেলিফোন করো।' আব্বা টেলিফোনে বড় মামার (বঙ্গবন্ধু) সঙ্গে কথা বললেন। মা জিজ্ঞেস করতেই আব্বা গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাঁরও আমাদের মতো অবস্থা।' ছোট বোন বেবী দৌড়ে গিয়ে আবার ফোন করল বঙ্গবন্ধুকে। বলল, 'মামা, আমাদের বাঁচান।' জানি না, মামা কী উত্তর দিয়েছিলেন। এদিকে মা ভাবিকে বললেন মণি ভাইকে ফোন করতে। শেখ মণি (বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে)

নিজেই ফোন ধরেছিলেন। মা বললেন, 'বাবা মণি, আমাদের বাসায় খুব গুলি হচ্ছে।' মণি ভাই বললেন, 'আমি দেখছি।' ওই কথাই ছিল মণি ভাইয়ের শেষ কথা। ততক্ষণে মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে ঘাতকেরা তাঁর বাসাতেও উপস্থিত হয়েছে।

বড় ভাই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'খবরদার! ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে না।' এরপর মিনিট দুয়েক সব চুপচাপ। এর পরই সিঁড়িতে অসংখ্য বুটের শব্দ। আমরা সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে রইলাম। ওরা 'সারেন্ডার সারেন্ডার' বলে চিৎকার করছিল। ১৫-২০ জনের মতো সশস্ত্র লোক এসে ঢুকে পড়ল ঘরে। আমরা সবাই হাত উঁচু করে দাঁড়ালাম। ওরা বলল, 'ভয় পাবেন না, সবাই নিচে নেমে আসুন।' সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছিলাম, তখন আব্বা আমার হাতটা ধরেছিলেন। আগের দিন বরিশাল থেকে চার-পাঁচটা ছেলে এসেছিল ঢাকায়। এর মধ্যে আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই রিন্টু ছিল আমাদের বাসায়। সে আব্বার কাছে ছুটে এসে বলল, 'চাচা, আমাদের কী হবে?' আব্বু শান্ত স্বরে বলেছিলেন, 'আল্লাহ যা করেন, তা-ই হবে।' এরপর ঘাতকেরা সবাইকে নিচতলার বসার ঘরে ঢুকতে বলল। সবশেষে ঢুকলাম আমি আর আব্বা। একজন জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তা আব্বাকে নাম জিজ্ঞেস করল। আব্বা বললেন, 'আমার নাম আবদুর রব সেরনিয়াবাত।' লোকটা একটু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, ভেতরে যান।' ঘরের ভেতরে ঢুকেই দেখলাম, ওরা সবাই পজিশন নিয়ে আছে। আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কমান্ডিং অফিসার কে?' একজন বলল, 'আমাদের কোনো কমান্ডিং অফিসার নেই।' মা বললেন, 'আপনারা কি আমাদের মারবেন?' একজন উত্তর দিল, 'না, আপনাদের মারব কেন?' কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই মাত্র দুই হাত দূরত্ব থেকে শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার। প্রথমবার আমি চিৎকার করে আব্বাকে জড়িয়ে ধরলাম। দ্বিতীয় রাউন্ড গুলি শুরু হলে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, আব্বাও উপুড় হয়ে পড়লেন। কানের কাছে শুনতে পাচ্ছিলাম গোঙানির আওয়াজ...পানি পানি...এরপর আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরলে বুঝলাম আমি হাসপাতালে আছি। কিছুই স্মরণ করতে পারছিলাম না। চিকিৎসকদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসছিল। শুনলাম, মণি ভাই, আরজু আপা, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কেউ বেঁচে নেই। আমি চিৎকার দিয়ে আবার জ্ঞান হারালাম। অচেতন অবস্থায় কেটে গেল ১৪ দিন। যখন পুরোপুরি জ্ঞান হলো, তখন জানলাম পাশের ওয়ার্ডে মা, ভাবি ও ছোট বোন আহত অবস্থায় আছে। কীভাবে আমাকে হাসপাতালে আনা হলো, তা জেনেছি পরে। আমাদের বাড়িতে যে ১৪ জন নিরাপত্তা রক্ষী ছিল, তাদের নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছিল। তাদেরই দুজন হাবিলদার রমনা থানায় গিয়ে ওসিকে বলেছিল, 'আমাদের স্যারকে কারা যেন মেরে ফেলেছে, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।'

রমনা থানার ওসি অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই তাঁর নিজস্ব পুলিশ ভ্যানে আমাদের হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন।

আমার ডান পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। গুলিতে পায়ের কিছু নার্ভ ছিঁড়ে গিয়েছিল। গুলিতে মায়ের ডান ঘাড়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল, থুতনি ফেটে গিয়েছিল।

কীভাবে যে আমরা সে সময়টা পার করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মানুষের জীবনে যেন এমন ট্র্যাজেডি না ঘটে।

একটা কথা বলে লেখাটা শেষ করি। খন্দকার মোশতাক আহমেদ ছিলেন শেখ জামালের বিয়ের উকিল বাপ। আমার মনে আছে, নানা (বঙ্গবন্ধুর বাবা) যখন মারা যান, তখন বঙ্গবন্ধুর চেয়ে এই মোশতাকই বেশি কেঁদেছিলেন। আমরা নাতি-নাতনীরা এই নিয়ে অনেক রসিকতা করেছি। মেজর ডালিম মামিকে (বেগম মুজিব) মা বলে ডাকত। জানি না, বঙ্গবন্ধু তাঁর মৃত্যুর আগে বিশ্বাসঘাতকদের কথা জেনে গিয়েছিলেন কি না। তাহলে হয়তো তিনিও বিস্ময়ের সঙ্গে জুলিয়াস সিজারের মতো বলতেন, Thou too Bruetas, ব্রুটাস, তুমিও! শুধু ব্রুটাসের জায়গায় বসিয়ে নিতেন ঠিক নামটি।

লেখক : হামিদা সেরনিয়াবাত। আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কন্যা।

সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্মসহোদর, ভাই শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।

এরই ফাঁকে একসময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে একসময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দুটি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে একসময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দুজন প্রতিবাদী, কর্নেল জামিল ও নাম না-জানা
এক তরুণ, যাঁরা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবি,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিল?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের একবেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আমরা তখন রুটিনমাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলো বেহেশতের দিকে...।
...তারপর ডেড্‌স্টপ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো।
–কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টক্‌টকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

রচনা : ১৯৮৭

যে হত্যার পেছনে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র

মুনতাসীর মামুন

৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন হল। এতদিন বাঙালি এ রায়ের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। গত ৩৪ বছর বিএনপি ও পাকিস্তানপন্থীরা যে প্রচারণা চালিয়েছিল, তার মূল কথা ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা একটি তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। তাদের এ প্রচারণার লক্ষ্য ছিল ঘাতকদের রক্ষা এবং সমাজের সর্বস্তরে পাকিস্তানি ধ্যানধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে মামলায় যেসব নথিপত্র উত্থাপন করা হয়েছে তার আলোকে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু হত্যা, জাতীয় চার নেতা হত্যা ও সংবিধান পরিবর্তন এবং সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব অপনোদন– সব একসূত্রে গাঁথা। এসব ঘটনার পেছনে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ছিল। আজ রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি পেছনে তাকাই এবং কিছু ঘটনার বিশ্লেষণ করি, তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকদের বিচার বন্ধ করতে ইনডেমনিটি জারি করেছিলেন খন্দকার মোশতাক। আর জিয়াউর রহমান সেই অধ্যাদেশটিকে পঞ্চম সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ঘাতকদের বিদেশী দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত সেই পুরস্কার ও এনাম দানের পালা অব্যাহত ছিল। আরও কৌতূহলের বিষয় যে, খন্দকার মোশতাক ৫ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে এক গেজেট নোটিফিকেশনে জেলহত্যা তদন্তের জন্য তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেন, জিয়াউর রহমান সেই তদন্ত কমিটি বাতিল করে দিয়েছিলেন। বিএনপি ও তার সহযোগীরা বরাবর ১৫ আগস্টকে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলেও চালিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু এটি যে সর্বৈব মিথ্যা, পরবর্তী ঘটনাবলিই তার সাক্ষী। সোহরাব হাসান যথার্থই লিখেছেন, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, আওয়ামী লীগই নাকি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছিল। যদি সেটাই সত্য হয়ে থাকে জিয়াউর রহমানের দল কেন মুজিব হত্যার দায় কাঁধে নিচ্ছে? আওয়ামী লীগের যে অংশ ১৫

আগস্ট চক্রান্তে জড়িত ছিল তারা এখন কোথায়? খন্দকার মোশতাক মারা গেলেও তার সব সহযোগী মারা যাননি। তারা কি আওয়ামী লীগ করছেন না অন্য পার্টি করছেন? ১৫ আগস্টকে যারা 'নাজাত দিবস' হিসেবে পালন করত তারাই বা কোন দলের? বিদেশে মুজিব হত্যাকারীদের পাসপোর্ট করে দিয়েছে কোন সরকার? (যুগান্তর ১৫-৮-০৫)।

সেনাবাহিনী থেকে বলা হয় এবং অনেক অ্যাপলজিস্ট ও 'নিরপেক্ষ'রাও বলেন, একদল বিপধগামী সেনাসদস্য শেখ মুজিবকে হত্যা করেছিল। 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পেছনে রহস্য নেই', লিখেছিলেন শ্রদ্ধাভাজন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, 'কিন্তু চক্রান্ত ছিল'। এ মন্তব্যের সত্যতা নিয়ে আজ ৩৪ বছর পর অধিকাংশেরই দ্বিমত নেই, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অ্যাপলজিস্টরা যে এ সত্য অনুধাবন করছেন এটিই ইতিবাচক দিক।

১৫ আগস্ট সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ বলেছেন, কিসিঞ্জার ও সিআইএ এ হত্যাকাণ্ডের উদ্যোক্তা। কিছুদিন আগে ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচিন্স একটি বই লিখেছেন, নাম 'ট্রায়াল অন হেনরি কিসিঞ্জার'। হিচিন্স নথিপত্র দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরের সময় 'মার্কিন দূতাবাসে বসেই ১৫ আগস্টের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে 'গো এহেড' সিগনাল দেন।

ভারতের প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার দু'মাস পরই লিখেছিলেন, বিশ্বের রাজনৈতিক চালচিত্র বদলে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে মার্কিন ক্লায়েন্ট সরকার স্থাপন করতে হবে। মাধ্যম হবে ঘুষ, ব্ল্যাকমেইল ও হত্যা।

কিসিঞ্জার যে বেইজিংয়ে মাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বা ঢাকাতে যে জঘন্য কাণ্ড ঘটেছে এটি সেই বাস্তবতারই প্রতিফলন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরই হত্যাকারীরা যেভাবে সহজে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে আশ্রয় পেল, তা প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্র ছিল এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে।

ইন্দিরা গান্ধী তখন ক্ষমতায়। তার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণ, জর্জ ফার্নান্দেজ প্রমুখ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তারা একে আখ্যায়িত করেছেন 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' বলে। ইন্দিরা গান্ধী সিপিআই নেতা ভুপেশ গুপ্তকে তখন বলেছিলেন, বিরোধীরা শুধু তার মৃত্যু নয়, তার সরকার অর্জিত সব সুফলকেও ধ্বংস করতে চায় এবং এর পেছনে অভ্যন্তরীণ প্ররোচনা ছাড়া বহিঃশক্তির ইন্ধনও আছে।

ইন্দিরা গান্ধীর সেই অনুমান ভুল বলি কিভাবে, যখন দেখি 'বিপ্লবী' ফার্নান্দেজ মহানন্দে চরম গণবিরোধী বিজেপি সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

মোহিত সেন লিখেছেন, সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের একটি চিঠি নিয়ে কুৎসোবিন এলেন দিল্লি। কুৎসোবিন সোভিয়েত পার্টির হয়ে ভারতীয়

ডেস্ক দেখতেন। তিনি সিপিআই নেতৃবৃন্দের কাছে সেই চিঠি ও কিছু দলিলপত্র হস্তান্তর করেন। চিঠির একটা কপিও করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল পড়ার পর তা ধ্বংস করে ফেলতে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশ স্থাপনে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। উপমহাদেশের তৎকালীন সেই তিন নেতা হলেন– ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। মস্কো থেকে প্রেরিত সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রথম দু'জন নেতাকে ইতিমধ্যে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানানো হয়েছে। সিপিআই নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তারা যেন প্রভাব খাটিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝান ষড়যন্ত্রের বিষয়টি হালকাভাবে না নিতে।

কুৎসোবিন আরও জানিয়েছিলেন, ভুট্টোকে বিষয়টি সরাসরি জানানো হয়নি। কারণ, ভুট্টো কমিউনিস্টদের বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মোটেই বিশ্বাস করতেন না। বলে রাখা ভালো, ভুট্টো বিশ্বাস করতেন মার্কিনিদের। কিছুদিন পর জানিয়েছেন, মোহিত সেন, কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সই করা একটি চিঠি এলো ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের কাছে। ক্যাস্ট্রো জানিয়েছিলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বা মার্কিন ষড়যন্ত্রকে গুরুত্ব সহকারে নেননি। মোহিত সেন অবশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি যুক্তরাষ্ট্রই ছিল এর হোতা। তবে ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। সোভিয়েত এই ষড়যন্ত্র করেনি, করলে কুৎসোবিনকে দিল্লি পাঠানো হতো না। তাহলে বাকি থাকে আমেরিকা ও তার ক্লায়েন্ট স্টেট পাকিস্তান।

উপমহাদেশে সপরিবারে প্রথম নিহত হন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা। এতে ভুট্টো সহায়তা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। স্ট্যানলি ওলপোর্ট ভুট্টোর যে জীবনী লিখেছেন তাতে এর ইঙ্গিতও স্পষ্ট (প্রমাণসহ)। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বিশ্ব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হল– এটি নিক্সন-কিসিঞ্জার মানতে পারেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল পাকিস্তানের জন্য চপেটাঘাত। এটি ভুট্টো ও পাকিস্তানের সামরিক এস্টাবলিশমেন্ট মেনে নিতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুর পর ভুট্টোকেও যেতে হয়। মার্কিন তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা (দুই জিয়া) ক্ষমতায় আসে এবং মার্কিনি সাহায্যে এক দশক ক্ষমতায় থাকে। এর আগে একই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল চিলিতে। আলেন্দেকে হত্যা করে পিনোচেটকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু কি তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র জানতেন না? জানতেন। ভারত ও সোভিয়েত সূত্র থেকে তাকে তা জানানো হয়েছিল। সে আমলে বাংলাদেশে যারা গুরুত্বপূর্ণ আমলা

ছিলেন (গোয়েন্দা বিভাগেও) তাদের কাছ থেকেও জেনেছি, তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানানো হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করেননি। তারা তখন তাকে ৩২ নম্বরের বাসভবন ছেড়ে গণভবনে এসে থাকার অনুরোধ করেছিলেন। তাতে তিনি খানিকটা সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু বেগম মুজিব ৩২ নম্বর ছেড়ে যেতে না চাওয়ায় তিনি আর গণভবনে যেতে চাননি। তাছাড়া বিষয়টিকে তিনি হালকাভাবে নিয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্যও তার মনে হয়নি কোন বাঙালি তাকে খুন করতে পারে। কারণ তার ভাষায়, 'আমি আমার দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তারা আমায় ভালোবাসে।' রবীন্দ্রনাথের ভক্ত শেখ মুজিব রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাও বিশ্বাস করেননি– '৭ কোটি মানুষকে বাঙালি করেছ...মানুষ করনি।' বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৃতিত্ব ছিল সশস্ত্রদের ওপর নিরস্ত্রদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ঔপনিবেশিক ধারা থেকে বেরিয়ে আসা। গতকালের রায়ে আদালত সেই ধারাটিকেই সমুন্নত করেছে। এই রায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা ও ষড়যন্ত্র বিনাশ হবে বলে মনে করি না। ষড়যন্ত্রকারীদের শেকড় অনেক গভীরে। বাংলাদেশে ষড়যন্ত্র বন্ধ হতে পারে তখনই যখন যুদ্ধাপরাধী, জেলহত্যা, গ্রেনেড হামলার বিচার সম্পন্ন হবে। আশা করি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দৃঢ়ভাবে এসবের বিচার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করে দেশকে প্রগতির ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যিনি, ইতিহাসের সমস্ত ব্যতিক্রম আবর্তিত হবে তাঁকে ঘিরেই। জীবদ্দশায় যেমন অনন্য মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে বিশ্ববরেণ্য, তেমনি মৃত্যুর পরও তার প্রতি মানুষের ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে অতুলনীয় আবেগে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে হাজার হাজার কবিতা আর গান। লিখেছেন বিদেশিরাও। সেই অসংখ্য কবিতার মধ্য থেকে বাংলা ভাষায় রচিত কিছু পঙ্‌ক্তি জাতির জনকের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হলো :

বঙ্গ-বন্ধু

জসীম উদ্‌দীন

মুজিবর রহমান!
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে,
জ্বালায় জ্বলিছে মহা-কালানল ঝঞ্ঝা-অশনি বেয়ে।
বিগত দিনের যত অন্যায় অবিচার ভরা-মার,
হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;
দিনে দিনে হয়ে বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে,
দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান ছিল প্রকাশের মুখে;
তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি
ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি।

মুজিবর রহমান।
তব অশ্বেরে মোদের রক্তে করায়েছি পূত-স্নান।
পীড়িত-জনের নিশ্বাস তারে দিয়েছে চলার গতি,
বুলেটে নিহত শহীদেরা তার অঙ্গে দিয়েছে জ্যোতি।
দুর্ভিক্ষের দানব তাহারে দেছে অদম্য বল,
জঠরে জঠরে অনাহার-জ্বালা করে তারে চঞ্চল।
শত ক্ষতে লেখা অমর কাব্য হাসপাতালের ঘরে,
মুহুর্মুহু যে ধ্বনি হইছে তোমার পথের 'পরে।
মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,
তব সম্মুখ পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা।

(১৯৭১ সালের মার্চ মাসে রচিত কবিতার অংশবিশেষ)

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে

সৈয়দ শামসুল হক

এই পৃথিবীতে আর আকাশ দেখিনি আমি এতো-অবনত–
ঘুমন্ত শিশুর মুখে যেন চুমো খাবে পিতা নামিয়েছে–মুখ;
প্রান্তর এতোটা বড় যেন মাতৃশরীরের ঘ্রাণলাগা শাড়ি;
আদিকবি পয়ারের মতো অন্তমিল নদী এতো শান্তস্বর;
এতোই সজল মাটি কৃষকের পিঠ যেন ঘামে ভিজে আছে;

যদিও বৃষ্টির কাল নয় তবু গাছ এতো ধোয়ানো সবুজ;
দেখিনি এমন করে পাখিদের কাছে ব্যর্থ ব্যাধের ধনুক-
মানুষের কাঁধটিকে বৃক্ষ জেনে বসে তারা এতো স্বাভাবিক;
এ কেমন?– এমনও কি ভিটে হয় কারো এই পৃথিবীতে যার
বাড়ির গভীরে আছে সকলের বাড়িঘর এতোখানি নিয়ে;
এভাবে ওলান থেকে অবিরল দুধ ঝরে পড়ে যায়– এতো
শব্দ কোন গ্রামে আমি কোন বিবরণের আর কখনো পাইনি;
কোথাও দেখিনি আর একটি পল্লীতে এতো অপেক্ষায় আছে
রাখালের মতো তার গ্রীবা তুলে মানুষের স্বপ্নের সময়।
এখানে এসেছি যেন পথই টেনে নিয়ে এলো এই পল্লীটিতে।
সকল পথের পথ পল্লীটির দিকে অবিরাম ঘুরে গেছে–
গিয়েছিল– একদা যখন এই পল্লীটির কালো মাটি থেকে
একটি নতুন শিশু উঠে এসেছিল, আর এই পল্লীটিরই
পাশ দিয়ে মাটির দুধের মতো বহে যাওয়া নদীটিতে নেয়ে
ক্রমে বড় হয়েছিল আর চেতনার কামারশালায় বসে
মানুষের হাতুড়ি নেহাই লোহা প্রযুক্তির পাঠ নিয়েছিল,
সকল পল্লীকে তার আপনার পল্লী করেছিল। সেই তাঁরই
টগবগে দীর্ঘদেহ ছিল, মানুষ দেখেছে– দেখেছিল তাঁকে–
বাংলার বদ্বীপব্যাপী কংকালের মিছিলের পুরোভাগে, তাঁকে
দেখেছিল চৈত্রের অগ্নিতে তারা, আষাঢ়ের বর্ষণের কালে,
মাঘের শীতার্ত রাতে এবং ফাল্গুন ফুল যখন ঝরেছে,
যখন শুকিয়ে গেছে পদ্মা, আর যখন সে বিশাল হয়েছে;
যখন ষাঁড়ের ক্ষুর দেবে গেছে আর মাটি রক্তে ভিজে গেছে,
যখন সময়, আর ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি শুরু হয়ে গেছে
এখানে এসেছি যেন পথই টেনে নিয়ে এলো এই পল্লীটিতে।

টেনে নেবে পথ; যদিও অনেকে আজ পথটিকে ভুলে গেছে,
যদিও এই তো দেখি, কণ্টিকারী ফেলে ফেলে পথটিকে কেউ
পথিকের জন্যে বড় দুর্গম করেছে এবং যদিও জানি
কেউ কেউ আমাদের পথের সম্বল সব খাদ্যপাত্রগুলো
মলভাণ্ডরূপে আজ ব্যবহার করে; বিষ্ঠায় পতিত হবে
অচিরে তারাই; আমি করতল থেকে খুঁটে খাবো; সঙ্গ দেবে
আমাদেরই পথের কবিতা; আমাদের প্রধান কবিকে যারা
একদিন হত্যা করে তাঁর জন্মপল্লীটিতে মাটিচাপা দেয়–
মাটি গভীর থেকে আজো সেই হাত– পুরানোকথার মতো–
স্মৃতির ভেতর থেকে উচ্চারণমালা, নদীর গভীর থেকে
নৌকোর গলুই, পথিকের পদতল কাঁটায় রক্তাক্ত যদি,
সেই রক্ত শোধ হোক তাঁর কাছে ঋণ; মানব প্রসিদ্ধ কৃষি
খুব ধীরে কাজ করছে: পাখিরা নির্ভয়; আর আমিও পৌঁছেছি;
আমারই ভেতর-শস্য-টেনে নিয়ে এলো আজ আমারই বাড়িতে।

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি

নির্মলেন্দু গুণ

সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি,
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ
গতকাল আমাকে বলেছি, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের
কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শহিদ মিনার থেকে খসে-পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল
আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।
সমবেত সকলের মতো আমিও পলাশ ফুল খুব ভালোবাসি,
'সমকাল'
পার হয়ে যেতে সদ্যফোটা একটি পলাশ গতকাল কানে কানে
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শাহবাগ এ্যভিন্যুর ঘূর্ণায়িত জলের ঝরনাটি আর্তস্বরে
আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

সমবেত সকলের মতো আমারো স্বপ্নের প্রতি পক্ষপাত আছে,
ভালোবাসা আছে– শেষ রাতে দেখা একটি সাহসী স্বপ্ন গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

এই বসন্তের বটমূলে সমবেত ব্যথিত মানুষগুলো সাক্ষী থাকুক,
না-ফোটা কৃষ্ণচূড়ার শুষ্কভগ্ন অপ্রস্তুত প্রাণের ঐ গোপন
মঞ্জরীগুলো কান পেতে শুনুক,
আসন্ন সন্ধ্যার এই কালো কোকিলটি জেনে যাক-
আমার পায়ের তলায় পুণ্য মাটি ছুঁয়ে
আমি আজ সেই গোলাপের কথা রাখলাম, আজ সেই
পলাশের কথা
রাখলাম, আজ সেই স্বপ্নের কথা রাখলাম।

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।

(বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর রচিত প্রথম কবিতা)

তিনি এসেছেন ফিরে

শামসুর রাহমান

লতাগুল্ম, বাঁশঝাড়, বাবুই পাখির বাসা আর
মধুমতি নদীটির বুক থেকে বেদনাবিহ্বল
ধ্বনি উঠে মেঘমালা ছুঁয়ে
ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়।

এখন তো তিনি নেই, তবু সেই ধ্বনি আজ শুধু
তাঁরই কথা বলে;
মেঘনা নদীর মাঝি যখন নদীতে
ভাটিয়ালী সুর তোলে, তার
পালে লাগে দীর্ঘদেহী সেই পুরুষের দীর্ঘশ্বাস,
যখন কৃষক কাস্তে হাতে
ফসলের যৌবনের উদ্ভিন্ন উল্লাস দেখে মাতে,
তখন মহান সেই পুরুষের বিপুল আনন্দধ্বনি ঝরে
ফসলের মাঠে,
যখন কুমোর গড়ে মাটির কলস, ঘটিবাটি,
নানান পুতুল চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে,
তখন সৃজনশীল্পে তার
জেগে ওঠে মহান নেতার স্বপ্নগুলি,
উচ্ছ্বসিত লাউডগা, কচুপাতা, কুয়োতলা, পোয়াতি
কুমোর বউ।

ওরা তাঁকে হত্যা ক'রে ভেবেছিল তিনি
সহজে হবেন লুপ্ত উর্ণাজাল আর ধোঁয়াশায়,
মাটি তাকে দেবে চাপা বিস্মৃতির জন্মান্ধ পাতালে–
কিন্তু তিনি আজ সগৌরবে
এসেছেন ফিরে দেশপ্রেমিকের দীপ্র উচ্চারণে,
সাধারণ মানুষের প্রখর চৈতন্যে,
শিল্পীর তুলিতে, গায়কের গানে, কবির ছন্দের
আন্দোলনে,
রৌদ্রঝলসিত পথে মহামিছিলের পুরোভাগে।

কফিন কাহিনী

মহাদেব সাহা

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি কফিন
একজন বললো দেখো ভিতরে রঙিন
রক্তমাখা জামা ছিলো হয়ে গেছে ফুল
চোখ দুটি মেঘে মেঘে ব্যথিত বকুল!

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে এক শবদেহ
একজন বললো দেখো ভিতরে সন্দেহ
যেমন মানুষ ছিলো মানুষটি নাই

মাটির মানচিত্র হয়ে ফুটে আছে তাই!

চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি শরীর
একজন বললো দেখো ভিতরে কী স্থির
মৃত নয়, দেহ নয়, দেশ শুয়ে আছে

সমস্ত নদীর উৎস হৃদয়ের কাছে!
চারজন দেবদূত এসে ঘিরে আছে একটি কফিন
একজন বললো দেখো ভিতরে নবীন
হাতের আঙুলগুলি আরক্ত কবরী

রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি!

রচনকাল-১৯৭৬

সেই মুখখানি কবিতার বড়ো ছিল

কামাল চৌধুরী

সেই মুখখানি স্বাধীনতা প্রিয় ছিল
সেই মুখখানি মিছিলে মানব হত
উত্থিত হাতে স্লোগানে চলায় মিলে
সেই মুখখানি অগ্নির সাথী ছিল।

তাঁর চলা ছিল পদ্মার জলস্রোত
হু হু বেগে এসে ধুয়ে নিত সব গ্লানি
তাঁর বলা ছিল মেঘে বিদ্যুতে ডাক
স্লোগানে মিছিলে শব্দিত হয়ে থাকা
সেই মুখখানি আমাদের পিতা ছিল।

আমার স্বদেশ রক্তের ঘোলা জলে
তাঁর হাত দুটো উদ্যত রাইফেল
যুদ্ধে বারুদে শহীদের লাশ ছুঁয়ে
শিবিরে শিবিরে সকল রণাঙ্গনে
সেই মুখখানি স্বদেশের ছায়া ছিল।

মৃত্যুর রাতে তরতাজা সেই মুখ
রক্তে বুলেটে একাকার শুয়ে ছিল
ধূপধূনাহীন বারুদের প্রিয় ঘ্রাণে
সেই মৃতদেহ যুদ্ধ প্রেরণা ছিল।

শিশিরের কাছে পদচিহ্নের মতো
সেই মুখখানি বারবার ফিরে আসে
রক্ত বারুদ যুদ্ধের স্মৃতি শুঁকে
সেই মুখখানি আঁকতে চেয়েছি কতো

আঁকতে পারি না আঁকতে পারি না হায়
এখানে আমার শব্দেরা সব কাঁদে
ব্যর্থতা নিয়ে জেগে থাকে সারারাত।

যুদ্ধে মিছিলে মৃত্যু বারুদে মাখা
সেই মুখখানি কবিতার বড়ো ছিল।

(অংশবিশেষ)

মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

বাঙালির প্রাণ শব্দ 'বঙ্গবন্ধু' উচ্চারিত হলে
আকাশ সুনীল হয়, সূর্য পায় জীবন উদ্ভাস
বাঙালি ভুবন জুড়ে রক্তিম প্রভাতী রঙ বুকে
বৃক্ষরা উন্নত শির লাল-সবুজ পতাকা হয়,
তেরশত নদী স্রোত 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে
জাগায় সাগরপ্রাণ, 'জয় বাংলা' বিক্রম ধ্বনিতে
জোয়ারে প্রফুল্ল হয় বাঙালির বঙ্গোপসাগর–
বাতাসে বাতাসে গান
'শোন একটি মুজিবরের থেকে'
বাঙালির ইচ্ছাগুলো সাত মার্চের উদ্যান হয়
মেহনতি মানুষের হৃদস্পন্দে মুখর 'এবারের সংগ্রাম
মুক্তির সংগ্রাম' মন্ত্রে, শিশু কিশোর তরুণ মন
গেয়ে ওঠে ঐকসুর 'আমরা আনিব রাঙা প্রভাত'

'বঙ্গবন্ধু' নাম শব্দে বাঙালি আবার জেগে ওঠে
শপথে উন্নত শির, পঁচাত্তরের ঘাতকদের
ফাঁসির দাবিতে আসে রাজপথে মিছিলে মিছিলে
বিপুল উত্তাল হয় একাত্তরের সাহস নিয়ে,
'বঙ্গবন্ধু' প্রিয় নাম বাঙালির জীবন বাসনা ...
বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ী চির প্রেরণার মহানাম
এই নামে বাঙালির শুরু হোক মুক্তির সংগ্রাম।

(অংশবিশেষ)

লন্ডনে প্রথম বিচার দাবি

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রথম এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আনুমানিক প্রতিবাদ ওঠে লন্ডনের জনসভায় একই বছরের ১৩ নভেম্বর তারিখে। প্রভাবশালী কয়েকজন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যের উপস্থিতিতে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল লন্ডনের কনওয়ে হলে। এ সভায় লেবার পার্টির প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য সিমার্ড বিডওয়েল জোরালো ভাষায় হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা ব্যক্তি হত্যা নয়, এটা মানবতার বুকে অস্ত্রাঘাত এবং অমার্জনীয় অপরাধ। এই ঘাতকদের বিচার না হলে তা হবে মানবতার জন্য এক দুরপনেয় কলঙ্ক। এ সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং জাতির জনক ও চার জাতীয় নেতার হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত শোকমিছিলেও শামিল হয়েছিলাম।

পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মুখপত্র হিসেবে বের হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার ডাক'। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বর্তমানে ম্যানচেস্টারে বসবাসকারী সাবেক কূটনীতিক মহিউদ্দিন চৌধুরী। ১৯৭৬ সালের বঙ্গবন্ধুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলার ডাক-এর বিশেষ সংখ্যা বের হয়। তাতে পনরই আগস্ট তোমার মৃত্যুদিন নয়, তোমার নতুন জন্মদিন শীর্ষক লেখাটি প্রকাশিত হয়। এ লেখাটি ছিল আমার। আজ ৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যকারীদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছেন তাকে অভিনন্দন জানাই এবং এই লেখাটি পাঠকের কাছে পুনরায় তুলে ধরছি। কারণ ৩৪ বছর পর জাতি আজ কলঙ্কমুক্ত হল।

পনরই আগস্ট তোমার মৃত্যুদিন নয় বঙ্গবন্ধু, তোমার জন্মদিন। তোমার নতুন জন্মদিন।

মৃত্যুর মাতৃগর্ভ থেকে তোমার জন্ম। দানবের অস্ত্রাঘাতে তোমার জন্ম। বাংলার গৈরিক মাটিতে নিজের শোণিত ধারা থেকে তোমার জন্ম। তুমি আজ এক মুজিব নও।

শত মুজিব। সহস্র মুজিব। কোটি মুজিব।

বঙ্গবন্ধু, তুমি আমাদের রক্ত-অভিবাদন গ্রহণ করো। যুগে যুগে তোমার অভ্যুদয়। কখনও তুমি ঈশা খাঁ। কখনও সিরাজ। কখনও তিতুমীর। কখনও সূর্যসেন। কখনও ক্ষুদিরাম। তুমি শুধু নেতা নও। মুক্তিদাতা, পিতা এবং বন্ধু। তুমি বাংলার দুর্জয় তারুণ্যের হিমালয়। তুমি পদ্মা মেঘনা যমুনার কালজয়ী কল্লোল। যুগে যুগে তুমি বাংলার মানুষের জন্য আত্মদান করেছ। তোমার বুকে আঘাত হেনেছে কখনও মীরজাফর, কখনও মুশতাক। কখনও মোহাম্মদী বেগ, কখনও ফারুক-ডালিমের দল। কিন্তু তোমার মৃত্যু ঘটাতে পারেনি বর্বর ঘাতকের অস্ত্র। ভাগীরথী থেকে বুড়িগঙ্গা। পলাশী থেকে ধানমন্ডি। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৫। কালের যাত্রার ধ্বনি বাংলার আকাশে একই রক্তিম লেখায় তার অধ্যায় সাজিয়ে গেছে। সেই ইতিহাসে আজ একটি নাম সবচাইতে দীপ্ত ভোরের শুকতারা। সেই নাম শেখ মুজিব। মুজিব আজ একটি মানুষের নাম নয়, একটি দেশের নাম। একটি ভূখণ্ডের নাম। একটি মানচিত্রের নাম। এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম।

বঙ্গবন্ধু, তাই তোমার মৃত্যু নেই। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী। তুমি আমাদের সংগ্রামী অভিবাদন গ্রহণ করো।

তুমি বাংলার পদাবলী। তুমি বাংলার মঙ্গল কাব্য। তুমি রবীন্দ্রনাথের সুর। নজরুলের বিদ্রোহ। জীবনানন্দের স্বপ্ন। সুকান্তের বিপ্লবী কণ্ঠ। তুমি বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস। তুমি ইতিহাস–বাংলার সন্তান। মূর্খ নরপশুর দল জানে না– ইতিহাসের সন্তানের মৃত্যু নেই। মৃত্যু হয় না। তাদের পরাজয় নেই। তারা চিরজয়ী। তাই দেশে দেশে তুমি লিঙ্কন, লুমুম্বা, গান্ধী। আর নাথুরাম গডসে থেকে ফারুক-ডালিমের দল ইতিহাসের ঘৃণ্য আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে প্রতি মহররমে ক্রন্দসী বসুধার আর্তকণ্ঠে ধ্বনি ওঠে– হায় হোসেন, হায় হোসেন। কেউ মুহূর্তের জন্য স্মরণ করে না ঘাতক এজিদ কিংবা সীমারকে।

কি করে মুছবে ঘাতকের দল তোমার নাম বাংলার মাটি থেকে? বাংলার মানুষের হৃদয় থেকে? বাংলার আকাশের নীলিমা থেকে? বাংলার বাতাসের মূর্ছনা থেকে? বাংলার পাখির সুর থেকে? বাংলার নদীর কলতান থেকে? তুমি বাংলার হাজার বছরের সংগ্রাম। তুমি বাংলার হাজার বছরের গণসংস্কৃতি। তুমি বাংলার হাজার বছরের ভূখণ্ড। তোমার রাজনীতি কখনও দখিনা বাতাস। কখনও সাইক্লোন। তোমার নশ্বর দেহ আজ নেই আমাদের মাঝে। কিন্তু পাশে চেয়ে দেখি কৃষকের কাস্তে হাতে, মজুরের শাবল হাতে,

লেখকের লেখনী হাতে মুজিব। মুজিবের নাম আজ আন্দোলন। মুজিবের নাম আজ সংগ্রাম। এই সংগ্রাম বাংলার সাড়ে সাত কোটি গণমানুষের মুক্তির শেষ সংগ্রাম।

ভোরের শিশির হয়তো আজ তোমার নাম লিখছে সংগোপনে ঝরা শিউলির বনে। কিন্তু ষড়ঋতুর বাংলাদেশে এটাই সত্য নয়। ঈশানে ঝড়ো মেঘ জমছে। বজ্রে তৈরি হচ্ছে নতুন রণ-দামাম। আর তার প্রলয়-শিহরণে শিহরিত, স্পন্দিত বাংলার বিদ্রোহী যৌবন।

'সহসা অনেক রাত্রে দেশদ্রোহী ঘাতের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।'

বঙ্গবন্ধু, এই সূর্য অস্তমিত হয়নি। কুৎসা, নিন্দা ও ষড়যন্ত্রের কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়েছে মাত্র। এই কুয়াশার জাল ছিন্ন করার সংগ্রাম আজ আমাদের। সুকান্তর ভাষায় আজ আমাদের ঘোষণা :

"কুয়াশা কাটছে কাটবে আজ কি কাল
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল।
ততদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।"

বাংলার নয়নমণি, তোমার জন্য শোকাশ্রু নয়, আমরা হৃদয়ে জমা করেছি ক্রোধের বারুদ। সেই বারুদ দিয়ে তৈরি হবে গণসংগ্রামের আগ্নেয়াস্ত্র। আর লক্ষ-কোটি বাহু ঐক্যবদ্ধ হবে শত্রুবধের শেষ সংগ্রামে, গণমুক্তির শেষ লড়াইয়ে।

বঙ্গবন্ধু, তুমি আজ বাংলার মাটিতে সমাহিত। কিন্তু কোটি হৃদয়ে জাগ্রত। লক্ষ হৃদয় আজ তোমার স্মৃতিসৌধ। মুক্তিদাতা, তোমাকে আমরা ভুলিনি। ভুলিনি তোমার ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক সাধনা, ত্যাগ ও দুঃখবরণের কথা। তুমি বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছো। বাঙালিকে দিয়েছো বাঙালি নামের পরিচয়। ত্রিশ লাখ বাঙালি তোমারই আহ্বানে দিয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মাহুতি। তাদের আমরা ভুলিনি। ভুলতে পারি না। তাই আজ আমরা অস্ত্র হাতে সমবেত, সম্মিলিত। তুমি কবরে শুয়ে আমাদের নেতৃত্ব দাও।

"জনসিংহের ক্ষুব্ধ নখর
হয়েছে তীক্ষ্ণ হয়েছে প্রখর
ওঠে তার গর্জন
প্রতিশোধ প্রতিশোধ।
হাজার হাজার শহীদ ও বীর

স্বপ্নে নিবিড় স্মরণে গভীর
ভুলিনি তাদের আত্মবিসর্জন।
ঠোঁটে ঠোঁটে কাঁপে প্রতিজ্ঞা দুর্বোধ :
কানে বাজে শুধু শিকলের ঝনঝন
প্রশ্ন নয়কো পারা না পারার
অত্যাচারীর রুদ্ধ কারার
দ্বারভাঙ্গা আজ পণ।

হে ঘাতক, নির্বোধ :
রক্ত দিয়েই সব ঋণ কর শোধ।
শোনো পৃথিবীর মানুষেরা শোনো
শোনো স্বদেশের ভাই
রক্তের বিনিময় হয় হোক
শত্রু-নিপাত চাই।"

বঙ্গ, শত্রুবধের সংগ্রাম শেষে প্রতি পনরই আগস্ট আমরা তোমার জন্মদিন পালন করবো, মৃত্যুদিবস নয়। আমাদের কণ্ঠে চিরকালের ধ্বনি : জয়তু মুজিব, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা।

এ ছিল তার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের গাঢ় উচ্চারণ। আজ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়ের দিনেও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী : সাহিত্যিক ও কলাম লেখক

দায়মুক্তি অধ্যাদেশে আটকে ছিল বিচারের পথ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় সূচিত হয়। সেহ দিন ভোরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের ৬৭ নম্বর বাড়িতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (দায়মুক্তি অধ্যাদেশ) জারি করে।

এই অধ্যাদেশ জারি করে বিচারে সোপর্দ করার দায় থেকে খুনীদের অব্যাহতি দেয়া হয়। তাদের রক্ষার জন্য করা হয় এই আইন। রুদ্ধ করা হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ। আইন করে হত্যার বিচার বন্ধের নজির পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে নেই। এর মধ্যে পেরিয়ে যায় ২১টি বছর।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ঐ বছরের ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এই কুখ্যাত কালো আইন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। উন্মুক্ত হয় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ। এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের ৯ সদস্যকে হত্যার অভিযোগে ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

কিন্তু তারপরেও খুনিরা বসে থাকেনি। উক্ত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আসামি সৈয়দ ফারুক রহমান ও শাহরিয়ার রশীদ খান হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

১৯৯৭ সালের ২৮ জানুয়ারি উক্ত রিট আবেদন হাইকোর্টে না মঞ্জুর হয়। এই অধ্যাদেশ বাতিলকে বৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল করেন। কিন্তু ১৯৯৮ সালের ২ এপ্রিল ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বৈধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ফারুক রহমান ও শাহরিয়ার রশিদ খানের আপিল খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায়
সর্বোচ্চ আদালতে আসামীদের আপিল খারিজ
১২ খুনীর ফাঁসি বহাল

সাঈদ আহমেদ

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১২ খুনীর ফাঁসি বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ে হাইকোর্টের দেয়া আদেশকে 'যথার্থ' মন্তব্য করে ১২ আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। মৃদ্যুদণ্ড পাওয়া কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লে. কর্নেল (অব.) মুহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) এবং মেজর (অব.) বজলুল হুদা এখন কারাগারে রয়েছেন। জেল কোড অনুযায়ী তাদের রিভিউ পিটিশন এবং প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষা (মার্সি পিটিশন)'র সুযোগ দিয়ে ফাঁসি কার্যকর করা যাবে। বিভিন্ন দেশে পলাতক ৬ আসামী (একজন মৃত্যুবরণ করেছেন) যখনই গ্রেফতার কিংবা আত্মসমর্পণ করবেন তখনই রায় কার্যকর হবে। আইন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন, আগামী জানুয়ারির মধ্যেই খুনীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। এদিকে নির্বিঘ্নে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার পর সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নেমে আসে স্বস্তি। রায়ের প্রভাব পড়ে পুঁজিবাজারেও। দিনের শুরুতে পুঁজিবাজার ছিল বেজায় মন্দা। রায় ঘোষণার পর দ্রুত উপরের দিকে উঠতে থাকে। দিনের শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ সূচক আগের দিনের চেয়ে ২৮.২৮ পয়েন্ট বেড়ে ২৩৬৪.৫৬ পয়েন্ট দাঁড়ায়। এদিকে রায় ঘোষণার পরপরই দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মিছিল ও শোকরানা নামাজ আদায়ের খবর পাওয়া যায়। ৩৪ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে– এমন প্রত্যাশায় শত আইনজীবী সকাল থেকে উপস্থিত হন সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে। ১১টায় আদালত বসার কথা থাকলেও ১০টা নাগাদ কানায় কানায় ভরে ওঠে প্রধান বিচারপতির এজলাস। আইনজীবীদের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়

শুনতে উপস্থিত হন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, আ'লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও ১৫ আগস্ট নিহত আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের পুত্র আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, নিহত শেখ ফজলুল হক মণির পুত্র মামলার আইনজীবী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাহ্হার আকন্দ, মামলার বাদী আ ফ ম মোহিতুল ইসলাম, জনতা ব্যাংকের পরিচালক বলরাম পোদ্দার এমপি, আখতারুজ্জামান বাবু এমপিসহ অনেক রাজনৈতিক নেতা। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম আরও চার বিচারপতিকে নিয়ে এজলাসে আসন গ্রহণ করেন ১১টা ৪৫ মিনিটে। বিশেষ এ বেঞ্চের অপর বিচারপতিগণ হলেন বিচারপতি মোঃ আব্দুল আজিজ, বিচারপতি বি কে দাস, বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এবং বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা (এস কে সিনহা)। মুহূর্তেই জনাকীর্ণ আদালতে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। অত্যন্ত ধীরস্থির ও ভাবগম্ভীর পরিবেশের অবতারণা হয় সেখানে। রায়ের মূল অংশ পাঠ করেন বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম। অন্যান্য আপিল রায়ের ক্ষেত্রে দুই-তিন শব্দে আপিল গ্রহণ কিংবা আপিল খারিজ করে এ রায় দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল রায় পাঠ করা হয় ১০ মিনিট ধরে। সংক্ষিপ্ত রায়ে আদালত বলেন, ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে মেজর (অব.) বজলুল হুদা, লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লে. কর্নেল মুহিউদ্দিন (আর্টিলারি) এবং মেজর (অব.) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) পৃথক ৫টি লিভ পিটিশন (আপিল আবেদন) ফাইল করেছেন। পিটিশনে উল্লেখিত পাঁচটি গ্রাউন্ডে আপিল মঞ্জুর হয়। গ্রাউন্ডগুলো উল্লেখ করে আদালত রায়ে বলেন, (ক) কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর সেকশন ৩৭৮ এবং ৪২৯ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি ডেথ রেফারেন্স মামলার যতটুকু প্রয়োজন মনে করেন ততোটুকুর শুনানি গ্রহণ করতে পারেন। সেই এখতিয়ার অনুসারে তিনি দণ্ডিত ১২ আসামীর মধ্যে ৬ আসামীর শুনানি গ্রহণ করেছেন– ৯ জনের শুনানি গ্রহণ করেননি। এটি যথার্থ এবং এখানে বিধির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। (খ) মামলা দায়েরে বিলম্বের কারণ এফআইআর-এ উল্লেখ ছিল । বিচার আদালত রায়ে এ বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এটি বিজ্ঞ হাইকোর্ট বিভাগ বিশ্বাস করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। হাইকোর্ট কোন ভুল করেনি। (গ) আসামীরা ঘটনার সময় সক্রিয়ভাবে সামরিক বাহিনীর চাকরিতে ছিলেন না। তাই সেনা আইনে বিচার না করে সাধারণ

আইনে বিচার আইনগত কোন ভুল ছিল না। (ঘ) বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্যই ষড়যন্ত্র হয়েছিলো– রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য নয়। (ঙ) রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। পক্ষান্তরে আসামীপক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে বৈপরীত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। এসব কারণে আসামীদের আপিল খারিজ করা হলো।

আদালতের এ রায় ঘোষণার পর উপস্থিত আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা সমস্বরে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলে শুকরিয়া আদায় করেন।

রায় ঘোষণার পরপরই এটর্নি জেনারেল বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথম টেলিফোনে রায়ের সংবাদ দেন। শেখ হাসিনা এতে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ২ রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। তিনি দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আরেক কন্যা লন্ডনে অবস্থানরত শেখ রেহানা রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে 'ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে' বলে মন্তব্য করেন।

আদালত থেকে বেরিয়ে মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ কৌঁসুলি আনিসুল হক বলেন, আমরা এতোদিনে বিচারের সঠিক দরজায় উপনীত হয়েছি। জাতি ন্যায়বিচার পেয়েছে। রায় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। ১৫ আগস্ট নিহত শেখ ফজলুল হক মণি ও আরজু মণির পুত্র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, আজ আমার জন্মদিন। এ রায় আমার জন্মদিনের উপহার। ১৫ আগস্ট নিহত আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের পুত্র আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ৩৪ বছর পর আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি। জাতি আজ কলঙ্কমুক্ত হলো।

রায়ের পর মামলার বাদী আ ফ ম মোহিতুল ইসলাম বলেন, রায়ে আমি খুশি। আজ জাতির প্রত্যাশা পূরণ হলো। আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলার মানুষও খুশি।

এদিকে রায় ঘোষণার পর আসামী বজলুল হুদা ও একেএম. মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার)'র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, হাইকোর্টের পুরো রায়ই বহাল রাখা হয়েছে। পলাতক ৬ জন ফিরে এলে তারা বিলম্ব মার্জনা চাইতে পারবেন। মক্কেলের সঙ্গে আলাপ করে আমরা রিভিউ পিটিশন দায়ের করবো। অপর তিন আসামীর কৌঁসুলিরাও রিভিউ পিটিশন করবেন বলে জানিয়েছেন।

রায় ঘোষণা সম্পন্ন হওয়ার পরপরই আদালত অঙ্গনে সূচনা হয় এক অভাবনীয় দৃশ্যের। শত শত আইনজীবী 'ভি' (ভিক্টরি সাইন) চিহ্ন প্রদর্শন করে এজলাস থেকে বেরিয়ে আসেন। কেউবা আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন। উপস্থিত সবার মোবাইলে ক্রমাগত কল আসতে থাকে আদালতের বাইরে রায়ের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকা

মানুষের কাছ থেকে। আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ কেউ বার ও আদালত ভবনের মধ্যকার গ্যাংওয়েতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। আদালত কম্পাউন্ডের বাইরেও এ সময় জনতা উল্লাস প্রকাশ করে। সবগুলো টিভি চ্যানেল রায়ের পূর্ব এবং পরবর্তী মুহূর্তগুলো সরাসরি সম্প্রচার করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণা উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে গ্রহণ করা হয় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ৮ স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নবগঠিত বাহিনী 'সোয়াত'-এর অবস্থান সবার দৃষ্টি কাড়ে। রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫ বিচারপতিকে সার্বক্ষণিক ঘিরে ছিল র‍্যাব, ডিবি ও পুলিশ বাহিনী।

গতকাল সুপ্রিম কোর্ট সংক্ষিপ্ত রায়ে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। ফাঁসির আদশেপ্রাপ্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কারাবন্দী ৫ জনের দণ্ড কার্যকর করা সম্ভব। বাকি ৭ জনের মধ্যে পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়ে ইন্তেকাল করেছেন লে. কর্নেল আজিজ পাশা। বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছেন কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদ, লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল এম এ রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ। তাদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি রয়েছে।

প্রসঙ্গত: বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এজাহারে ১৪ জনকে আসামী করা হয়। চার্জশিট দেয়া হয় ২০ জনকে অভিযুক্ত করে। অভিযুক্তদের মাঝে পলাতক কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা রশিদ হাইকোর্টে কোয়াশমেন্ট পিটিশনের প্রেক্ষিতে অব্যাহতি পান। অভিযোগ গঠন হয় ১৯ আসামীর বিরুদ্ধে। বিচার আদালত ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ১৯ আসামীর মধ্যে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ৪ জনকে বেকসুর খালাস দেয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লে. কর্নেল (অব.) মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদ, মেজর (অব.) বজলুল হুদা, লে. কর্নেল (অব.) শরিফুল হক ডালিম, মেজর (অব.) শরিফুল হোসেন ওরফে শরফুল হোসেন, লে. কর্নেল (অব.) এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, (অব.) লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা, ক্যাপ্টেন (অব.) মোঃ কিসমত হাশেম, ক্যাপ্টেন (অব.) নাজমুল হোসেন আনসার, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদ, (অব.) রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ওরফে মোসলেহ উদ্দিন। বেকসুর খালাসপ্রাপ্তরা হলেন তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অনারারি ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, (অব.) দফাদার মারফত আলী এবং এলডি আবুল হাশেম মৃধা।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের ডেথ রেফারেন্স শুনানি শেষে ২০০০ সালের ১২ ডিসেম্বর দ্বিধাবিভক্ত মতামত দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন বিচার আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৫ আসামীর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। খালাস দেন পাঁচজনকে। বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখেন। দ্বিধাবিভক্ত রায়ের প্রেক্ষাপটে মামলাটি রেফার করা হয় তৃতীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের কাছে। বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল রায় দেন। রায়ে তিনি ১৫ জনের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। খালাস দেন ৩ জনকে।

হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে কারাবন্দী সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা এবং মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি) লিভ টু আপিল করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসা একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ গ্রেফতার হয়ে জেল আপিল করেন। ২৫ কার্যদিবস শুনানির পর ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ও কারাবন্দী ৫ আসামীর লিভ টু আপিল মঞ্জুর হয়। তারা আপিলের সুযোগ পান। ২০০৭ সালের ১৮ অক্টোবর পাঁচ আসামী আপিলের সারসংক্ষেপ জমা দেন। ইতিপূর্বে কোনভাবে বঙ্গবন্ধু মামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না– এমন বিচারপতি সংকটের প্রেক্ষিতে আপিল শুনানি ঝুলে থাকে দেড় বছরের বেশি সময়। নতুন বিচারপতি নিয়োগ দেয়ার পর চলতিবছর ৪ অক্টোবর বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ গঠিত হয়। ৫ অক্টোবর থেকে আপিল শুনানি শুরু হয়। ২৯ কার্যদিবস শুনানির পর ১২ নভেম্বর শুনানি শেষ হয়। ওই দিনই রায়ের তারিখ নির্ধারিত হয়। আপিল শুনানিতে আসামীপক্ষের কৌঁসুলিরা ৫টি পয়েন্টের ওপর যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন।

(ক) হাইকোর্টের দুই বিচারপতি যে পৃথক ও সমান্তরাল মতামত দিয়েছেন তাতে দুই বিচারপতি পৃথকভাবে রায় স্বাক্ষর করেছেন। এটি হাইকোর্টের 'রায়' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

(খ) হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি কেবল দণ্ডিত ৬ আসামীর আপিল সম্পর্কে শুনানি গ্রহণ করেছেন। পুরো ডেথ রেফারেন্স মামলার শুনানি গ্রহণ না করে তৃতীয় বিচারপতি যে রায় দিয়েছেন তা আইনানুগভাবে ভুল।

(গ) বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। মামলা দায়ের করা হয়েছে ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর। দীর্ঘ ২১ বছর পর মামলা করায় আসামীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ বিষয়টি বিবেচনা না করে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি (মৃত্যুদণ্ড) দেয়া হয়েছে।

(ঘ) সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য বলছে এটি একটি বিদ্রোহের মামলা। সাধারণ কোন হত্যা মামলা নয়। ষড়যন্ত্রমূলক বিদ্রোহের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে অপসারিত করার মামলা।

(ঙ) সাক্ষ্য-প্রমাণ যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে দণ্ডবিধির ৩৪ ধারায় সংজ্ঞায়িত হত্যার 'একই উদ্দেশ্য'র মামলা এটি নয়। তৃতীয় বিচারপতির রায়ে সাক্ষ্য-প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

দীর্ঘ শুনানিতে আসামীপক্ষ যুক্তিতর্ক উপস্থান করে স্বীয় মক্কেলকে নির্দোষ দাবি করে তাদের মুক্তি দাবি করেন। শুনানিতে আসামী কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান ও মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি)'র পক্ষে এডভোকেট খান সাইফুর রহমান, কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানের পক্ষে এডভোকেট আব্দুর রেজ্জাক খান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা এবং একেএমত মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার)'র পক্ষে ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। এছাড়া বিশেষ কৌঁসুলি নিয়োগ দেয়া হয় এডভোকেট আনিসুল হককে। তার সঙ্গে নিয়োগ পান ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি, এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু, ড. তৌফিক নেওয়াজ, এডভোকেট এ এফ এম মেসবাহউদ্দিন, ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, এডভোকেট মোশাররফ হোসেন কাজল, এডভোকেট নূরুল ইসলাম সুজন, এডভোকেট তৌফিকা করিম, এডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদিসহ ১৭ কৌঁসুলি। ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি, এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু, ড. তৌফিক নেওয়াজ এবং এডভোকেট এ এফ এম মেসবাহউদ্দিন সরাসরি শুনানিতে অংশ নেন। সুপ্রিম কোর্ট তাদের যুক্তিতর্ক গ্রহণ করে আসামীপক্ষের আপিল খারিজ করে দেন।

জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস

সকাল পৌনে ১২টার দিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। রায়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের দেয়া ১২ আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে আপিলটি খারিজ করে দেয়া হয়। এই রায়ে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ফলে ঐতিহাসিক এই রায় ঘোষণার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকা মানুষ রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে স্বতঃস্ফূর্তভবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তারা মহান আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে শুকরিয়া আদায় করেন।

দু'টি শব্দের দ্যোতনায় আপাত অবসান প্রতীক্ষার

জাকারিয়া কাজল

'Appeal Rejected'-এ দু'টি শব্দের দ্যোতনায় আপাত অবসান হল ৩৪ বছরের প্রতীক্ষার। এই শব্দদ্বয়ের ব্যঞ্জনায় পূরণ হল, কোটি কোটি বাঙালি তো বটেই– বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের প্রত্যাশা। ভীষণ কাঙ্ক্ষিত এই দু'টি শব্দে কিছুটা মোচন হল পিতৃহন্তার কলঙ্ক কালিমা। ৪ বছরের গ্লানি মোচনে এই দু'টি শব্দ অতিপ্রয়োজনীয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা যেমন বিশ্ব ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক ঘটনা, তেমনি এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য একটি প্রজন্মের দীর্ঘ প্রায় চার দশকের প্রতীক্ষাও আইন ও মানবাধিকারের ইতিহাসে নজিরবিহীন। আত্মস্বীকৃত খুনীদের সদম্ভ, সদর্প অবাধ বিচরণে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তো দূরের কথা– '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পরবর্তী সরকারগুলো খুনীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ পৃষ্ঠপোষকতা। দেয়া হয়েছিল 'ইনডেমনিটি' নামক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। গোটা বিষয়টিই যে কোন বিবেকবান মানুষের কাছে ছিল আত্মপীড়নের বিষয়। দু'টি শব্দে যেন শুরু হল জাতির দায় মোচন।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে যে কলঙ্কের বোঝা এ জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল– পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা ক্রমে ভারি হয়েছে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামক জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা দেয়া হয়েছিল মানবাধিকার, আইনের শাসন, বিবেকবোধ। একটি নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচার যা নিহতদের স্বজনদের মৌলিক অধিকার তার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়েছে ২৬টি বছর। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা '৯৬-এ সরকার গঠনের পর উদ্যোগ নেন বিচারের। নিম্ন আদালতে ১৯৯৮-এর ৮ নভেম্বর রায় ঘোষিত হয়। এরপর ডেথ রেফারেন্স ও আপিল হয় হাইকোর্টে। ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টে একটি দ্বিধা-বিভক্ত রায় আসে। ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল তৃতীয় বিচারপতির রায়ে ১২ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখা হয়। এই রায়ের পর অভিযুক্তরা সুপ্রীম কোর্টে লিভ টু আপিল দাখিল করে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বিচার সঙ্কটে বেঞ্চই বসানো যায়নি।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবার মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুপ্রীম কোর্টে শুনানি শুরু হয়। কলঙ্ক মোচনের এই সুযোগের প্রতীক্ষায় উদ্বেলিত হয় জাতি। গতকাল ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ঘোষিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত রায় এবং এই রায় ছিল প্রত্যাশিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি। জাতির জনক। পাশাপাশি তিনি শেখ হাসিনার পিতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা '৭৫-এর ১৫ আগস্ট হারিয়েছেন পিতা, মাতা, ভাই, বোন, ভ্রাতৃবধূসহ বহু স্বজন। বিদেশে অবস্থানের কারণে বেঁচে গেছেন এই দুই বোন। বাংলার মানুষ তাদের সবটুকু ভালবাসা আর মমতা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে শেখ হাসিনাকে। এর প্রমাণ বিগত নির্বাচন। কিন্তু এই দুই বোনের এমনই দুর্ভাগ্য– পিতৃ হত্যার বিচারের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ ৩৪ বছর। রায় ঘোষণার আগের দিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ন্যায়বিচার চেয়েছেন। এটা কেবল শেখ হাসিনার চাওয়া নয়– এটা কোটি কোটি বাঙালিসহ সারাবিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের চাওয়া। রায় ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোকরানা নামাজ আদায় করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আরেক কন্যা শেখ রেহানা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে। এ প্রতিক্রিয়ার অনুরণন কোটি কোটি বাঙালিসহ বিশ্বের বিবেকবান সকল মানুষের। আজকের তরুণ সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস '৭৫-এর এই দিনে তার পিতা-মাতা সন্তানের জন্মদিন পালন করতে পারেননি। ব্যারিস্টার তাপস, যিনি এই মামলায় আইনজীবী, তিনি এই রায়কে জন্মদিনের সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হিসেবে অভিহিত করেছেন। আসলেই তাই। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের সদর্প, সদম্ভ উচ্চারণ, বিভিন্নভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা, পুনর্বাসনে দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এই রায়ের মাধ্যমে সেই প্রশ্নের জবাব মিলেছে– রায় কার্যকর হলে ইতিবাচক পরিসমাপ্তি ঘটবে এই প্রশ্নের।

রাজনৈতিক দলগুলো এই রায়ের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দলীয়ভাবে কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি, তবে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, এই রায় সকলকে মেনে নিতে হবে। তিনি এ রায়কে জাতির জন্য স্বস্তির বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন আইনের শাসনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। এই রায় কার্যকরে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানান সাবেক এই আইনমন্ত্রী। সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ এই রায়ে স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলেছেন। এখন সবার চাওয়া দ্রুত কার্যকর হোক এই রায়। এই ঐতিহাসিক রায় আমাদের গ্লানি মুক্তি ও কলঙ্ক মোচনের যে সুবর্ণ দ্বারের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে– যত দ্রুত আমরা এই দ্বার অতিক্রম করে রায় কার্যকর করতে পারব– জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে কিছুটা সম্মান পুনরুদ্ধার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা ততই অবদান রাখবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে ঘাতকচক্র ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ভেবেছিল– এই দেশের মাটি ও মানুষের মন থেকে মুছে দেবে বঙ্গবন্ধুর নাম। কিন্তু বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক। ঘাতকরা জানত না 'মুজিব মরে না, মরেনি মুজিব কোন বুলেটের ঘায়/ বুলেটে নিথর দেহই কেবল, অমর সে আত্মায়/মুজিব, মুজিব, জনকের নাম, এত সহজেই মোছা যায়!'

বিদেশে পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনীরা কে কোথায়?

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে ৫ জন কারাবন্দী রয়েছেন। বিভিন্ন দেশে ফেরার জীবন-যাপন করছেন আরও ৯ জন। একজন ইন্তেকাল করেছেন। ১৯৭৫ সালের পর হত্যাকারীরা সদম্ভে দেশে ঘুরে বেড়ালেও ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ার পর তারা গা ঢাকা দেন। বাংলাদেশে থাকায় গ্রেফতার হন কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লে. কর্নেল (অব.) মুহিউদ্দিন আহমেদকে (আর্টিলারি) গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। ইন্টারপোলের মাধ্যমে থাইল্যান্ড থেকে ফিরিয়ে আনা হয় মেজর (অব.) বজলুল হুদাকে। অবৈধভাবে বসবাস করায় ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ফেরত পাঠায় একেএম মহিউদ্দিন আহমেদকে (ল্যান্সার)। পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে ইন্তেকাল করেন মেজর (অব.) আজিজ পাশা। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে এখন পলাতক রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) এসএইচ নূর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব.) শরীফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদ, মেজর (অব.) আহমেদ শরীফুল হোসেন, ক্যাপ্টেন (অব.) কিসমত হাশেম, ক্যাপ্টেন (অব.) রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদ, এম এ রাশেদ চৌধুরী (অব.) এবং ক্যাপ্টেন (অব.) নাজমুল হোসেন আনসার।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা পলাতক থাকলেও তাদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছেও সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। তবে গত ১৩ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ইন্টারপোল অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৮৭টি দেশের প্রতিনিধির কাছে আসামীদের একটি তালিকা দেন। তাতে দেখা যায়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) এসএইচ নূর চৌধুরী আমেরিকা, কানাডা কিংবা লিবিয়ায় অবস্থান করছেন। লে. কর্নেল (অব.) শরীফুল হক ডালিম অবস্থান করছেন আমেরিকা, লিবিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন কিংবা হংকং। লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদ অবস্থান করছেন কানাডা, আমেরিকা, লিবিয়া কিংবা পাকিস্তানে। মেজর (অব.) আহমেদ শরীফুল হোসেনের সম্ভাব্য অবস্থান স্থল কানাডা, লিবিয়া, কিংবা আমেরিকা। ক্যাপ্টেন (অব.)

কিসমত হাশেমের অবস্থান কানাডা, লিবিয়া, আমেরিকা কিংবা জার্মান। ক্যাপ্টেন (অব.) রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের সম্ভাব্য অবস্থান ভারত, পাকিস্তান কিংবা লিবিয়ায়। ক্যাপ্টেন (অব.) নাজমুল হোসেন আনসার অবস্থান করছেন কানাডা, আমেরিকা কিংবা লিবিয়ায়। ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদের সম্ভাব্য অবস্থান পাকিস্তান, কানাডা, আমেরিকা অথবা লিবিয়ায়। লে. কর্নেল (অব.) এম এ. রাশেদ চৌধুরীর সম্ভাব্য অবস্থান আমেরিকা, কানাডা কিংবা লিবিয়ায়। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার শুরু হওয়ার পর থেকে এসব আসামী ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করছেন বলেও জানা যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃতরা আপিল করলেও পলাতকরা মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল করেননি। সরকার পক্ষের বিশেষ কৌঁসুলি আনিসুল হক জানান, পলাতক আসামীরা যখনই বাংলাদেশ সরকারের কাস্টডিতে আসবেন তখনই তাদের দণ্ড কার্যকর হবে। তবে এ ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়াও অনুসৃত হতে হবে। পরে ১৯৮০ সালে তাদের সবাইকে পররাষ্ট্র সার্ভিস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়–তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নীতিই অনুসরণ করে– লে. জে. এরশাদ এবং খালেদা জিয়া সরকার।

আজ উল্লাসের নয়, কলঙ্কমুক্তির দিন
বিনম্রচিত্তে নতমাথা প্রার্থনার দিন

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) লন্ডন সময় খুব সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের ঝঙ্কারে। ঢাকার টেলিফোন। সাংবাদিক বন্ধুর উত্তেজিত ও উল্লসিত কণ্ঠ। জানালেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে। হাইকোর্ট বেঞ্চের আগের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রয়েছে। ১২ জন বর্বর ঘাতকের জন্য ছিল এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ। তাদের মধ্যে সাতজন পলাতক। পলাতকদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি পাঁচজন ১৩ বছর যাবৎ জেলে। মৃত্যুদণ্ডাদেশের পর সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে এবং সাবেক বিএনপি-জামায়াত সরকারের মদদে আপিল শুনানি বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করে তারা আরও কয়েক বছর আদালতের দণ্ড এড়াতে পেরেছে। এখন সেই দণ্ড কারাবন্দি পাঁচজনের মাথায় সমুদ্যত।

পলাতক ছয়জনের জন্যও এই মৃত্যুদণ্ড। তারা পালিয়ে বাঁচবে তার সম্ভাবনা কম। এই দণ্ডাদেশ নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তাদের তাড়া করে ফিরবে। মনুষ্যসমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার বঞ্চিত এই ভীত-শঙ্কিত পলাতকদের অভিশপ্ত জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আদালতের দণ্ড যদি এরা এড়াতেও পারে, তাহলেও মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কারের দণ্ড এরা এড়াতে পারবে না। সেই ধিক্কারের আগুনে পুড়ে পুড়েই এদের অভিশপ্ত জীবন একদিন শেষ হবে।

মহাত্ম্যা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার পর বার্নার্ড শ' বলেছিলেন, 'আমি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী কিন্তু সর্বতোভাবে এই বর্বর ঘাতকের জন্য মৃত্যুদণ্ড কামনা করেছি। কারণ গডসে শুধু একজন মানুষকেই হত্যা করেনি, সে মানবতার বুকে গুলি চালিয়েছে। অতি ভালো হওয়া যে কত বিপজ্জনক, মহাত্মা নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।'

গান্ধী হত্যাকারীদের মতো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সম্পর্কেও বলা যায় এরা সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু। এরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ণিত 'নারীঘাতী শিশুঘাতী বর্বর'। এরা মনুষ্যত্ব ও মানবসমাজের কলঙ্ক। এরা শুধু বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনককে তার পরিবারের শিশু-নারীসহ হত্যা করেনি, হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছে ৩০ লাখ শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতার মর্মমূলে। তার ছিন্নমূল রক্তাক্ত আদর্শগুলোকে তুলে দিয়েছে দেশদ্রোহী ক্ষমতালোভীদের হাতে। কবি সুকান্তর ভাষায়—

'দেশদ্রোহী ঘাতকের হাতে
দেশপ্রেমে দৃপ্ত প্রাণ
রক্ত ঢালে সূর্যের সাক্ষাতে।'

সেই রক্ত ঢালার অবিরাম প্রবাহ থেকে ৩৪ বছরেও মুক্ত হয়নি বাংলার রাজনীতি।

এই নরপিশাচরা তো শুধু ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দশ বছরের শিশু এবং সদ্য বিবাহিত দুই নিরপরাধ তরুণী বধূর বুকে গুলি চালিয়ে, বন্য হায়েনার মতো জাতির জনকের ভাগ্নের বাড়িতে হানা দিয়ে তার গর্ভবতী স্ত্রীকে হত্যা করে, জাতির জনকের আরেক আত্মীয় সেরনিয়াবাতের বাড়িতে ঢুকে শিশু-নারীসহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে খুন করে খান্ত থাকেনি; এই বর্বরতার তিন মাস না যেতেই তারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকে নিরস্ত্র এবং বন্দি চার জাতীয় নেতাকে, মুক্তিযুদ্ধের চার মহান সেনাপতিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার ব্যবস্থা নিয়েছে।

স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে এরা যেভাবে হত্যা করেছে, সেই নৃশংসতার কোনো দ্বিতীয় নজির সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসে আছে কি-না সন্দেহ। ঘাতকদের গুলিতে দারুণভাবে আহত তাজউদ্দীন আহমদ মুমূর্ষু অবস্থায় কাতরকণ্ঠে বলেছিলেন, 'একটু পানি দাও, আমাকে একটু পানি দাও'; ঘাতকরা পানি দেওয়ার বদলে তার রক্তাক্ত দেহে বেয়নেট চার্জ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের মহান এক সেনাপতিকে এভাবে নিরস্ত্র বন্দি অবস্থায় বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে।

মনুষ্য নামের অযোগ্য, মানবতার শত্রু, স্বাধীনতার স্থপতি ও তার আদর্শকে হত্যাকারী এই নরপিশাচরা কি জাতির কাছে কোনো ধরনের ক্ষমা পাওয়ার, সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য? এদের অপরাধের বেনিফিশিয়ারি, এদের হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির সমর্থক ও অনুসারী এবং স্বাধীনতাবিরোধী দেশদ্রোহী চক্র ছাড়া বাংলার মাটির একটি ধূলিকণাও বলবে না এরা এদেশের মানুষের ক্ষমা ও সহানুভূতি পাওয়ার কোনো দাবি রাখে।

১৯ নভেম্বর ঘোষিত রায়ে শুধু বাংলাদেশের নয়, সারাবিশ্বের ন্যায়বিচারের সমর্থক, সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের মনে দুঃখের উদ্রেক হবে না। ফাঁসির কাষ্ঠে এদের ঝোলানোর দিনটিতেও কারও চোখে এক ফোঁটা শোকাশ্রু দেখা দেবে না। বরং ৩৪ বছর আগে বাংলার 'কারবালা-কাণ্ডের' সময় যারা দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তাদের চোখে শিশু রাসেল ও আরিফের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ, হাতে সদ্য লাগানো মেহেদির রঙ মোছেনি—নববধূ সুলতানা ও রোজির মৃত মুখ ভেসে উঠবে। ৩৪ বছর ধরে জাতির বুকে জমে থাকা শোক ও ক্রোধ আজ শান্ত হবে। বাংলার মানুষ ৩৪ বছরে কলঙ্ক থেকে আজ মুক্তির স্বাদ পেল বলে ভাববে। কৃতজ্ঞতা জানাবে এই ঐতিহাসিক বিচারের বিচারকদের এবং ন্যায়দণ্ডের বিশ্ববিধানকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে লাখ লাখ ইহুদি নরনারী ও শিশু হত্যাকারী নাৎসি ফ্যাসিস্টদের ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের সময় তাদের মৃত্যুদণ্ডে সই প্রদানকারী একজন বিচারক বলেছিলেন, 'গুরুতর অপরাধের জন্য বিচারে কোনো দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দানের রায়ে সই দেওয়ার সময় আমার মনে কিছুটা হলেও বেদনা দেখা দিয়েছে, আমি হতভাগ্য ব্যক্তিটির জন্য মনে করুণাবোধ করেছি। কিন্তু গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে লাখ লাখ মানুষ হত্যাকারী এই পশু নামেরও অযোগ্য বর্বর ঘাতকদের মৃত্যুদণ্ড দানের রায়ে সই দিতে আমি আজ কিছুমাত্র বেদনাবোধ করছি না। বরং এক ধরনের উল্লাসবোধ করছি যে, মানবতা ও মানব সভ্যতাকে এক দারুণ কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার কাজে আমিও অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের এই বিচারকের বিবেকবোধ ও মনের কথা বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় যে মাননীয় বিচারকরা সাহস ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তাদেরও মনের কথা বলে আমি বিশ্বাস করি। আবারও তাদের অভিনন্দন জানাই।

আজ উল্লাসের দিন নয়, উৎসবের দিন নয়। আজ বাংলার ১৪ কোটি মানুষের কলঙ্কমুক্তির সূচনার দিন। এদিন বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞ মনে বিশ্ববিধানের ন্যায়দণ্ডের সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনার দিন। এই প্রার্থনার ভাষা হবে—আমরা প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ চাইনি। আমরা চেয়েছি জাতির জনকের রক্তদান যেন বৃথা না যায়। তোমার ন্যায়দণ্ডের পতাকা যেন দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালির মনে উড্ডীন থাকে। ৩৪ বছর ধরে জাতিকে যে কলঙ্কের বোঝা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছে তা থেকে জাতি মুক্তি পাক। দানবতন্ত্র ধ্বংস হোক, বাংলাদেশে মানবতন্ত্র সুরক্ষা পাক। একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ এবার বাধামুক্ত হোক। বাংলার মাটিতে বর্বরতা ও দুঃশাসন যেন আর মাথা তুলতে না পারে।

লন্ডন, ১৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবা

নফল নামাজ পড়ে শুকরিয়া আদায় করলেন হাসিনা

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির রায় শুনে আবেগাপ্লুত হলেন, কাঁদলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রায়ের পরপরই পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও নফল নামাজ পড়ে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, লন্ডনে অবস্থানরত ছোট বোন শেখ রেহানার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বিদেশে অবস্থানরত ছেলে সজীব ওয়াজেদ ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র জীবিত বোন খাদিজা হোসেন বলেছেন, রায় ঘোষণার পর শেখ হাসিনা তাঁকে (ফুফু) ফোন করে কান্নাকাটি করেন।

ইতালি ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর শেষে শেখ হাসিনা গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা ১০ মিনিটে দেশে ফেরেন। বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সকাল পৌনে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন যমুনায় পৌঁছান।

এরপর একে একে যমুনায় যান সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান, খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি, চিফ হুইপ আবদুস শহীদসহ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা। এই নেতাদের সঙ্গে বসে শেখ হাসিনা টিভিতে আদালতের রায় শোনেন। শেখ হাসিনা রায়ের আগে পরে কোরআন তিলাওয়াত ও নফল নামাজ আদায় করেন।

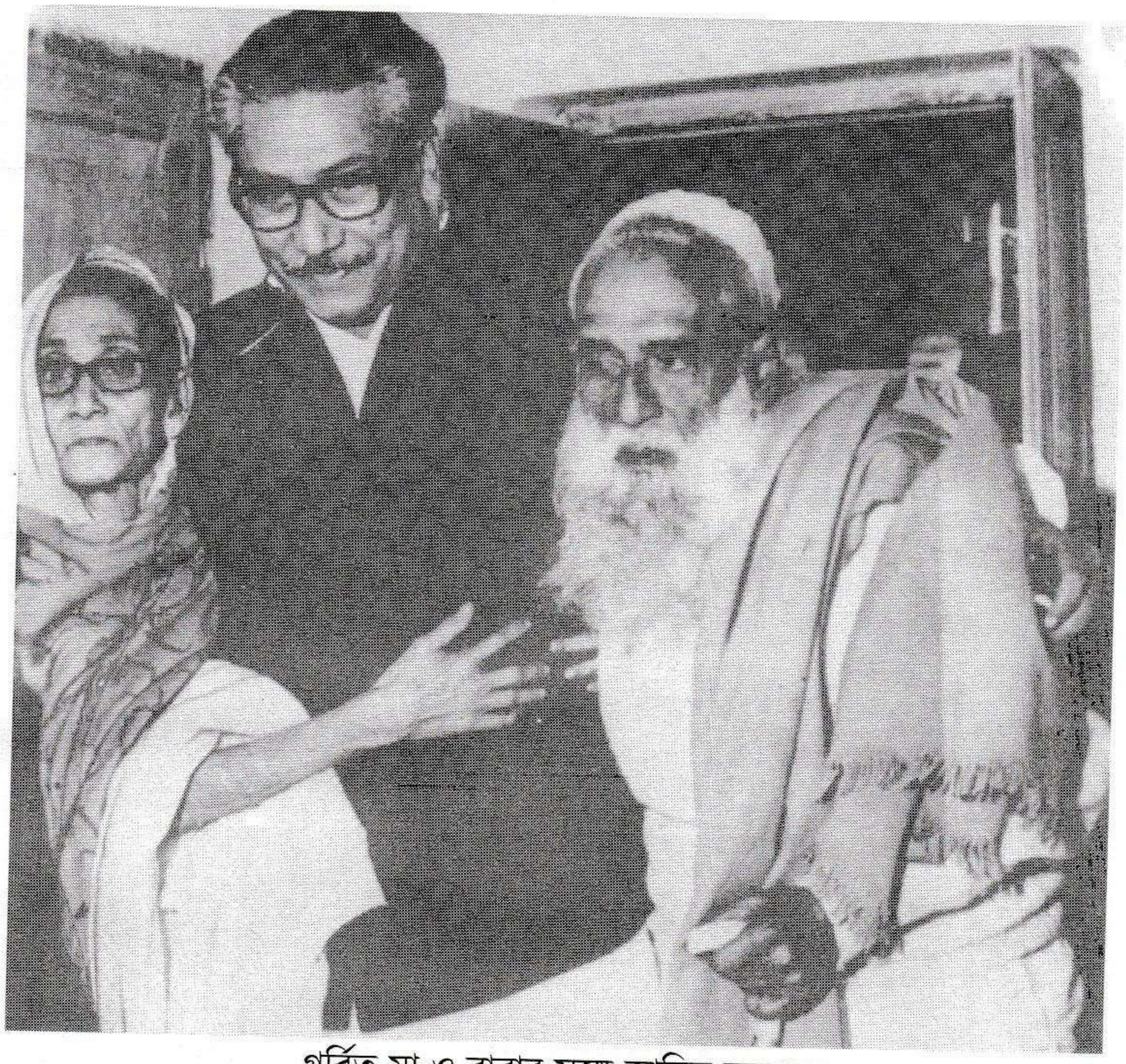
রায় শুনে প্রধানমন্ত্রী ন্যায়বিচার পেয়েছেন বলে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি সব হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি নেতাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন।

একপর্যায়ে সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপস যমুনায় আসেন এবং শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীও কান্নায় ভেঙে পড়েন।

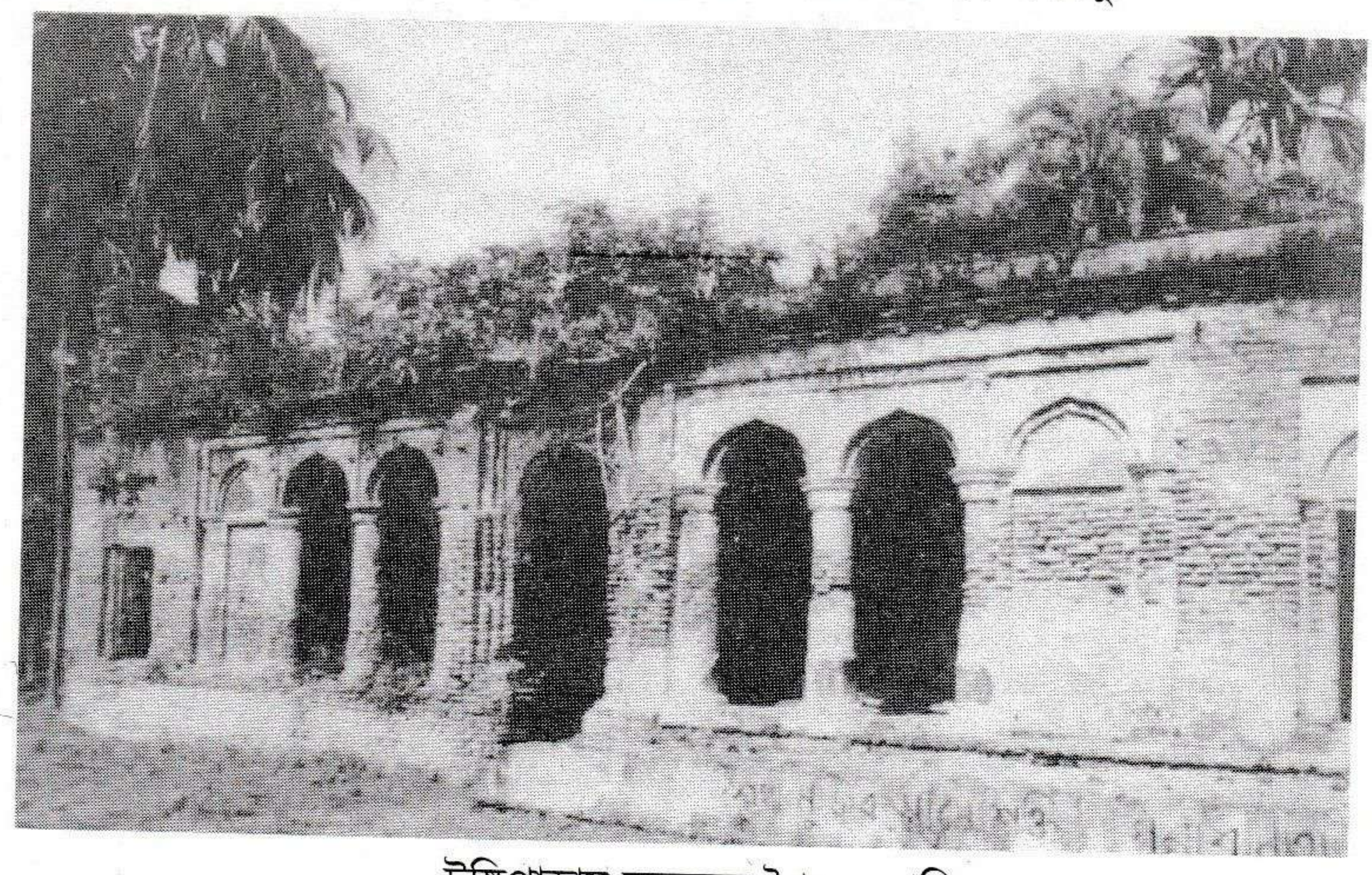
দীর্ঘ ৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত রায় হওয়ায় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বিকেলে যমুনায় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদে স্পিকার আবদুল হামিদসহ কয়েকজন মন্ত্রী, দলীয় নেতা, সাংসদ এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।

ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে
শেখ রেহানা

ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে– বঙ্গবন্ধু মামলার আপিলের রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এ কথাই বলেছেন বঙ্গবন্ধুর ছোট কন্যা শেখ রেহানা। লন্ডন থেকে মিডিয়ার কাছে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বিদেশে অবস্থানরত শেখ রেহানা টেলিফোনে সংবাদ সংস্থা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, এই মামলার রায় উচ্চ আদালতেও যে পুনঃস্বীকৃত হয়েছে এটাই বড় কথা। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পর হলেও যে বিচারকার্য শেষ হয়েছে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে...। তিনি আরো বলেন, অন্যায় ও অপরাধ করলে তার যে বিচার শাস্তি আছে এবং হতে পারে, এটাই চিরন্তন সত্য। এখানে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে। রেহানা বলেন, সেদিন শাহাদাতবরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করি। সেই নৃশংস ঘটনাবহুল হত্যার কালিমা মোচন হোক। এমন রক্তাক্ত স্মৃতির যন্ত্রণা ও শোক কাউকে যেন আর বইতে না হয়, এই প্রত্যাশা করি। দেশে শান্তি বজায় থাকুক। আমি সবার মঙ্গল কামনা করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বড় বোন শেখ হাসিনার সাথে বিদেশে থাকায় এ হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যান শেখ রেহানা।



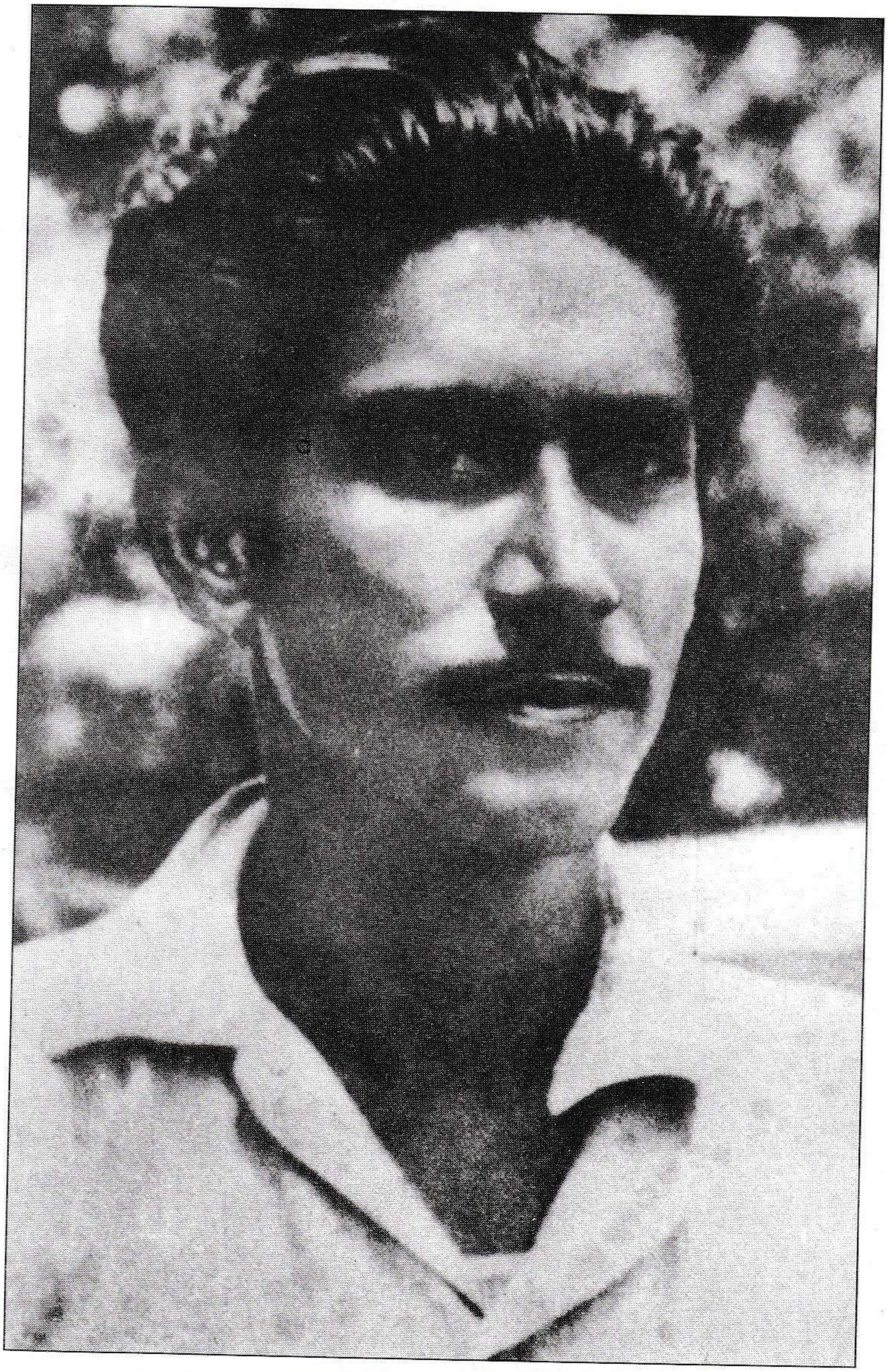
গর্বিত মা ও বাবার সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু



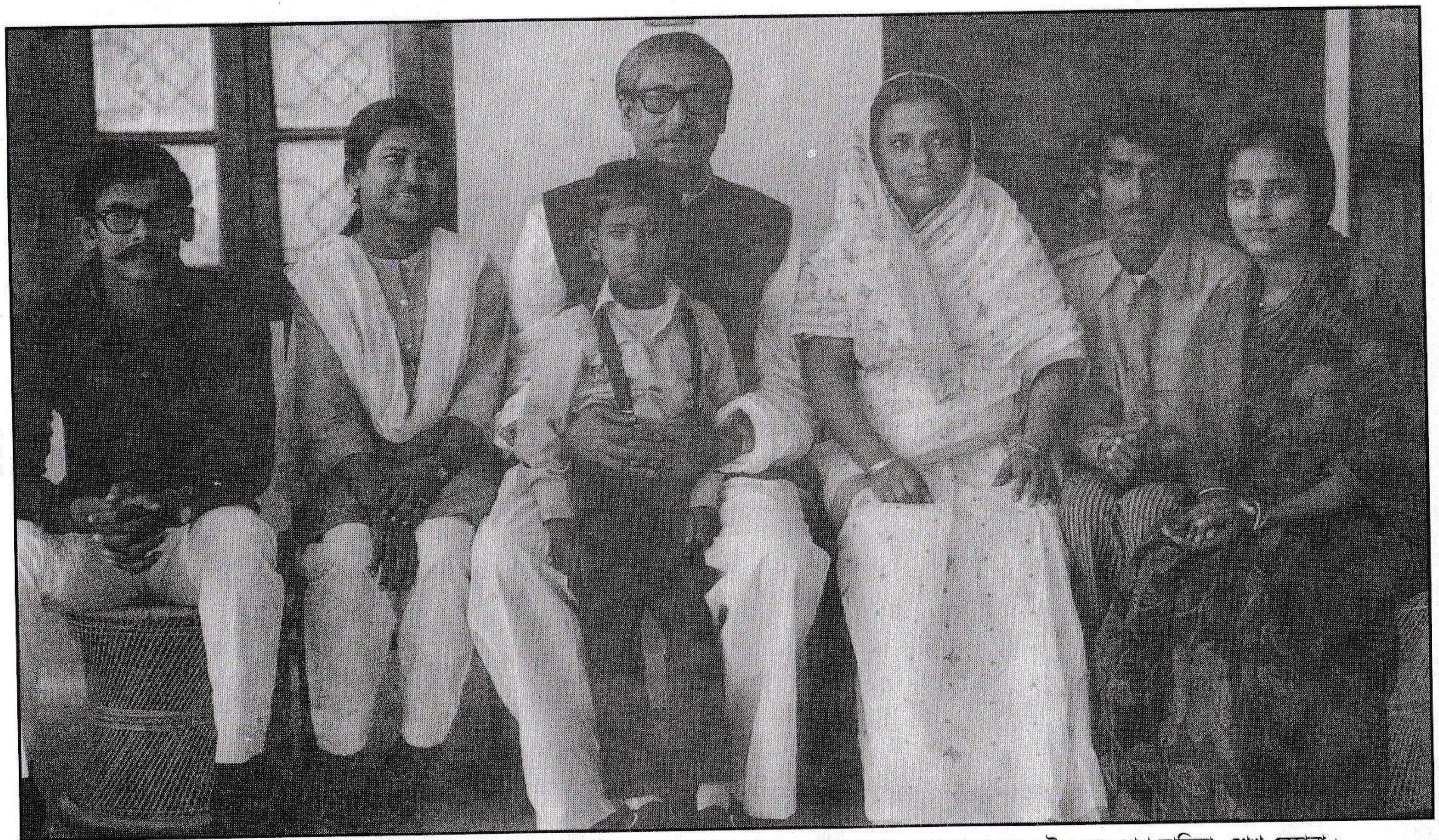
টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়ি



ফুটবলের ট্রফি হাতে কিশোর মুজিব



যুবক বয়সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা, তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল ও দুই মেয়ে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা।



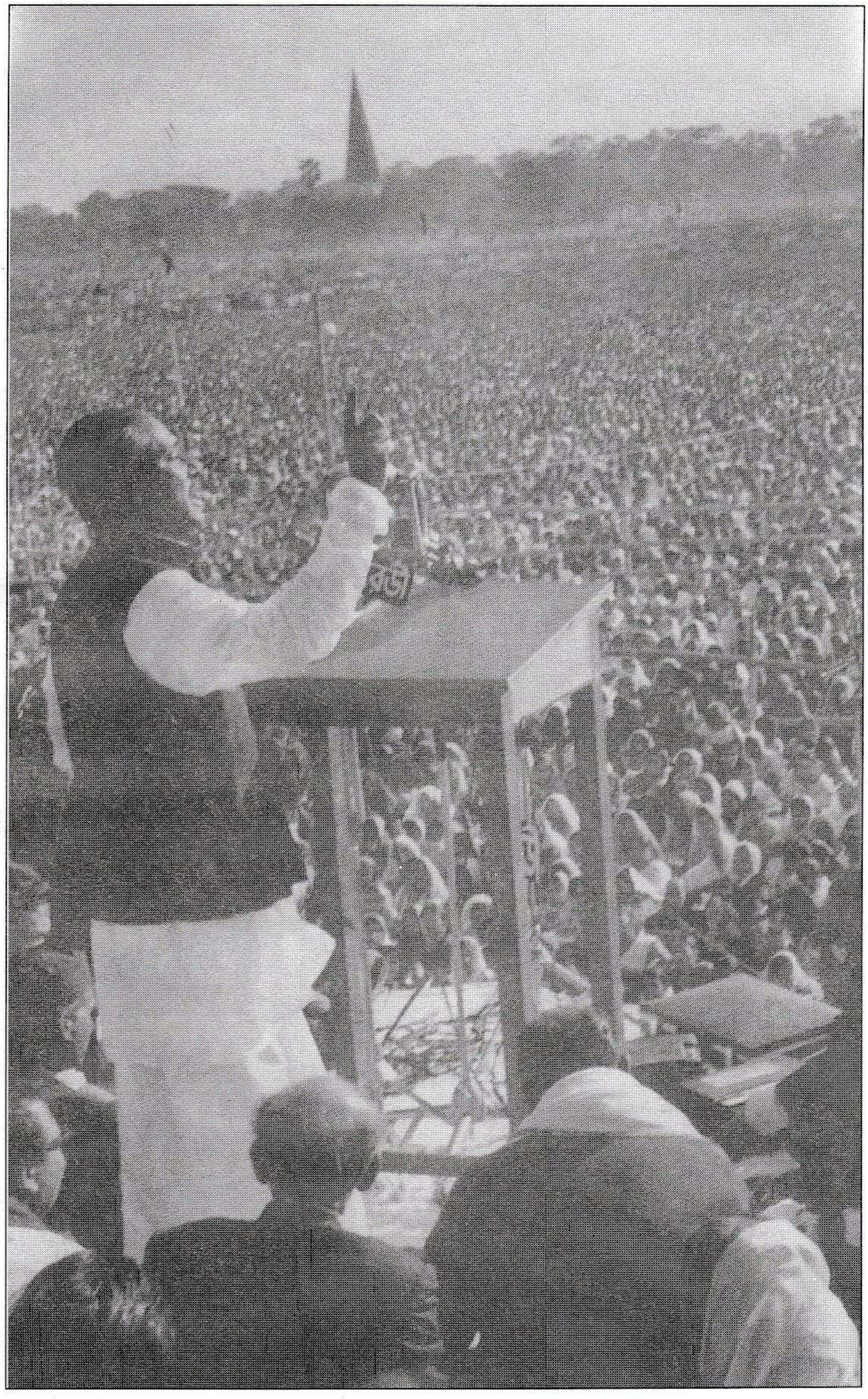
মমতাময়ী মায়ের ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু



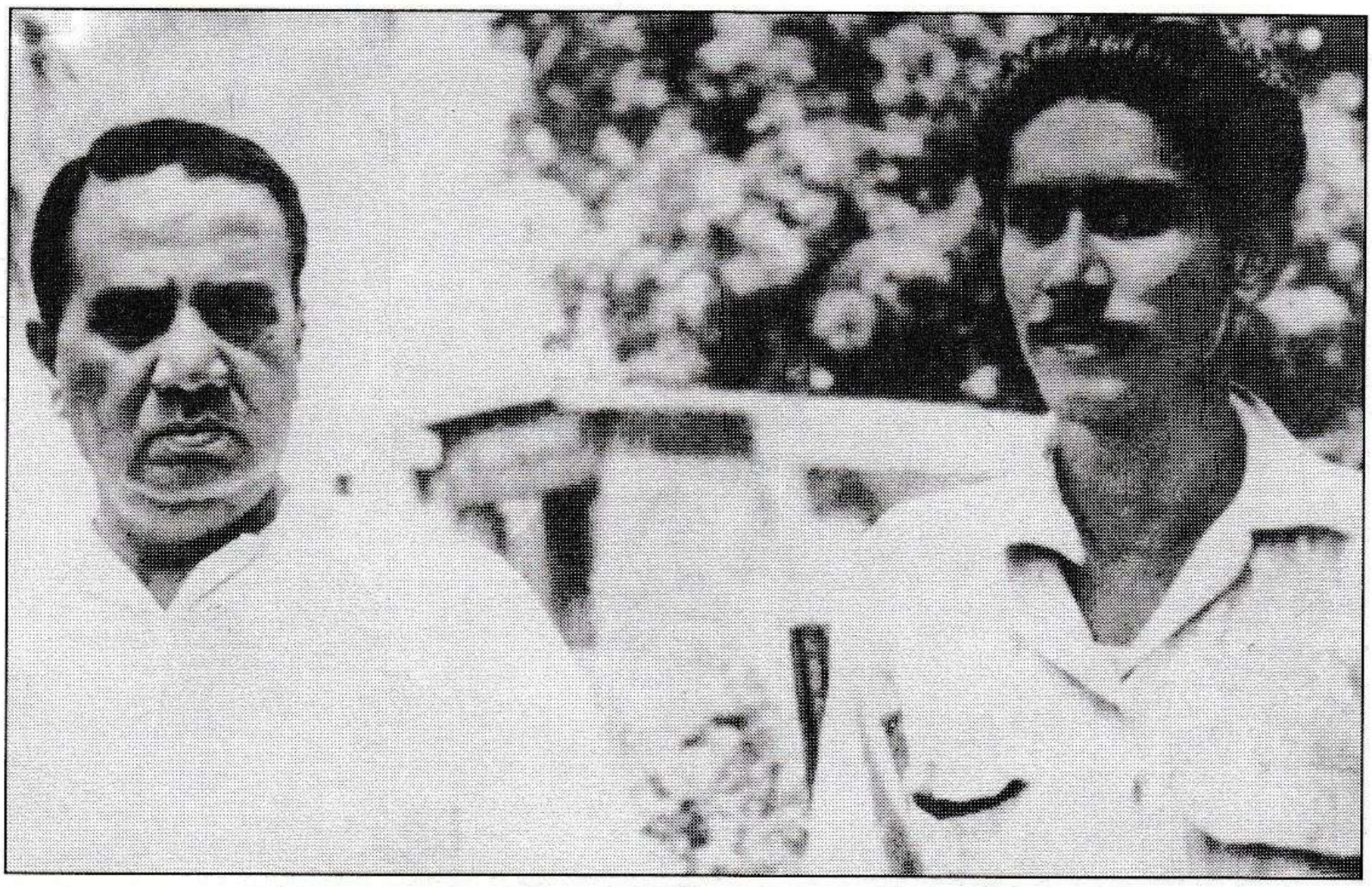
বাবার একান্ত সান্নিধ্যে বঙ্গবন্ধু



"আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থবাদীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছে।"



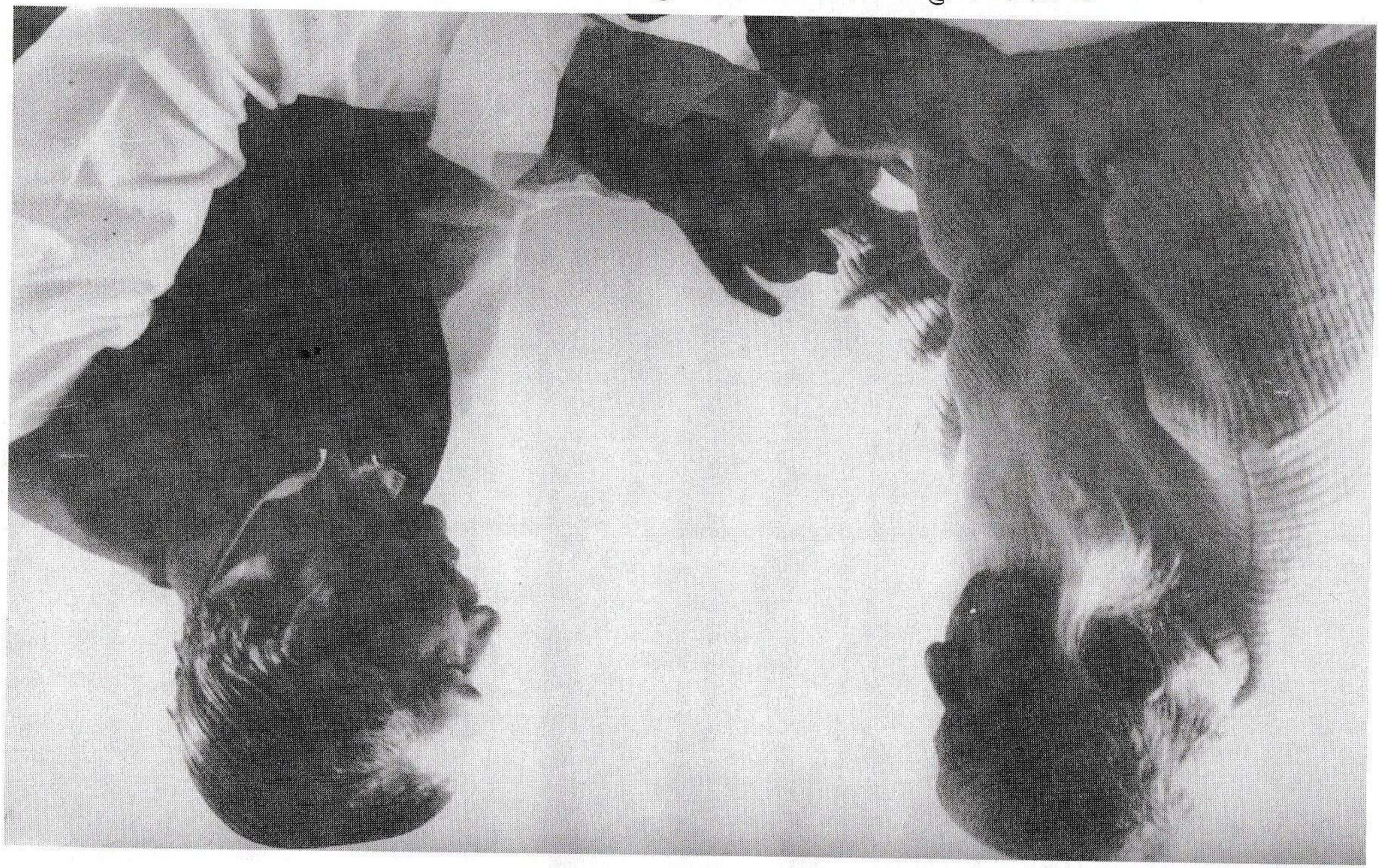
রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু



গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু



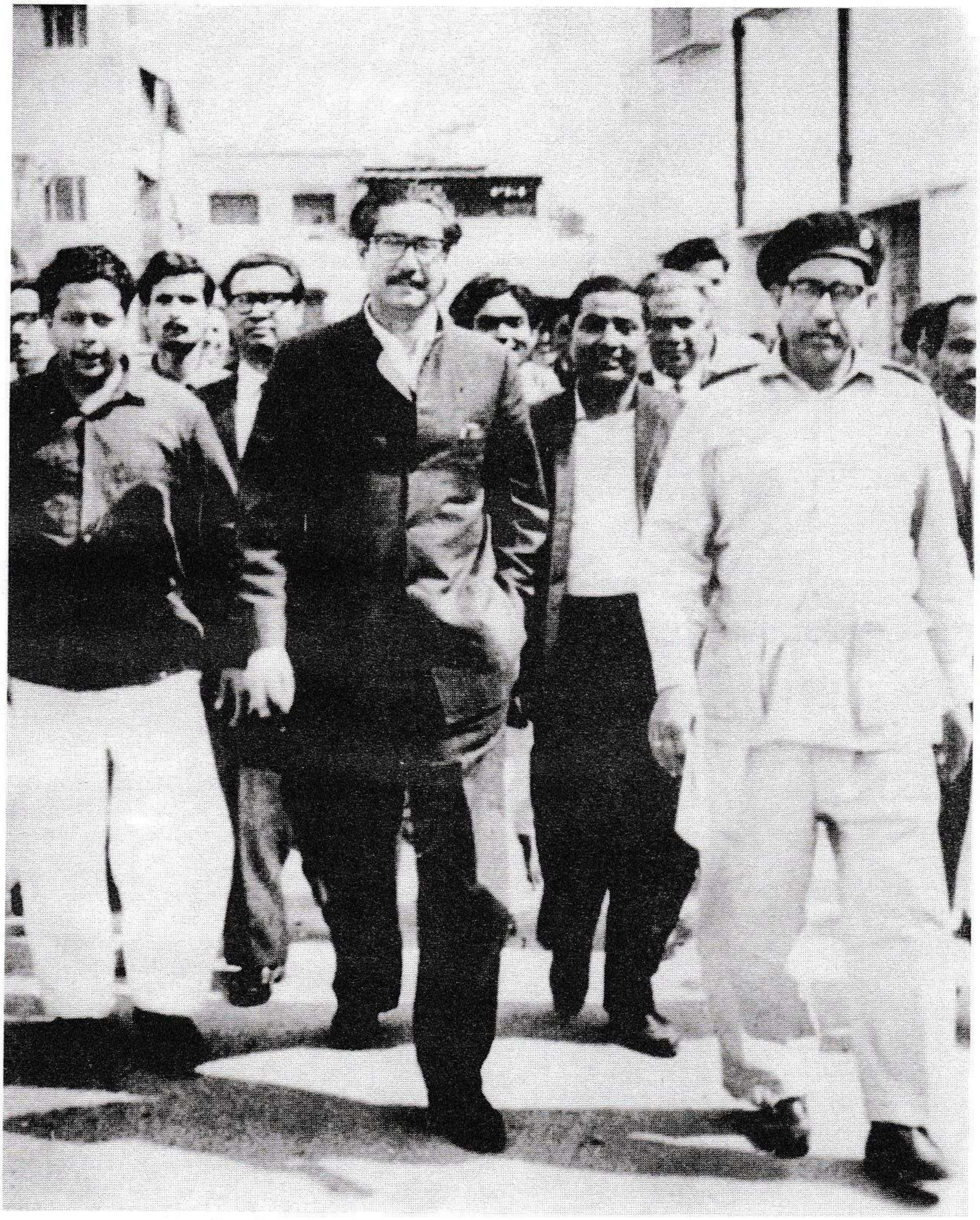
মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক



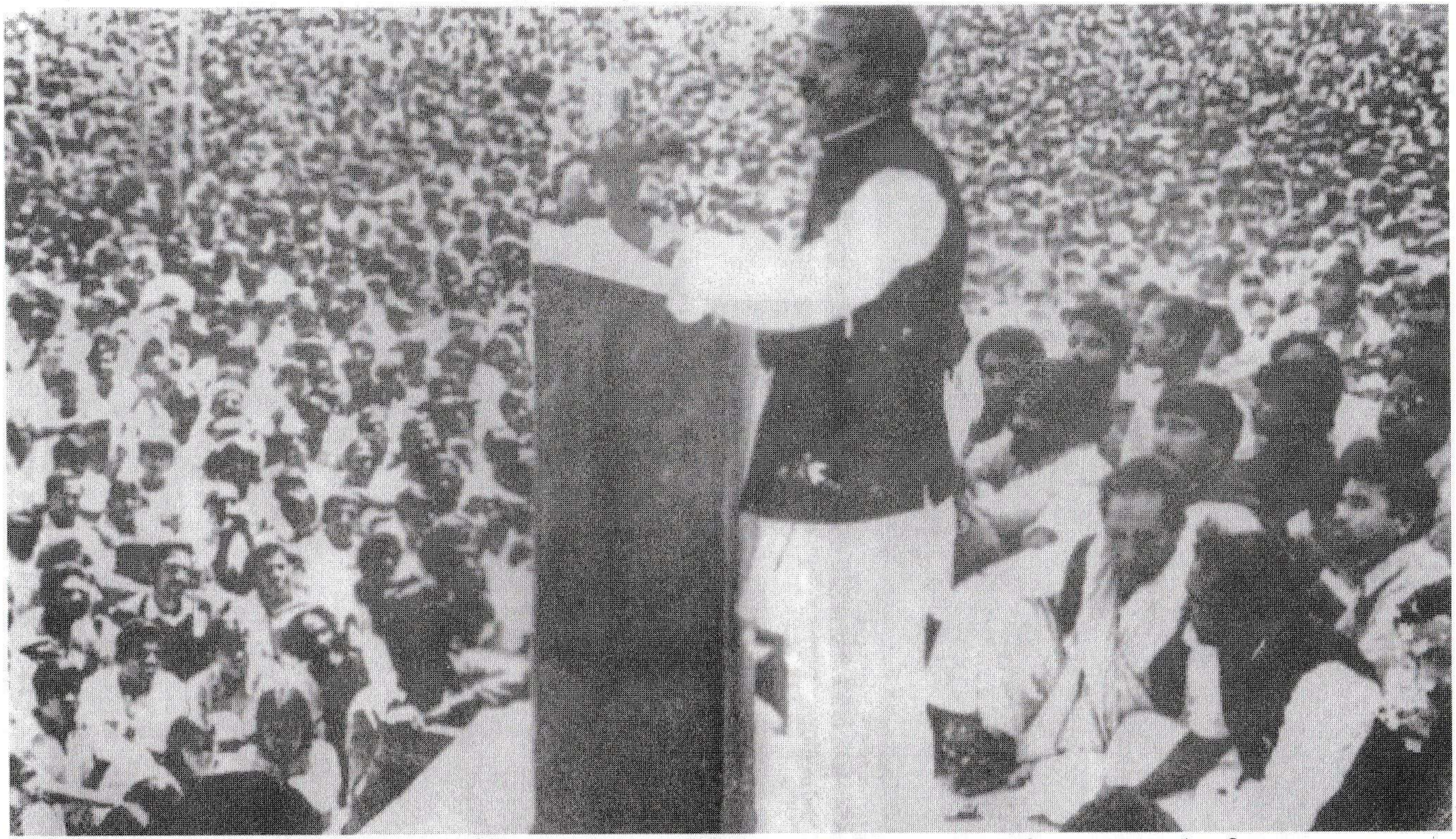
মওলানা ভাসানীর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মওলানা ভাসানী



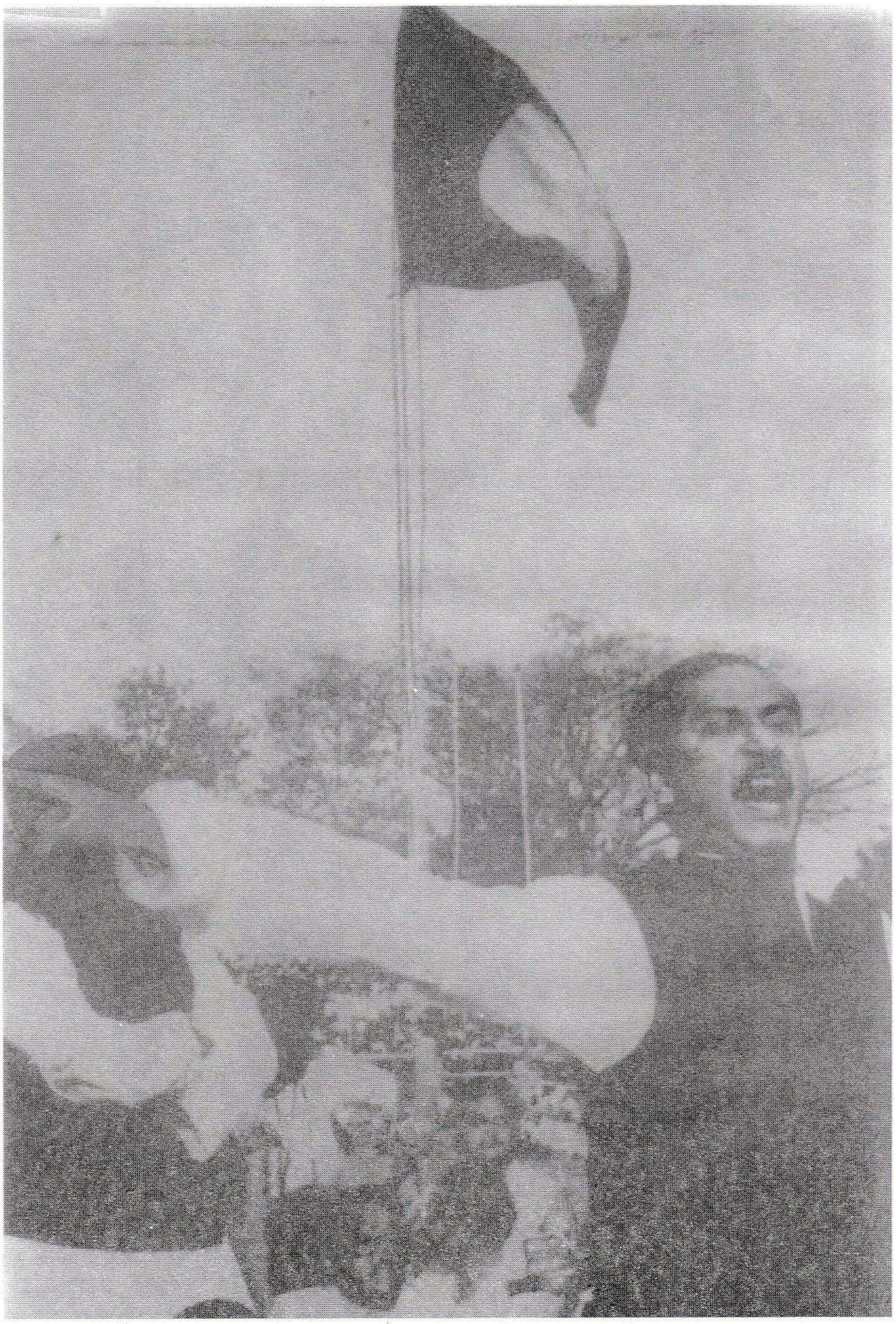
১৯৬৯ সালে জেলখানা থেকে আগরতলা মামলার ট্রাইবুনালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে



২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে বাঙালি জাতির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উপাধি দেয়া হয়– 'বঙ্গবন্ধু'



জাপান সফরকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান



"সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।" বঙ্গবন্ধুর দীপ্তকণ্ঠের উচ্চারণ



১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখেন
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



২৬ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী
শান্তির কপোত উড়ানোর এক পর্যায়ে কৌতুক করে শেখ রাসেলকে বলছেন,
'তুমি উড়াবে, নাও।' পাশে প্রধানমন্ত্রী মেখ মুজিবুর রহমান

সত্যে ও ইতিহাসে ফেরার দিন

আবুল মোমেন

আজ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় দেবেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। জাতির বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। আশা করি, গোটা জাতি ন্যায়বিচার পাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের ইতিহাসের মহানায়ক। আর আদালতের রায়ের পাশাপাশি তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসও রায় দিয়ে চলেছে। বস্তুত অপরাধীর শাস্তির জন্য আদালতের রায় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষের মূল্যায়নের জন্য এ রায়ের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। ইতিহাস বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তার আবেগমুক্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে চলেছে।

বঙ্গবন্ধুর বিচারে ইতিহাস কেমন রায় দিয়েছে তা বুঝতে হলে দেশের মুক্তচিন্তার গবেষক, সৃজনশীল ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কাজ ও প্রতিক্রিয়ার সন্ধান নিতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবনকালে, যখন তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ও বিচারে মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন আর এদিকে চলছে মুক্তিযুদ্ধ, তখন সকল যোদ্ধা, সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবিসংবাদী নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সবার হৃদয়ে তাঁর ছবি, সবার কণ্ঠে তাঁর নামে জয়ধ্বনি, তিনিই ছিলেন সবার প্রেরণা। সেদিন তাঁর নামে কেবল যোদ্ধারা স্লোগান দেয়নি, অসংখ্য কালোত্তীর্ণ গান, কবিতা ও ছড়া রচিত হয়েছে। সেই সময়ের একটি গান আমরা স্মরণ করতে পারি– 'শোন, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ওঠে জাগি।' এ রকম কত গান গাওয়া হতো সেদিন একবার মনে করুন।

পঁচাত্তরে যখন ষড়যন্ত্রকারীদের নৃশংস আক্রমণে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন, তখন বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালি বিবেকের প্রতিমূর্তি ওপার বাংলার লেখক অন্নদাশংকর রায় লিখলেন মন্ত্রের মতো এক চতুষ্পদী :

'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা যমুনা
গৌরী বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।'

গত চৌত্রিশ বছরে বাংলার কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁকে নিয়ে গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন, ছড়া তৈরি করেছেন। এ সূত্রে নির্মলেন্দু গুণের অবিস্মরণীয় কবিতাটি মনে করুন :

'তখন পলকে দারুণ ঝলকে
তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা
কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী
কবি শোনালেন তার অমর কবিতাখানি।'

একাত্তর থেকে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশকে বিদেশের মানুষ চিনেছে বঙ্গবন্ধুর নামে। এ দেশের ইতিহাসে তিনিই কিংবদন্তির মহানায়ক, যাঁকে যুগে যুগে এ জাতি স্মরণ করে চলেছে, তাঁকে ঘিরে তাদের আবেগ উদ্বেলিত হয়, তাদের সৃজনশীলতা বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হয়। আর গবেষকদের কাজে বারবারই এসেছে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা।

মৃত্যুর এত বছর পরেও তাঁর আবেদন এখনো সমান জোরালো, কখনো এ দেশে এমন কোনো নেতা আসেনি যার কাছে তাঁর এই গুরুত্ব ও প্রভাব ফিকে হতে পারে। বরং দিনে দিনে তাঁর প্রতি জাতির ঋণ কতটা, জাতীয় ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা কত বড়, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ভূমিকা বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি প্রায় একটি লক্ষ্যেই নিজের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর এই একাগ্র সাধনা শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছে, ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু আপস করেননি, নির্যাতনে নিরস্ত হননি, জেল-ফাঁসিকে ভয় পাননি। আর এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু, হয়ে ওঠেন একটি জাতির স্থপতি।

বঙ্গবন্ধু রাজনীতিবিদ ছিলেন। তবে রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্য দিয়ে তিনি জীবৎকালে কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়েছিলেন, পেয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ও 'জাতির জনক' আখ্যা।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে জাতীয় ঐক্যের তেমন নজির নেই। নবম-দশম শতাব্দীর বিখ্যাত পাল যুগেও বাংলাভূমিতে একাধিক রাজা ও সামন্তপ্রভুর অস্তিত্ব ছিল। স্বাধীন সুলতানি আমল বা সুবেদার-নবাবদের কার্যত স্বাধীন আমলেও বাংলাভূমিতে জাতীয় ঐক্যের নজির নেই। তা ছাড়া এ সময়ে তো রাজার সঙ্গে প্রজার তেমন সম্পর্কই ছিল না। আর ইংরেজ আমলে আমরা সর্বার্থে পরাধীন হয়ে পড়ি। '৪৭-এর দেশবিভাগের পর পাকিস্তান আমলে আমরা নতুনতর পরাধীনতার শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়ি। পাকিস্তান সরকার

আমাদের পূর্ব বাংলার নাম থেকে 'বাংলা' শব্দটি কেড়ে নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চায়নি, যখন আন্দোলন-সংস্কারের নামে বাংলার বিরুদ্ধতা করেছে, পাকিস্তানি কৃষ্টি ও তমুদ্দুনের নামে হাজার বছরের বাঙালির সংস্কৃতি ও সাধনাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথের নাম ও সাহিত্য গণমাধ্যম নিষিদ্ধ করেছে। এভাবে বাঙালি জাতীয়তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার বরাবর লেগে ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি এসব অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল, ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং রুখে দাঁড়িয়েছিল।

আবার একটু ইতিহাসের সূত্র টেনে বলি, বাঙালির সামনে বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, অধিকতর শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ নেতা ছিলেন, যেমন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বজোজ্যেষ্ঠ ও জনমানুষের স্বাভাবিক নেতা ছিলেন, যেমন মওলানা ভাসানী ও কমরেড মণি সিংহ। এঁদের সকলকে বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন। কিন্তু জনগণ তাঁদের অন্তরের, তাঁদের প্রাণের নেতা হিসেবে বরণ করেছে বঙ্গবন্ধুকে। এর পেছনে ছিল তাঁর সময়োচিত পদক্ষেপ, যেমন স্বাধিকারের দাবিতে ছয় দফার আন্দোলন।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বিশেষত্ব হলো, সাহস। মানুষ সেই নেতার ওপর ভরসা করে থাকে, যাঁর সম্পর্কে তাদের মনে নিশ্চিত ধারণা হয় যে এই নেতা প্রয়োজনে জেলজুলুম সইবেন, এমনকি নিজের জীবন বাজি রেখে মাথা উঁচু রেখে আপসহীনভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। ছয় দফার আন্দোলনের সময় জেলজুলুম ও প্রলোভনের কাছে তিনি নতি স্বীকার করেননি; উপরন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। এই সময়ে তাঁর সাহস ও ত্যাগ একাকর হয়ে গেছে এবং তাতে তাঁর অবস্থান পৌঁছে গেছে শিখরে। আপামর জনগণের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর যে আরেকটি গুণের কথা বলতে হবে, তা হলো মানুষের জন্য তাঁর অপার ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। শেখ মুজিবের অতি বড় শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে যে তিনি ছিলেন সিংহহৃদয়ের অধিকারী। তাঁর অসামান্য সাংগঠনিক প্রতিভা, দূরদর্শিতা মিলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙালির নেতা। বলা উচিত– অবিসংবাদিত ও একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা।

তাঁকে 'জাতির জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করা যথোচিত এ কারণে যে, ইতিপূর্বে হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি এভাবে জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। জাতি গঠনের এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেয়ার কারণেই তিনি 'জাতির জনক'।

তবে তার চেয়েও বড় কথা, তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক। তাঁর গুরুত্ব বা সম্মান খাটো করবার জন্য অভিযোগ তোলা হয় যে– বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি,

বঙ্গবন্ধু আত্মসমর্পণ করেছেন। এর প্রত্যুত্তরে দুটি কথা বলা যায়।

সেদিন বাঙালির একমাত্র নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি যদি স্বাধীনতা না চাইতেন ও পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ বা তার সঙ্গে আপস চাইতেন, তাহলে পয়লা মার্চের পরে এত ঘটনার দরকার হতো না। তিনি সাতই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার কথা এমনভাবে বললেন, যাতে পাকিস্তানি বাহিনী তাৎক্ষণিক কিছু করার উসকানি না পায়। সবাই বুঝতে পারবেন, যদি সেদিন বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন, তা হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রেসকোর্সের মাঠ থেকেই বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের সব নেতাকে গ্রেপ্তার করত, দেশদ্রোহিতার মামলায় ঝুলিয়ে দিত। এমনকি নেতাদেরসহ বুদ্ধিজীবীদের হত্যাও করতে পারত। আর তাতে স্বাধীনতার দাবি অঙ্কুরেই শেষ হতো। বঙ্গবন্ধু রাজনীতিবিদ ছিলেন বলে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। আর জাতির প্রকৃত অভিভাবকের মতো রক্তপাত এড়ানোর জন্য ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। এ সবই একজন দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক রাজনীতিকের আচরণ।

তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি। ধরা দেয়ার পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল যে তাঁকে না পেলে পাকিস্তানি বাহিনী ম্যাসাকার করবে, আর দ্বিতীয়ত তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতার পক্ষে আত্মগোপন করা কঠিন বলে পলাতক অবস্থায় ধরা পড়ার আশঙ্কা ছিল বেশি। তাতে তাঁকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর বীরোচিত অবস্থানকে খাটো করা সম্ভব হতো। এ দুটি বক্তব্যের পেছনেই যুক্তি আছে। আর ধরা দিয়ে তিনি তো দেশদ্রোহিতার মামলায় ফাঁসির আসামি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যদি আত্মসমর্পণ করতেন, তাহলে তো সন্ধি হয়ে যেত আর তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যেতেন। আত্মসমর্পণ কেমন তাও আমরা জানি। আন্দোলনের একপর্যায়ে প্রবীণ রাজনীতিক আতাউর রহমান খানের দল জাতীয় লীগ স্বাধীনতার ডাককে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ক্র্যাকডাউনের পর তিনি নিজে ও তাঁর দলের তৎকালীন নেতা শাহ আজিজ সরাসরি স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা করেছেন, শেখ মুজিবকে অপবাদ দিয়েছেন, আর শাহ আজিজ তো জাতিসংঘে পাকিস্তানের দূত হয়ে গেলেন। এটাই হলো আত্মসমর্পণ।

এদিকে স্বাধীনতার যে ঘোষণাটি মেজর জিয়া পাঠ করেছিলেন, তাকে স্বাধীনতার মূল ঘোষণা হিসেবে ধরা হাস্যকর। তাঁর সে ঘোষণার অনেক আগেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর তা শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের ভিত্তিতে। তা ছাড়া চট্টগ্রামে মেজর জিয়াকে দিয়ে এ ঘোষণা পাঠ করানোর পেছনে রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধরত ও বিভ্রান্ত সামরিক অফিসার-সৈনিকদের কাছে একটা ডাক পৌঁছানো। গুরুত্বপূর্ণ ছিল জিয়া মানুষটি নয়, তাঁর 'মেজর' পরিচয়টি।

সেদিন জিয়ার চেয়ে সিনিয়র অফিসার থাকলে তাঁকেই এই ঘোষণা পাঠ করতে বলা হতো। অতএব জিয়া মানুষটির অসংখ্য বিকল্প হতে পারত। কিন্তু যাঁর নামে স্বাধীনতার ডাক দেয়া হয়েছে, তাঁর সমকক্ষ বা বিকল্প নেতা সেদিনও ছিল না, আজও নেই– এ কথাটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে। জিয়া স্বনামে ডাক দিলে সেটা হবে সেনা বিদ্রোহ। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও গণমানুষের নেতার নামে ঘোষণা দিয়েই কেবল স্বাধীনতার বৈধ ডাক দেয়া সম্ভব। রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ দেশের ইতিহাসে সে সবের অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি বিকল্পহীন এক অদ্বিতীয় নেতা।

আজ আদালতের রায় ইতিহাসের রায়ের পরিপূরক হবে কি না মানুষ সেটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অতীতে নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আদালতের বিচার ও রায়কে বিলম্বিত, বিঘ্নিত করা হয়েছে। ষড়যন্ত্র একসময় আপন নিয়মেই ফাঁস হয়ে যায়। মিথ্যা ও বিভ্রান্তির কুহক কেটে যেতে থাকে। সত্য, ধর্ম, ইতিহাস এভাবে কলুষ থেকে মুক্ত হয়। আজ বাঙালির সত্যে ফেরার, ধর্মে ফেরার, ইতিহাসের সঠিক খাতে প্রত্যাবর্তনের সূচনা হবে কি?

আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বিবেকের দংশন থেকে জাতিকে পরিত্রাণ দেবে

ফারুক চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যার ওপর বাংলাদেশের উচ্চতম আদালত আজ, অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ২০০৯ সালে, তাঁর চূড়ান্ত রায় প্রদান করবেন। এই রায়ের জন্য, বাংলাদেশের মানুষ, বিশ্বের বিবেকবান মানুষ, সুদীর্ঘ ৩৪ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করেছে। বিচারের এই বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা অবশ্যই গ্লানিকর। তবু আদালতের এই চূড়ান্ত রায়, বিবেকের দংশন থেকে, সামান্যতম মাত্রায় হলেও, আমাদের জাতিকে পরিত্রাণ দেবে। এ রায় সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়া–এ দেশের মানুষ হিসেবে, সভ্য নাগরিক হিসেবে– আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু এটাও মনে রাখা প্রয়োজন রয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যার বিচার এখানেই শেষ নয়। বিচারের বাণী এখনো নীরবে, নিভৃতে কাঁদে। এই মামলার পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের পর, এই বিচারপ্রক্রিয়ার সমাপ্তি টানা, শুধু বাংলাদেশের কোনো নির্দিষ্ট সরকারের নয়, সমগ্র জাতির দায়িত্ব। আরও একটি সুকঠিন কর্তব্য রয়েছে এ জাতির এবং দেশের বর্তমান প্রজন্মের সামনে; তা হলো, বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই হত্যার যে রাজনীতি চলে আসছে, (এবং সেগুলো কেবল চার জাতীয় নেতা এবং ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাজনিত হত্যাযজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) তার পরিসমাপ্তি ঘটানো।

বঙ্গবন্ধু প্রথম জাতীয় সংসদে তাঁর দেয়া একটি ভাষণে বলেছিলেন,

'বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আজকে, আপনি জানেন, এই সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। ...গাজী ফজলুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। নূরুল হককে হত্যা করা হয়েছে। মোতাহার মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি আমরা যা কোনো দিন দেশে শুনি নাই– ঈদের নামাজের জামাতে–এই সংসদের একজন সদস্যকে গুলি করা হয়েছে। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল। কাদেরকে হত্যা করা হয়েছে? পঁচিশ বছর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা কারা-নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেছে,

তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

কিবরিয়া হত্যা, আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা এবং আরও হাজার হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বঙ্গবন্ধুর সেদিনের প্রশ্নগুলো এবং তার উত্তর এখনো প্রাসঙ্গিক। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর নির্মম, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড এই দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে উৎসাহিত করেছিল। ১৫ আগস্ট এবং তার পরবর্তী সময়ের বিবর্তনের হাত ধরেই সশস্ত্র বাহিনীর একাংশ এ দেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই এখনো দেখি, এই দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বারবারই হোঁচট খাচ্ছে এবং কখনো প্রত্যক্ষ এবং কখনো বা পরোক্ষভাবে, অনাকাঙ্ক্ষিত সামরিক প্রভাব এ দেশের রাজনীতির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর হত্যাকাণ্ডের পরিণতি থেকে এ দেশের মানুষের একটি বাস্তব সত্য অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। তা হলো গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই এবং নির্বাচন গণতন্ত্রের শেষ নয়, প্রথম পদক্ষেপ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যখন দুর্বলতা, অবিচার অথবা শৃঙ্খলাহীনতা পরিলক্ষিত হয়, তার প্রতিষেধক গণতন্ত্র বর্জন নয়, বরং সমাজের প্রত্যেক স্তরে, রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, অর্থনৈতিক বিকাশে, সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গণতন্ত্রকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করা। গণতন্ত্র হলো দেশের মানুষের চিন্তাধারায় অবগাহনের নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এবং তার ধারাবাহিকতা সমাজের স্তরে স্তরে, সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। তা একটি জাতির অগ্রযাত্রা শুধু ব্যাহতই করে না, তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই তো আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান; জিয়াউল হক আর পারভেজ মোশাররফের পথ ধরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতার হয়েছে। আজ তাই পাকিস্তানের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত, ইসলামাবাদে নয়, ওয়াশিংটনে গৃহীত হচ্ছে।

আজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই দিনে স্বভাববতই বঙ্গবন্ধুর কথা মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক অনুগামী হিসেবে নয়, কারণ আমি তখন ছিলাম সরকারি কর্মচারী। তাঁকে আমি দেখেছি, কেবল পররাষ্ট্রনীতি জড়িত বিষয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর বিশ্বাসভাজন একজন আমলা হিসেবে। তবে আমার সেই সময়কার আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনার সুপ্তি, প্রধানত ভেঙেছিল তাঁর ৭ মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণ। আমি তাঁকে দেখেছি আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে, স্বাধীনতার দৃপ্ত পদক্ষেপে অযুত মানুষের মনোরাজ্যে এক অভূতপূর্ব আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে। আমি তাঁর সহযাত্রী হিসেবে দেখেছিলাম ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ তাঁর পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন, যা আমার একটি রক্তাক্ত সাগরতীরে সূর্যোদয়ের মতো মনে হয়েছিল। নিরাশা থেকে কত না আশাজাগানিয়া ছিল

তাঁর সেই দেশে ফেরা। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই তো প্রমাণ করেছিল 'অসত্যের ওপর সত্যের, উন্মাদনার ওপর প্রকৃতিস্থতার, কাপুরুষতার ওপর শৌর্যের, অবিচারের ওপর ন্যায়বিচারের আর মঙ্গলের ওপর অমঙ্গলের' বিজয়ের। কী প্রচণ্ড পর্বতপ্রমাণ সব সমস্যা তখন ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে। কিন্তু কুচক্রীরা তাঁকে সময় দিল কই? দেশের অযুত সমস্যা সমাধানে যখন তিনি লিপ্ত, তখন কজন কাপুরুষ রাতের অন্ধকারে হত্যা করল তাঁকে আর তাঁর পরিবারবর্গকে।

১৯৭৫-এর মে মাসে জ্যামাইকার কিংস্টনে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনই ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেই সম্মেলনে আমি তাঁর সহগামী ছিলাম এবং প্রত্যক্ষ করেছিলাম, কীভাবে তাঁর একক প্রচেষ্টায় সেই সম্মেলনের যুগ্ম ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদে 'কিছু অমীমাংসিত সমস্যার জন্য বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক কষ্টের' উল্লেখ ছিল এবং যার কারণের মধ্যে চিহ্নিত ছিল 'মানুষের (অর্থাৎ তথাকথিত বিহারিদের) স্বদেশ পুনঃপ্রেরণ এবং সম্পত্তির বাটোয়ারা।' আমাদের তরফ থেকে বিষয়টি যুগ্ম ইশতেহারে উল্লেখ করা হতে পারে, এই আশঙ্কায় ভুট্টো কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কানাডাতে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইফতেখার আলীকে প্রেরণ করেন। তিনি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে আমার জ্যেষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। কিংস্টনে এসেই তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে আমি তা বঙ্গবন্ধুকে জানালাম এবং সিদ্ধান্ত হলো যে ইফতেখার আলীকে আমি অভয় দেব যে এই প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল কোনো প্রচেষ্টাই চালাচ্ছে না। একটি নৈশভোজে মিলিত হয়ে সেই অভয়ই আমি দিলাম। তাতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ল। কিন্তু ইফতেখার আলী কল্পনাও করতে পারেননি যে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সপ্তাহ শেষের Retreat-এ (কেবল সরকার-প্রধানরা তখন অনানুষ্ঠানিকভাবে কথাবার্তা বলেন) প্রসঙ্গটি উত্থাপন করবেন।

সোমবার ভোরে বঙ্গবন্ধু আমাদের জানালেন যে, তিনি সপ্তাহ শেষের অবকাশের সময়ে স্বাগতিক দেশের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলি আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপর সহাস্যে বললেন, 'সব ঠিক আছে।'

সেই সকালের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ভুট্টোর সফর সম্বন্ধে অন্য সরকার-প্রধানদের জ্ঞাত করলেন। তারপর জোর আশা প্রকাশ করলেন যে কমনওয়েলথের সরকার-প্রধানেরা পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা বিষয়ে তাঁদের চিন্তা সরকারি ইশতেহারে ব্যক্ত করবেন। তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়ে মাইকেল ম্যানলি বললেন, কী ব্যক্ত হবে তার খসড়া যেন বাংলাদেশ প্রণয়ন করে। তার পরই বক্তব্য দিলেন হ্যারল্ড উইলসন তিনি বঙ্গবন্ধুর উক্তির প্রতি

সমর্থন জানিয়ে বললেন যে ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই যে দুই জাতিতে পরিণত একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পত্তির যথাযথ বাটোয়ারা হয়নি। (নো প্রেসিডেন্ট ইন হিস্টোরি হোয়েন এ কান্ট্রি সেপারেটেড ইনটু টু ন্যাশনস, অ্যান্ড দি অ্যাসেটস অয়ার নট ইকুইট্যাবলি শেয়ারড)।

শুধু বাদ সাধলেন তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়েরেরে। তাঁর বক্তব্য, তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বটে, তবে কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। পাকিস্তান (তখন) তার সদস্য নয়। অতএব কমনওয়েলথের কি উচিত হবে সেই দেশকে জড়িয়ে কোনো প্রস্তাব পাস করা?

চোখ থেকে তাঁর কালো ফ্রেমের চশমাটি অপসারণ করলেন বঙ্গবন্ধু। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন জুলিয়াস নায়েরেরের দিকে। তারপর বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ জুলিয়াস। কমওয়েলথ একটি ক্লাব। কিন্তু আমি তো সেই ক্লাবেরই সদস্য। অন্য সদস্যরা যদি একটি প্রস্তাব পাস করে আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার আমার কিইবা ছিল প্রয়োজন। একটি দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমি। কেন তবে আমি অর্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে এই সম্মেলনে এসেছি?'

অখণ্ডনীয় যুক্তি। হতবাক নায়েরেরে। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে মুজিব, তুমি যা চাও, তা-ই হবে।' প্রসন্ন বঙ্গবন্ধু। সামান্য একটি কূটনৈতিক সাফল্য। কোনো সাড়া জাগানো ঘটনা নয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো বা তার প্রাসঙ্গিকতা নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের স্বার্থে সেই দেশের রাষ্ট্রপতির কি প্রশংসনীয় একাগ্রচিত্ততা! যেখানে বাংলাদেশের স্বার্থ, সেখানে কোনো ছাড় নেই।

বঙ্গবন্ধুর সেই প্রচেষ্টা আমার মন ছুঁয়েছিল বলে এই সামান্য ঘটনা ব্যক্ত করলাম। এই মহান মানুষটির, বাংলাদেশের এই রূপকারের এবং তাঁর পরিবারবর্গের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সুবিচার ভবিষ্যতে যেন পুরোপুরিভাবে সমাপ্ত হয়, সেটাই আজকের প্রত্যাশা।

ফারুক চৌধুরী : সাবেক পরাষ্ট্র সচিব। কলাম লেখক

হায়েনাবিনাশী রায়

আবু হাসান শাহরিয়ার

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ১০ নম্বর বাড়ি। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের আঁতুড়ঘর। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো সেখানেই কাটিয়েছেন বাঙালির মহত্তম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। বাড়িটির পরতে পরতে মিশে আছে একজন রাজনীতিকের নেতা হয়ে ওঠার, নেতা থেকে জাতির জনক হয়ে ওঠার গল্প। একটি পরাধীন জাতির শৃঙ্খলমুক্তির ইতিহাসকে বুকে ধারণ করে থাকা ঐ বাড়ি বাঙালির গৌরবগাথার এক অনন্য নিদর্শন। আবার, বাঙালির কলঙ্কজনক অধ্যায়েরও সাক্ষী। স্বদেশ-স্বজাতিরই কিছু সেনাসদস্যের হাতে ঐ বাড়িতে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন সেই মানুষটি, বাঙালিকে যিনি শুধু মুক্তির স্বপ্নই দেখাননি, স্বপ্ন-বাস্তবায়নের পথও বাতলে দিয়েছিলেন। নৃশংস সেই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার প্রায় ছয় বছর পর বাড়িটিতে ঢুকেছিলেন মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা। কেমন ছিল তার সেদিনের অনুভূতি? না, সব অনুভূতি প্রকাশযোগ্য নয়। অক্ষরবন্দি করা তারচেয়েও বেশি দুরূহ। আর তা যদি হয় বেদনার, মনেরও তাতে সায় মেলে না। জীবনানন্দ দাশের ভাষায়– "কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?" তারপরও 'স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার' শিরোনামের এক গদ্যে শেখ হাসিনা বত্রিশ নম্বর সড়কের ঐ বাড়িটিকে ঘিরে তার বিপুল বেদনার কিঞ্চিত ভাগ দিয়েছেন আমাদের। উদ্ধার করা যাক তার অংশবিশেষ–

এ বাড়িটি যখন ১২ জুন ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেয়া হল, তখন চারপাশের গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ধুলোবালি, পোকা-মাকড় সারা বাড়ি ভরা। ঘরগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলির দাগ, কাচ ভাঙা, বইগুলো বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভেতরে এখনও বুলেট রয়েছে। একটা বইয়ের নাম 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', বইটির উপরে কবি নজরুলের ছবি, বইটির ভেতরে একখানা আলগা ছবি একজন মুক্তিযোদ্ধার, বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষতবিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের উপর গুলি। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয়, তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। বইটির দিকে তাকালেই যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কেন

ওরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে? মায়ের ঘরের আলমারির সব জিনিস বিছানার ওপর স্তূপ করা। ঘরের মেঝেতে বড়-বড় গুলির আঘাত। দোতলায় মা'র শোবার ঘর। এই ঘরেই খুকি, রোজী, জামাল, রাসেলকে খুনিরা হত্যা করেছে। মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাকে ওখানেই গুলি করেছে। আব্বার বিছানার পাশের টেবিলটায় রক্তের ছোপ এখনও শুকিয়ে আছে। পূর্বদিকের দেয়ালজুড়ে রক্তের দাগ। ছাদের উপর মাথার মগজ, গোছাগোছা চুলসহ লেগে আছে।

মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুকেও হার মানায় এ বিবরণ। এজিদ-সীমারের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘাতকরা। নারী-শিশুদেরও রেয়াৎ দেয়নি তারা। হত্যাযজ্ঞর রাতে ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিশু রাসেল কান্নাজড়িত গলায় মায়ের কাছে যাওয়ার আবেদন করেছিল খুনিদের কাছে। আশ্বাস দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের মৃতদেহের কাছে এবং সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বিভীষিকাময় সেই রাতে বত্রিশ নম্বরের ঐ বাড়িটিতে কিংবা দেশে থাকলে নিশ্চয়ই রেহাই পেতেন না শেখ হাসিনা। বিষাদময় ঐ গদ্যটিও লিখতে হতো না তাকে। ঐ প্রশ্নটিও উঁকি দিত না তার মনে– 'কেন ওরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে?'– এর সদুত্তর তো মহান মুজিবই দিয়ে রেখেছেন। আমাদের মতো তথাশিক্ষিতদের উজিয়ে তিনি ফিরে-ফিরে পৌঁছতে চেয়েছিলেন অগণন সাধারণের কাছে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাদের দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মুখ ফেরাননি। সাধারণ মানুষের প্রশ্নে আত্মীয়-পরিজন, এমনকী যে-দলটি তাকে নেতৃত্বের শিখরে নিয়ে গেছে সেই আওয়ামী লীগকেও, তুচ্ছ জানতেন তিনি। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেনও সে কথা–

ব্ল্যাকমার্কেটিং করে কারা? রাগ করবেন না। আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছেন, আপনারা রাগ করবেন না। ব্ল্যাকমার্কেটিং কারা করে? যাদের পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা হয়েছে, তারাই ব্ল্যাকমার্কেটিং করে। স্মাগলিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া করেছে, তারাই বেশি করে। হাইজাকিং কারা করে? যারা বেশি লেখাপড়া শিখেছে তারাই করে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশী টাকা রাখে তারা। আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয় আমার কৃষক ভাইরা পারে না। নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক ভাইরা পারে না। পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি আছে তারাই ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। আর বিদেশী এজেন্ট কারা হয়? নিশ্চয় আমার কৃষক নয়, নিশ্চয় আমার শ্রমিক নয়। আমরা যারা লেখাপড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি,

বিদেশে যাবার পারি, বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে পারি, ভালো স্যুট পরতে পারি, তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশের এজেন্ট হই।

বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের প্রিয় নাম শেখ মুজিব। পৃথিবীর সব মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি। তার রাজনীতির ভরকেন্দ্রই ছিল সাধারণ মানুষ। সাহসের উৎস ছিল বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, এক কথায় খেটেখাওয়া মানুষ। উপরের কথাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই উঠে আসে। একই ভাষণে তিনি আরও বলেছিলেন–

আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছ, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেও না।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র সেই পঙ্‌ক্তিগুলোই ছিল তার স্বপ্নের বীজতলা–

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

অপমানে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-নিপীড়িতদের সমান ছিলেন বলেই পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে-ফিরেই তিনি বলেছিলেন–

আমি, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি– আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না।

যে-বাকশাল গঠনের জন্য নিন্দুকরা তার সমালোচনা করেন, তারও মর্মে ছিল অগণন সাধারণ মানুষ। বাকশাল গঠনের পর ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত গভর্নরদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন–

আপনারা লোকালি ঘুরতে থাকুন। আপনারা নৌকায় ঘুরুন; গাড়ি নিয়ে ঘুরুন– মানুষ যাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। যে-থানায় চুরি-ডাকাতি কমবে না, সেখানকার সরকারি অফিসারদের ডেকে কনফারেন্স করে বলুন, চুরি-ডাকাতি তোমাদের এরিয়ায় বন্ধ করতে না পারলে তোমরা বিদায় হবে। সাফ সাফ কথা। রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে। তোমরা যারা ঐখানে আছো, তাদেরই এসব বন্ধ করতে হবে। সাবধান, আপনাদের সবাইকে আমি এসব বলে রাখছি এখানে। যারা এখানে আছেন, তাদের সবাইকে সাবধান করে রাখছি। আমি এ ব্যাপারে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি।

শেখ মুজিব আর ঐ সেন্টিমেন্ট সমার্থক। ১৯৭২-এর ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনেও স্পিকারকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন– 'আমরা একটি গণমুখী সংবিধান তৈরি করতে চাই।' কথা রেখেছিলেন তিনি– গণমুখী একটি সংবিধানই পেয়েছিলাম আমরা মহান নেতার কাছ থেকে। সংবিধানের উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদই সেই সেন্টিমেন্ট–

১৯(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেতন হইবেন।

১৯(২) মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯৭২ থেকে ২০০৯–৩৭ বছরে সংশোধনীর নামে ঐ সংবিধান ফিরে-ফিরে লাঞ্ছিত হলেও উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদটি ঐ সেন্টিমেন্টকে অবিকৃতভাবে ধারণ করে আছে। কথাগুলো ততখানি গণমুখী, যতখানি তার কাম্য ছিল– মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাস নয়,–'বিলোপ'।

হায় আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এক বছর না গড়াতেই খুনিচক্রের সদস্যদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরষ্কৃত করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বমিডিয়ায় উল্লসিত চিত্তে সাক্ষাৎকারও দিয়েছে আত্মস্বীকৃত খুনিরা। সেই উল্লাস দেশে ডেকে এনেছে ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদকে। শুধু কি তাই? জাতির মহত্তম নেতার প্রয়াণদিনটিকে উপহাস করতে নারকীয় উল্লাসে নকল জন্মদিন পালন করতেও দেখেছি আমরা বিকৃত রুচির কিছু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীকে। অন্যদিকে ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর মামলা দায়ের করতেই আমাদের লেগেছে একুশ বছর (ধিক আমাদের এ ভীরুতা। মামলার বাদী এএফএম মহিতুল ইসলামকে কুর্নিশ।)। বিচরপতিদেরও পুনঃপুনঃ বিব্রত হওয়ার কারণে বিচারিককার্য সম্পন্ন হতে গেছে আরও তেরো বছর। দেখেশুনে একদিন কবিতায় লিখেছিলাম–

> এ চিঠি তখনি লেখ, যখন লেনিন বেঁচে ছিল। অথবা মুজিব ছিল ঘরে-ঘরে চর্চার টোটেম। কে আছে শোনেনি সেই রাখালের বজ্রচেরা বাঁশি? সে যদি তর্জনী তোলে গোরস্থানও দুর্গ হয়ে ওঠে। আজও তার নাম শুনে শোষকের সিংহাসন কাঁপে। সে এক সময় গেছে, মৃত্যুকেও মনে হত বালকের খেলা।

বাল্মীকি আসেনি তাই কোনও মহাকাব্য নেই একাত্তর নিয়ে। অকৃতজ্ঞ এই দেশ; পিতাকে নিজের হাতে রক্তে রাঙিয়েছে। স্বপ্নেও ভাবিনি আমি, মাকে

নিয়ে বেশ্যালয়ে যাব। কবিতার মাঠে নাকি একবারই একাত্তর আসে। ফের

যদি আসে তুমি চলে এসো হায়েনা-বিনাশে।

১৯ নভেম্বর ২০০৯ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল নাকচ করে দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত। মহান মুজিবের দুই কন্যার চোখে বহমান নিরন্তর শোকের নদীতে কয়েক ফোঁটা আনন্দের জল বইয়ে দিতে পেরেছে এরই রায়। অগণন সাধারণ মানুষকে করেছে আবেগাপ্লুত। জাতিকে দিয়েছে পাপস্খলনের সুযোগ। এ রায় না-ঘোষিত হলেও ঘরে-ঘরে চর্যার টোটেম হয়েই থাকতেন মুজিব। তারপরও বলতেই হয়– বহুল প্রতীক্ষিত এ রায় হায়েনাবিনাশী রায়। এ রায় হায়েনাদের বিরুদ্ধে গেছে। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে যারা কালো অধ্যাদেশের চাদরে মুড়ে বৈধতা দিতে চেয়েছিল কিংবা আত্মস্বীকৃত খুনিদের যারা পুরস্কৃত করেছিল, এ রায় তাদেরও বিরুদ্ধে গেছে। মহান নেতার প্রয়ানদিনে যারা নারকীয় উল্লাসে কেক কেটে নকল জন্মদিন পালন করে এসেছেন, এ রায় তাদেরও প্রশ্নবিদ্ধ করতে ছাড়ে না। 'পেটের মধ্যে দুই কলম বিদ্যা হয়েছে' বলে আমরা যারা মানুষে-মানুষে বৈষম্যকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছি বছরের পর বছর, আমাদের মনের হায়েনাকে বিনাশ করতে না-পারলে, এই রায় তাদেরও বিরুদ্ধে যাবে। ভুললে চলবে না– একাত্তরে ঐ হায়েনাদের পরাস্ত করার পরও পঁচাত্তরেই দলবেঁধে ফিরে এসেছিল তারা। মনের হায়েনাকে তাড়াতে না-পারলে বনের হায়েনারা ফিরে ফিরে আসে।

আবু হাসান শাহরিয়ার : কবি ও প্রাবন্ধিক

জাতির কলঙ্ক মোচন

নূহ-উল-আলম লেনিন

৩৪ বছরের প্রতীক্ষার অবসান হল। সুপ্রিমকোর্ট গতকাল এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। রায়ে খুনিদের আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখা হয়। অবশেষে কিছুটা হলেও বাঙালি জাতি কলঙ্কমুক্ত হল। এই রায়ের ভেতর দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু কেন আমাদের এই ন্যায় বিচারের জন্য ৩৪টি বছর অপেক্ষা করতে হল আজ প্রথমেই আমরা সে প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

"...আমার ঘোষিত এই অধ্যাদেশ অথবা সামরিক আইনবিধি অথবা আদেশ সম্পর্কে অথবা... নির্দেশ অনুযায়ী কৃত কোন কাজ বা নেয়া কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন রকমের প্রশ্ন তোলার অধিকার সুপ্রিমকোর্ট, ট্রাইব্যুনাল অথবা কোন কর্তৃপক্ষসহ কোন আদালতেরই থাকিবে না।"

খন্দকার মোস্তাক কর্তৃক ঘোষিত

'অসাধারণ' সামরিক ফরমান

বাংলাদেশ গেজেট, রেজি. নং-DA-I

২০ আগস্ট ১৯৭৫

এভাবেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করতে চেয়েছিল খুনি মোশতাক এবং তার সহযোগীরা। বিচার তো দূরের কথা এমনকি, খুনিদের যে কোন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টসহ যে কোন আদালতের প্রশ্ন তোলার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়েছিল। অতঃপর এই সামরিক ফরমানের অধীনে ২৬ সেপেটম্বর জারি করা হয়েছিল আরেকটি দায়মুক্তির অধ্যাদেশ। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে খ্যাত ওই অধ্যাদেশ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি দিয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের 'সুপ্রিমকোর্ট বা কোন ট্রাইব্যুনাল অথবা যে কোন আদালতের' বিচারিক ক্ষমতা রহিত করেছিল।

মোশতাকের ৮০ দিনের রাজত্বকালসহ জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার টানা একুশ বছরের শাসনামলজুড়ে বহাল ছিল উল্লিখিত অধ্যাদেশ। ফলে একুশ বছর ধরে বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অথবা বঙ্গবন্ধু পরিবারের কোন সদস্য, অসহায় নারী অথবা ছোট্ট সোনামণি রাসেল– কারও হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি; প্রশ্ন তোলা যায়নি কোন আদালতে।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। ২৮ জুন বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত ৬ জনসহ ৯ কূটনীতিককে (জিয়া, এরশাদ ও খালেদা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেইসব খুনিকে কূটনীতিকের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন) দেশে তলব করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি কর্নেল (অব.) ফারুক, শাহরিয়ার ও খায়রুজ্জামানকে গ্রেফতার এবং ৩১ আগস্ট ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলা দায়ের করা হয়। পরে ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়। আর ওই বছর ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি বাতিল বিল পাস হয়। এই বিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করলে ১৯৯৭ সালের ২৮ জানুয়ারি হাইকোর্ট ইনডেমনিটি বাতিল আইনকে বৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। দীর্ঘ একুশ বছর পর বাঙালি জাতি একটি বর্বর অধ্যাদেশের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়।

তদন্ত শেষে ১৯৯৭ সালের ২১ এপ্রিল নিম্ন আদালতে প্রচলিত আইনে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার। দীর্ঘ শুনানি, জেরা ও উভয় পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল জবাব শেষে ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর বিচারিক আদালত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মামলায় ১৫ জন অপরাধীকে প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর বিচারিক আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার সম্পন্ন হয়। হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং প্রলোভন সত্ত্বেও আদালত মাথানত করেননি। এই ঐতিহাসিক রায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভিত্তি স্থাপন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে।

কিন্তু উচ্চ আদালতে এসে শুরু হয় অভাবিত সব কাণ্ডকারখানা। আমার বন্ধু অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশকে 'সব সম্ভবের দেশ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিথ্যে বলেননি তিনি। আমরা গভীর বিস্ময় ও বেদনা নিয়ে লক্ষ্য করলাম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স নিয়ে অকল্পনীয় সব নাটকীয়তা! প্রথমেই হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনকের হত্যা মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ এই মামলাটির ডেথ রেফারেন্সের আগাম শুনানির আবেদন পর্যন্ত নাকচ করে

দেয় (৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০)। অতঃপর শুনানি গ্রহণযোগ্যতা পেলেও শুরু হয় একের পর এক বিচারপতির 'বিব্রতবোধ' হওয়ার পালা।

কিন্তু ইতিমধ্যে ৮ বছর পেরিয়ে যায়। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বেঞ্চ গঠনে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। ২০০১ সালের অক্টোবরে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসে। স্বভাবতই জোট সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যাপারে আগ্রহী তো ছিল না, বরং তারা রাজনৈতিকভাবেই ছিল এই মামলার বিচারের বিরোধী। কেননা বিএনপি-জামায়াত গোষ্ঠী হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রধান বেনিফিশিয়ারি। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের ভাবাদর্শগত এবং রাজনৈতিক মিত্র হচ্ছে বিএনপি, বিশেষ করে খালেদা জিয়া ও তার পরিবার এবং একাত্তরের ঘাতক-যুদ্ধাপরাধীর দল জামায়াতে ইসলামী। এই জোট সরকার দীর্ঘ পাঁচ বছর আপিল বিভাগে প্রয়োজনীয় বিচারপতি নিয়োগ না করে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে রাখে সচেতনভাবেই। এমনকি 'গণতন্ত্র আইনের শাসন ও মানবাধিকারের বংশীবাদক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছরে তাদের এখতিয়ারবহির্ভূত অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। 'জাস্টিস ডিলেইড জাস্টিজ ডিনাইয়েড'– এই সর্বজনীন সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে।

গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বারবার বাংলাদেশের মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে। অনেক রক্তক্ষরণ এবং অগণিত মানুষের আত্মদানের পটভূমিতে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হয়। নির্বাচনে তিন-চতুর্থাংশ আসন নিয়ে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করে। উন্মোচিত হয় সম্ভাবনার নতুন দুয়ার।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ'-এ অঙ্গীকার ছিল নির্বাচিত হলে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাংলাদেশকে কলঙ্কমুক্ত করবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গতকাল তা-ই ঘটল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট গত ৫ অক্টোবর থেকে ২৯ কার্যদিবস ধরে হাইকোর্টের রায়ের পেপার বুক পাঠ শ্রবণ এবং আসামি পক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের সওয়াল-জবাব ধৈর্য ধরে শোনার পর অবশেষে ১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছেন। এই রায়ের ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হল, কোন ব্যক্তি–সে যত শক্তিধরই হোন না কেন, আইনের ঊর্ধ্বে নন। প্রমাণিত হল, প্রজাতন্ত্রের আর সব নাগরিকের মতো প্রজাতন্ত্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা হওয়া সত্ত্বেও অথবা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হওয়ার গৌরবে ভূষিত একজন মহামানব হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ নাগরিকদের অতিরিক্ত কোন বিচারিক সুযোগ পাননি। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে আর সবার মতো প্রচলিত আইনে। বরং একজন সাধারণ নাগরিক নিহত হলে, সে হত্যাকাণ্ডের বিচারে যে সুযোগ থাকে, দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রশ্নে সে সুযোগটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক সুযোগবঞ্চিত এবং বৈরী শক্তির নানাবিধ কারসাজি সত্ত্বেও ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশায় এই দিনটির জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবিত দুই কন্যাসহ সমগ্র বাঙালি জাতিকে সুদীর্ঘ ৩৪টি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

অবশ্য প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে আমরা খুব দ্রুত সংগঠিত হয়েছিলাম। সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু, কারফিউ, রাজনীতি, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ এবং গ্রেফতার নির্যাতনকে উপেক্ষা করেই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ছাত্র-তরুণ এবং রাজনৈতিক কর্মীরা সংগঠিত তৎপরতা শুরু করেছিলাম। আমরা 'কাঁদো বাঙালি কাঁদো' নামে লিফলেটসহ অনেক প্রচারপত্র, 'ইস্পাত' নামে গোপন পত্রিকা প্রকাশ করেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিছিল-সমাবেশ করেছি। হামলা মোকাবিলা করেছি, বন্দুকের নলের মুখে জাতির জনকের বাড়ির সামনে মৌন মিছিল নিয়ে গিয়েছি। অনেকে কারাবরণ করেছে, আত্মদানের ঘটনাও বিরল নয়। কেবল আত্মরক্ষাই নয়, '৭১-এর মতো আবার একটি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে অনেক সহকর্মী সীমান্ত অতিক্রম করেছে। সহ্য করেছে দুঃসহ অনিশ্চিত জীবন। হাতিয়ার তুলে নিয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ জীবনও দিয়েছে। আজকের দিনে তাদের স্মৃতির প্রতি জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

আমি এবং আমার মতো অনেকেই গত ৩৪ বছর ধরে একটা অপরাধবোধ ও গ্লানিবোধের যন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও মোটিভ ছিল– ষড়যন্ত্র ছিল তার বিচার কিন্তু আজও হয়নি। এ কথা তো সবাই জানেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা যেমন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হত্যা করে, তেমনি জিয়াউর রহমান সামরিক ফরমান বলে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আমাদের পবিত্র সংবিধানকে। জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধুর খুনি ও তার সহযোগীদের মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, অর্জনসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী আদর্শকে নির্মূল করা। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবির পাশাপাশি আওয়ামী লীগ জাতির জনকের আদর্শ, স্বাধীনতা ও

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও গত ৩৪ বছর ধরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যা রাজনৈতিক প্রতিশোধ অর্থাৎ '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ধারায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। এখনও ইতিহাসের দায়মুক্তি ঘটেনি। এ কারণে আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করেছি– আমরা কেন বঙ্গবন্ধুর খুনের বদলা নিতে পারলাম না? '৭১-এ পারলেও কেন '৭৫-এ আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতে পারলাম না? যত যুক্তিই দেখাই না কেন, অন্য যাকেই দায়ী করি না কেন– তারপরও নিজেদের ভীরুতা ও অক্ষমতাকে কোনদিন ক্ষমা করিনি। ৩৪টি বছর এই গ্লানিবোধ আমাকে– আমাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে না পারলেও ৩৪ বছর পর যে জাতি ন্যায়বিচার পেয়েছে, জাতি যে একটা দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে উদ্ধার পেয়েছে– এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই আজ ইতিহাসের দায়মুক্তির সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে চাই। আর মনে মনে উচ্চারণ করতে চাই, 'পিতা, আমাদের ক্ষমা করো।' বলতে চাই, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।'

নূহ-উল-আলম লেনিন : রাজনীতিক ও লেখক

অপেক্ষায় টুঙ্গিপাড়া

আনিসুল হক

'বঙ্গবন্ধু পড়তেন ক্লাস এইটে, আমি পড়তাম ক্লাস সেভেনে'– 'বাঁশুরিয়া গ্রামের অশীতিপর আবদুল মান্নান গর্ব করে বলেন। গ্রামপুলিশের পোশাক পরে তিনি বসে আছেন একটা বেঞ্চে, পেছনে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পুলিশ ভবন, সামনে বাইগার নদীর কাটা গাঙ, তাতে নৌকাও ভাসছে, গ্রামের নাম টুঙ্গিপাড়া।

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান আর সমাধিস্থল হিসেবে এখন সবার পরিচিত গোপালগঞ্জের এই টুঙ্গিপাড়া।

'বঙ্গবন্ধুর দাফন-কাফনের কথা মনে আছে?' স্মৃতি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে, নাকি ইতিহাস তাঁর মনে জট পাকিয়ে ফেলেছে; আবদুল মান্নান বলেন, 'পাকিস্তানি মিলিটারিরা তাঁকে মারছে, তারপর হেলিকপ্টার নিয়ে আসছে, ভয়ে পালিয়ে গেছি, কাছে আসি নাই, বাড়ি পুড়িয়া দিছিল না?' ১৯৭১ সালে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আগুন দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা, কিন্তু পঁচাত্তরে পাকিস্তানি মিলিটারি আসেনি, যারা এসেছিল, তারা বাংলাদেশের– এ কথা তাঁকে বোঝানোই যায় না।

গত ১৭ নভেম্বর গোপালগঞ্জ শহর আর টুঙ্গিপাড়া এলাকার একাধিক প্রবীণ ব্যক্তির মুখ থেকে প্রায় একই কথা শোনা গেল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে রেডিওতে শেখ মুজিবের হত্যার ঘোষণা মেজর ডালিমের কণ্ঠে শোনার পর গ্রামবাসীর অনেকেরই নাকি প্রথমে মনে হয়েছিল, পাকিস্তানি সেনারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। সঙ্গী আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন আর সাংবাদিক সুব্রত সাহা মিলে আমরা আলোচনা করি, বঙ্গবন্ধু যেমন বিশ্বাস করতে পারতেন না, কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করতে পারে। দেশ-বিদেশের গোয়েন্দাদের সাবধান বাণী উপেক্ষা করে তিনি বলতেন, 'সবাই আমার সন্তান, ওরা কীভাবে আমাকে মারবে?' এই গ্রামবাসীও তেমনিই ভেবেছিল, বঙ্গবন্ধুকে মারতে পারে কেবল পাকিস্তানি সেনারা, কাজেই তাঁকে হত্যা করার পর তাঁর লাশ নিয়ে যারা এসেছে, তারাও পকিস্তানি।

বঙ্গবন্ধুর সমাধি চত্বরে দাঁড়িয়ে কাঠমিস্ত্রি আইয়ুব (৫১) বলেন, 'রেডিও তো তখন বেশি ছিল না। আমার বয়স তখন ১৭। আমি শুনছি আমার মনে আছে।' তারপর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির গ্রামের বাড়িতে স্থাপিত ওয়্যারলেস যন্ত্রে নির্দেশ আসে ছয়-সাতটা কবর খোঁড়ার। আবার নির্দেশ আসে, একটা কবর খুঁড়তে হবে। কাঠমিস্ত্রি আইয়ুবকে ধরে আনা হয়েছিল হেলিকপ্টারে মৃতদেহটা আসার পর, পেরেকবিদ্ধ কফিনটা খুলতে। পেরেক খুলে তিনি দেখলেন ভেতরে বরফ দেয়া লাশ, বুকে ক্ষত, হাতের আঙুল উড়ে গেছে। ওই গ্রামের নারীরা এখনো সেই সময়ের কথা মনে করে শিউরে ওঠেন। যাঁদের কবর খুঁড়তে আর জানাযা পড়তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁদের স্ত্রী আর মায়েরাও ভেবেছিলেন, পাকিস্তানি সেনারা আবার এসেছে একাত্তরের মতো, তাঁদের স্বামী-সন্তানেরা বোধহয় আর ফিরবেন না!

৮৬ বছরের আবদুর রাজ্জাক, সত্তরোর্ধ্ব সোহরাব আলী শেখসহ আরও গ্রামবাসী জমায়েত হন চত্বরটিতে। তাঁরা স্মৃতিতর্পণ করেন ৩৪ বছর আগের ১৬ আগস্টের সেই দিনটির :

"আকাশে একটা হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। 'মেজর' বারবার বলছেন, টাইম কত লাগবে। তাড়াতাড়ি করো। ইমাম সাহেব বললেন, যদি বলেন শহীদের মৃত্যু, তাহলে গোসল লাগবে না, তা না হলে তো গোসল করাতে হবে। ৫৭০ সাবান এল। রিলিফের শাড়ি আনা হলো দুটো, একটা লালপেড়ে, আরেকটা কালো, পাড় ছিঁড়ে তৈরি হলো কাফনের কাপড়। 'মাইঝা চাচি আইলেন, উনি ভয় পান নাই, গালি পাড়তে লাগলেন, হারামিরা, তোমরা আমার বাবারে মাইরা তারপরে আনছ'?"

সমবেত গ্রামবাসী বঙ্গবন্ধুর কথা বলেন আর স্মৃতিকাতর হন। ব্রিটিশ আমলে দুর্ভিক্ষের সময় ছাত্র মুজিব এলেন কলকাতা থেকে, পিতা শেখ লুৎফর রহমানকে বললেন, 'আব্বা, তোমার গোলায় দেখি ধান, গ্রামের মানুষ তো না খেয়ে।' 'ওই জায়গাটায় ছিল গোলাটা'– প্রবীণ কথক আঙুল উঁচিয়ে দেখান, 'শেখ সাহেব উঠে গোলার বেড়া কেটে দিলেন, ধান পড়তে লাগল, পাটগাতি ইউনিয়নের লোকেরা সেই ধান কোছা ভরে ভরে নিয়ে গেল।' আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'আমি নিজে মেপে দিয়েছি, কথা ছিল পরে যখন সংগতি হবে, এই ধান গ্রামবাসী ফেরত দেবে। কেউ কি আর ফেরত দেয়!'

তাঁর ঋণ কেই বা ফেরত দিতে পারবে? গোপালগঞ্জ শহরে নজরুল ইসলাম লাইব্রেরিতে বসে গ্রন্থাগারিক মইনউদ্দিন (৭৬) আর মধুপুরের তোতা মিয়া (৬০) সেই কথাই বলাবলি করেন।

বঙ্গবন্ধু আর তাঁর পিতা-মাতার সমাধিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সুপরিকল্পিত সমাধিসৌদ্ধ। হরদম দর্শনার্থীরা আসা-যাওয়া করছে। একদা যে পল্লীটি ছিল নিভৃততম, পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বারবার মনে পড়ে কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার লাইন, 'আজ আমি কারও রক্ত চাইতে আসিনি, আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম।'

'১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় হবে, জানেন তো?' চত্বরে জমায়েত নানা বয়সী মানুষ বলেন, তাঁরা জানেন। তাঁরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছেন। কী চান? তাঁরা কঠিন শাস্তি চান। স্থানীয় গ্রামবাসী এক যুবক, পরনে লুঙ্গি, চোখ গনগনে, বলেন– 'ফাঁসি চাই না, গুলি করে মারতে হবে, যেভাবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে মেরেছিল।' তিনি চিৎকার করে উঠে ক্ষিপ্ত পায়ে হেঁটে যান। কাশিয়ানী এম এ খালেক কলেজের দর্শনার্থী ছাত্ররা গুছিয়ে বলেন, দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ শাস্তি চাই। ন্যায়বিচার চাই। সমবেত গ্রাম্যজনেরা তাঁকে সমর্থন করেন।

জাতি পাপমুক্ত হলো

বাহাউদ্দীন চৌধুরী

সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ বঙ্গবন্ধু হত্যার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছে। তাতে কয়েক ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সবাই এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। ঘাতকদের আইনজীবী বলেছেন, মৃত্যুদণ্ড নয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রত্যাশিত ছিল। বিএনপি আমলের আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ পর্যন্ত বলেছেন, এই রায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেছেন, ১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার যে রায় হয়েছে তা দেশের জন্য একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। একটা স্বাধীন দেশে এই রকম জঘন্য অপরাধের বিচার চূড়ান্ত পর্যায়ে আনতে ৩৪ বছর কেন লেগেছে? দেশে যদি সাংবিধানিক শাসন, আইনের শাসন সঠিকভাবে চলত, তবে কোনোভাবে এ বিচার এতদিন ঝুলতে পারত না। আমাদের জাতির জনক, যাঁর নেতৃত্বে আমরা একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করলাম, সেই নেতা তার পরিবারসহ হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন। এই ঘটনার তদন্ত, বিচার, বিচার কার্য করে এই দীর্ঘসূত্রতা লজ্জার বিষয়। জাতি হিসেবে নিজেদের তো বোঝাতে হবে বিচার করতে আমাদের কেন এত সময় লাগল।

গত ৩৪ বছরের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, জঘন্যতম এ হত্যাকাণ্ডের পর সংবিধান আক্রমণের শিকার হলো, অস্বাভাবিক অবস্থা দেশে সৃষ্টি হলো। সাংবিধানিক শাসনের পরিবর্তে আমরা দেখলাম অসাংবিধানিক শাসন। যারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তথাকথিত আইন করে তাদের ব্যাপারে তদন্ত বিচার বন্ধ করে দেয়া হলো। স্থগিত করে দেয়া হলো আইনের শাসনকে, সংবিধানকে। এই বিচারপ্রক্রিয়াকে বন্ধ করার জন্য তথাকথিত আইন হলো, ইনডেমনিটি আইন। এই তথাকথিত আইন বিচারকে বাধা দিয়ে চলল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, সুসভ্য ও শান্তির ভূখণ্ডে পরিণত করতেই এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, এখন জাতি অধীর অপেক্ষায় আছে কখন এ রায় কার্যকর হবে। সেটাই দেশ ও জাতির সামনে এখন বড় প্রশ্ন। তিনি বলেন, রায় কার্যকরের পর আমরা অন্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করব।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টামণ্ডলী ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় চূড়ান্ত রায়ে ফাঁসির দণ্ডাদেশ বহাল রাখায় দলের পক্ষ থেকে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকরের পর এ হত্যাকাণ্ডে মদদদাতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা আমাদের এনে দিয়েছেন তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সমুন্নত রাখব।

রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আমরা মুজিব সেনার সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির কপালে যে কালিমালেপন করা হয়েছিল, এ রায় ঘোষণায় জাতি কলঙ্কমুক্ত হলো।

রায় ঘোষণার পরে ও আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নফল নামাজ আদায় করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আপিল বিভাগে রায়ের পর শুকরিয়া আদায় করে রাজধানীর মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাত করা হয়েছে। বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডায়। বিপুলসংখ্যক মানুষ এই বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নেন।

গত শুক্রবার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজের পর এই বিশেষ দোয়া ও মিলাদে বেশ কয়েক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা ছাড়াও হাজার মুসল্লি অংশ নেন। মোনাজাতে দেশবাসীর জন্য সুখ শান্তি কামনা এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা শুরু হলো। দেশব্যাপী অনেকেই নফল নামাজ আদায় করেন। বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারে নিহত অন্য সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনা করে সব ধর্মের মানুষ প্রার্থনা করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার

চূড়ান্ত রায় সর্বোচ্চ আদালত থেকে ঘোষিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা কোনো স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক খুনের ঘটনা নয়। পনেরোই আগস্ট '৭৫ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। একই সঙ্গে ঘাতকরা বেগম ফজিলাতুন্নেসা, তাদের তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং তাদের দুই পুত্রবধূকে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর অন্য কয়েক আত্মীয়কেও হত্যা করা হয়। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এমন বর্বরোচিত ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও তাঁর প্রিয়জনদের এই হত্যাকাণ্ড কোনো সাধারণ খুনের ঘটনা নয়। এটি বিশ শতকের অন্যতম জঘন্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। সমকালীন ইতিহাসে পৃথিবীতে আরও অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের চরিত্র ভিন্ন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী ঘরের ভেতর প্রার্থনাসভায় আততায়ীর হাতে নিহত হন। এর কয়েক বছর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হন জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময়। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ডব্লিউ আর ডি বন্দরনায়েক নিহত হন ১৯৫৯ সালে। পরে নিহত হন রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা। আব্রাহাম লিংকন ছাড়াও নিহত হন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে ১৯৭৩ সালে। অন্যদের মধ্যে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ফিলিপিন্সের বেনিনো অ্যাকুইনো আততায়ীর হাতে নিহত হন। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নিহত হন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী। যেসব দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান নিহত হন সেসব দেশে তাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের সরকারের পতন ঘটেনি। তা ছাড়া তাদের পরিবারের সব সদস্যকেও হত্যা করা হয়নি। যাদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে শুধু আলেন্দের ছাড়া সবার খুনীদের তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা হয়। তাদের দেশের প্রচলিত আইনে তাদের হত্যার বিচার হয়েছে এবং অপরাধীরা উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড বিশ শতকের একটি ব্যতিক্রমী হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ডের দুটি দিক। একটি এর বর্বরতা, আরেকটি এর রাজনৈতিক নিহিতার্থ। তার হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে তার সরকারের পতন ঘটানো শুধু নয়, তার রাজনীতির আদর্শ মুছে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয় এবং যাঁরা তা করেন তারা তাতে সফল হন। তারা এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মতো একটি কালো আইন পর্যন্ত তারা জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তাতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের

ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে ওই দায়মুক্তির অধ্যাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করে। তারপর বঙ্গবন্ধু ভবনের একজন কর্মচারী ধানমন্ডি থানায় এজাহার দায়ের করেন। ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। নানা বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে হলেও বিচারের সমাপ্তি ঘটল। এখন রায় কার্যকর করার আইনি প্রক্রিয়াটি বাকি। মামলাটির বিচার হয়েছে দেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে। প্রচলিত আইনে বিচার হওয়ায় আসামিরা আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষ আদালতে বা সেনা আইনে বিচার হলে সাধারণ মানুষের কাছে অনেক কিছুই অজানা বা অস্পষ্ট থাকত। এমনকি সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগের শুনানিতেও দুই পক্ষের আইনজীবীরা তাঁদের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং গত কয়েক দিনে আদালতে যে যুক্তি-তর্ক হয়েছে, তাতে আইনগত দিক যত না আলোচিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে রাজনৈতিক দিক। সেটা সঙ্গত কারণেই হয়েছে এ জন্য যে, হত্যাকাণ্ডটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক শত্রুরা ক্ষমতা দখল না করলে রাষ্ট্রই উদ্যোগ নিয়ে এ মামলা পরিচালনা করতে পারত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার শত্রুদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রমাত্র। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধের বিচার হলে সেদিনের বহু শীর্ষ সামরিক বেসামরিক আমলা ও রাজনীতিক ফেঁসে যেতেন। ঊর্ধতন সামরিক কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলা এবং এক পর্যায়ে ঘাতকদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার কারণে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। তাছাড়া ১৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনে ষড়যন্ত্রকারী ও ঘাতকদের রাজনীতিই টিকে গেছে। উপকৃত হয়েছিলেন তাদের সামরিক বেসামরিক সহযোগীরা।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সেদিনের অভ্যুত্থানে যারা ভাড়াটে খুনীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, পরবর্তী বহু বছর তাদের জীবন ছিল খুবই উপভোগ্য ও সুখকর। দেশ ও বিদেশে তারা রাজার হালে জীবনযাপন করেছে। জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ তাদের এমন সব বড় বড় চাকরি দিয়েছেন বিভিন্ন দূতাবাসে যা কঠিন পরীক্ষা দিয়ে বহু বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমেই শুধু পাওয়া সম্ভব। পনেরোই আগস্টের ঘাতকদের জীবনের সুখ শান্তি নিশ্চিত করাই ছিল জিয়া ও এরশাদ সরকারের অন্যতম প্রধান ব্রত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি দীর্ঘদিন। আর এ দীর্ঘ বছরগুলোতে জিয়াউর রহমানের সামরিক ও বিএনপি সরকার এরশাদের সামরিক ও

জাতীয় পার্টি সরকার এবং বেগম খালেদা জিয়ার দুই আমলের বিএনপি সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসের এ কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে দেয়নি, বরং এ সরকারগুলো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বহুভাবে সহযোগিতা করেছে।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় হত্যাকারীদের বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে চাকরি এবং তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড এবং দেশের ভেতরে অভ্যুত্থানের চেষ্টার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এরশাদ সরকারের আমলেও দূতাবাসগুলোতে খুনীদের পদোন্নতি ও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত থেকেছে। শুধু তাই নয়, এরশাদ সরকারের সহায়তায় তারা দেশে ফিরে এসে একাধিক রাজনৈতিক দল (প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি ও ফ্রিডম পার্টি) গঠনের সুযোগ পেয়েছেন। তাদের সংসদে বসারও সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। সরকারও তাদের সহযোগিতা করেছিল। জানা যায়, ১৯৭৬ সালের ৮ জুন ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে অভিযুক্ত হত্যাকারীদের ১২ জনকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়েছিল।

১. লে. কর্নেল শরিফুল হককে (ডালিম) চীনে প্রথম সচিব, ২. লে. কর্নেল আজিজ পাশাকে আর্জেন্টিনায় প্রথম সচিব, ৩. মেজর একেএম মহিউদ্দিন আহমদকে আলজিরিয়ায় প্রথম সচিব, ৪. মেজর বজলুল হুদাকে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সচিব, ৫. মেজর শাহরিয়ার রশিদকে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় সচিব, ৬. মেজর রাশেদ চৌধুীকে সৌদি আরবে দ্বিতীয় সচিব, ৭. মেজর নূর চৌধুরীকে ইরানে দ্বিতীয় সচিব, ৮. মেজর শরিফুল হোসেনকে কুয়েতে দ্বিতীয় সচিব, ৯. কর্নেল কিসমত হাশেমকে আবুধাবিতে তৃতীয় সচিব,

১০. লে. খায়রুজ্জামানকে মিসরে তৃতীয় সচিব, ১১. লে. নাজমুল হোসেনকে কানাডায় তৃতীয় সচিব, ১২. লে. আব্দুল মাজেদকে সেনেগালে তৃতীয় সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তাদের নিয়োগপত্র ঢাকা থেকে লিবিয়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন কর্মকর্তা ও পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী। এর আগে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে তাদের সঙ্গে আলোচনা সমঝোতার জন্য ঢাকা থেকে তৎকীন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নূরুল ইসলাম (শিশু) ঢাকা থেকে লিবিয়া গিয়েছিলেন। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিয়াউর রহমানের নির্দেশে খুনীদের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (ফরেন সার্ভিস ক্যাডার) অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।

তবে ১২ জন সেনা কর্মকর্তা চাকরিতে যোগ দিতে রাজি হলেও ১৫ আগস্ট

হত্যাকাণ্ডের প্রধান দুই হোতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান ও কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশীদ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা ও চাকরি গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদ্দাফির সব ধরনের সহযোগিতা পান।

এরশাদ সরকারের আমলেও খুনীরা প্রত্যেকেই আরও বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন, পদোন্নতি পেয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে আরও জানা যায়, মেজর ডালিমকে বেইজিং থেকে হংকংয়ে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স পদে নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে পোল্যান্ডের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স নিয়োগ দেয়া হলে পোল্যান্ড সরকার তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পরে তাকে কেনিয়ায় হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মেজর নূর তখন ব্রাজিলে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর আগে তিনি আলজিরিয়ায় কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। মেজর রাশেদ চৌধুরী টোকিওতে কাউন্সিলর পদে নিযুক্ত ছিলেন। মেজর একেএম মহিউদ্দিন সৌদি আরবের মিশন উপপ্রধান হিসেবে (বেনজির ভুট্টোর সরকারও করাচীতে একই পদে তার নিয়োগ গ্রহণ করেনি), মেজর শরিফুল হোসেন ওমানে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স এবং লেফটেন্যান্ট খায়রুজ্জামান সে সময় ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পদে ছিলেন। উল্লেখ্য, শেষোক্ত জন ছাড়া বাকি সবাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মিনিস্টার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। তা ছাড়া লে. নাজমুল হোসেন ও ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম চাকরি ছেড়ে চলে যান। পরে তারা কানাডার নাগরিকত্ব নেন বলে জানা যায়। তৎকালীন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ চরম দায়িত্বহীনতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দেন। বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন পাওয়ার পরও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। অথচ এই শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করার ফলেই জিয়াউর রহমান ক্ষুধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সহায়তা করেন।

যে সেনাপ্রধান বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারেননি, তিনিই আবার পরপর দুই সামরিক শাসকের আমলে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। অথচ তিনি বঙ্গবন্ধুর কথা সব সময়ই বলে থাকেন। জেনারেল ওসমানী, যিনি চতুর্থ সংশোধনীর প্রতিবাদ করে জাতীয় সংসদ ত্যাগ করেন এই বলে যে, তিনি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন না। সেই জেনারেল ওসমানীই খন্দকার মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হয়ে প্রায় তিনমাস বঙ্গভবনে কর্মরত ছিলেন। আমাদের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যাতে আমরা ধরে নিতে পারি তিনি বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ওপর তার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কী কারণ ছিল ওসমানীর ওই খুনীদের সঙ্গে যাওয়ার? যে মোশতাকের আমন্ত্রণ সরকারে

যোগ দেয়ার জন্য ঘৃণাভরে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই মোশতাকের সঙ্গে জেনারেল ওসমানী কেন যোগদান করলেন? দেশে তো সেই ১৫ আগস্টের পরও সাহসী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের চার নেতা খুনীদের সামনে মাথা নত করেননি। তাদের কারাগারে নেয়া হয়। কখনও কি ওসমানী মোশতাকের কাছে দাবি করেছিলেন, তাদের ছেড়ে দেয়া হোক? এই চারজন কারাগারে নিহত হলেন। কেউই তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। সবচেয়ে অনুতাপের বিষয় হলো, এই জেনারেল ওসমানীই পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য অসাম্প্রদায়িক দলের পক্ষে ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করেন। মাজার জিয়ারতটি কি ১৫ আগস্টের অব্যবহিত পরপরই করা যেত না?

সেদিন আমরা কেউই আমাদের কর্তব্য পালন করিনি। অথচ যে বঙ্গবন্ধুকে কখনও দেখেনি সেই তরুণ আইনের ছাত্র থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এই তরুণ আমাদের মান বাঁচিয়েছেন।

১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনায় ১৯৯৬ সালের ৩১ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজশাহী আইন কলেজের তৎকালীন ছাত্র তাঈদ উদ্দিন খান। তিনি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ নন, প্রত্যক্ষ সাক্ষীও ছিলেন না। ঘটনার সময় তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। তিনি বলেন, 'জাতির পিতার সন্তান হিসেবে ওই অভিযোগ দায়ের করেছিলাম।' থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অভিযোগের কপিটি গ্রহণ করলেও মামলা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেননি। এ ব্যাপারে তার যুক্তি ছিল, 'এই গণহত্যার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে।' তবে অভিযোগ দায়ের করার পরের দিন তা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এ ঘটনার ৩২ দিন পরে মামলা করেন বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী এএফএম মহিতুল ইসলাম। হাইকোর্টের রায়ে তাঈদ উদ্দিনের অভিযোগ দায়েরের উদ্ধৃতি রয়েছে। তার অভিযোগে ১৩ আসামির নাম উল্লেখ করা হয়।

তাঈদ উদ্দিনের অভিযোগে বলা হয়, 'চতুর্থ সংবিধান সংশোধন আইনের ৩৫ (বি) ধারা বলে যেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা, সেহেতু আমরা তার সন্তান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার চতুর্থ প্যারা, ২১। (১), ২৭। ও ৩১। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমাদের ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য

পালনার্থে আমরা এ অভিযোগ দায়ের করলাম।

অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, 'সংবিধান সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা পেতে আজ পর্যন্ত সময় ব্যয় হওয়ায় বিলম্ব হলো।'

তাঈদ উদ্দিন খানের পৈতৃক বাড়ি ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার ধোপাঘাট গ্রামে। এখন তিনি রাজশাহীর পুটিয়া উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন তিনি। একই সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে এক্সিকিউটিভ এমবিএ নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর তাঈদ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, 'ধানমন্ডি থানার তৎকালীন ওসি শফিক উল্লাহ তার অভিযোগের মূল কপিটি গ্রহণ করে অনুলিপির ওপর মূল কপিটি বুঝে পাওয়ার কথা লেখেন। ওসি আরও লেখেন, 'অত্র গণহত্যার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রহিয়াছে বিধায় আপাততভাবে নিয়মিত মামলা রুজু না করিয়া বিবেচনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনাক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

তাঈদ উদ্দিন বলেন, হাইকোর্টের রায়ের কপির ৬৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে তার অভিযোগ দায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, অভিযোগটি মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়। তাঈদ উদ্দিন বলেন, তিনি যে কাজ করেছেন এ দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই তা করা উচিত ছিল। মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য এই রায় কার্যকর হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্টের কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা বলব। আমার বাড়িটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি বত্রিশ নম্বরের পরের গলিতে একত্রিশ নম্বরে। পনেরোই আগস্টের শেষ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। আমি অনেক চেষ্টা করেও বঙ্গবন্ধুর বাড়ির টেলিফোন সংযোগ পেলাম না। টেলিফোন করলাম বঙ্গবন্ধুর সাবেক সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীকে, পেলাম না। টেলিফোন করলাম বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে। তাকেও পেলাম না। তখন টেলিফোন করলাম বন্ধু পাটমন্ত্রী সামসুল হককে। তিনি আমাকে খন্দকার মোশতাককে টেলিফোন করতে বললেন। করলাম। টেলিফোনে একটা রিং হতেই খন্দকার মোশতাক নিজেই টেলিফোন ধরলেন। মনে হলো যেন কারও টেলিফোনের অপেক্ষায় ছিলেন। বললেন, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কি

হচ্ছে জেনে তাকে জানাতে। তার সঙ্গে আমি তিনবার টেলিফোনে কথা বলেছি। শেষবার তিনি বললেন গাড়ির শব্দ পাচ্ছি, আমাকেও হয়তো ধরতে এসেছে। এতবড় নির্লজ্জ মোনাফেক বেঈমান ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। সে কেবল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মী ছিল না। ছিল ব্যক্তিগত বন্ধু। ক্ষমতার লোভে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য সে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। সেনাপতি মীরজাফর সিংহাসনের লোভে সিরাজকে হত্যা করেছিল, কিন্তু সে তার স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করেনি। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, তিন পুত্র, পুত্রবধূ সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল। কি দোষ করেছিল দশ বছরের শিশু রাসেল? এই ঘাতকদল মানুষরূপী পশু।

পনেরোই আগস্টের সকালবেলা বত্রিশ নম্বরের দিকে পা বাড়ালাম রক্তের নদীর মধ্য দিয়ে। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে কেবল রাজনীতি করেছি, তাই-ই নয়। তিনি ছিলেন আমার বড় ভাইয়ের মতো। তাঁর সঙ্গে ছিল আমার পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে জেলে একত্রে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। জেলখানায় ভাবি চিঠি লিখতেন। এক কিশোরীবধূর বেদনাবিধুর চিঠি। কিন্তু ভাবি কোনোদিন বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতি ছাড়তে বলেননি। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে সংসার চালিয়েছেন, ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। কোনোদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। সুপ্রিমকোর্টের এই রায় আমাদের পাপমুক্ত করল। এখন অপেক্ষা রায় কার্যকর করার। সারাদেশ সেদিনের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকবে। আমরা আশা করব জাতীয় নেতাদের কারাগারে হত্যাসহ অন্যান্য হত্যারও বিচার হবে। দেশে সুদৃঢ়ভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশ বাধাহীনভাবে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবে। পিতার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেবেন।

লেখক : ভাষাসৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও সাবেক সচিব

দিল্লির চিঠি : কুলদীপ নায়ার

হাসিনাকেই এখন তাঁর পিতার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের শাস্তিবিধান নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। নিম্ন আদালত পেরিয়ে হাইকোর্ট, শেষমেশ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে ১২ জন অবসরপ্রাপ্ত ও বরখাস্ত সেনাসদস্যের ফাঁসির আদেশ বহাল রইল। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রায় ঘোষণার পর 'আবেগাপ্লুত' হয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এ হত্যাকাণ্ডের সময় দেশের বাইরে থেকেই তাঁকে শুনতে হয় নিজের পিতা, মাতা ও তিন ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ।

এই মামলাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে আনার কৃতিত্ব শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকেই দিতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা আসে আজ থেকে ১৩ বছর আগে। তখন তারা বিস্মৃতপ্রায় মামলাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়, ফলে নিম্নআদালতে হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশও জারি হয়। এরপর তাদের বিরোধী দল, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় এলে নানা কায়দায় বিচারকাজের ঢিমেতালের কারণে মামলার পরিণতির সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হতে থাকে। রাষ্ট্রপক্ষের কুশীলবরা ব্যাপারটাকে এমন স্থবির করে তোলেন যে, অপরাধীর বিচার নিশ্চিত করায় তাদের চরম অনীহা প্রকাশ পায়।

বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সুপ্রিয় কোর্টের রায়ের আগ মুহূর্তে যে অযাচিত মন্তব্য করেছেন তাতে এই সন্দেহ আরও জোরদার হলো। তিনি বলেন : 'দেশের জনগণ অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নেবে।' এ বিষয়ে কি কোনো মতভেদ ছিল? বাংলাদেশের জনগণকে যিনি স্বাধীনতার পথে নেতৃত্ব দিলেন, তাকেই হত্যা করল সেনাবাহিনীর কিছু লোক। দেশের জনগণ ৩৪ বছর ধরে সেই হত্যাকাণ্ডের বিচারের অপেক্ষায় ছিল। দেলোয়ার হোসেন অনেকটা যেচেই বিচারকাজের বিলম্ব নিয়ে পুরোনো বিতর্কটা উসকে দিলেন। এতে তাঁর ও তাঁর দলের অবস্থান আবারও সুস্পষ্ট হলো।

শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার অল্প কিছুদিনের মাথায় আমি ঢাকায় আসি। আমি তখন ধানমন্ডিতে তাঁদের বাসভবনটি দেখার জন্য যাই। পাহারার দায়িত্বে থাকা লোকেরা আমাকে বাসভবনে ঢুকতে দেয়নি। কিন্তু বাইরে

থেকেই যেন ওই জায়গাজুড়ে একটা হাহাকার অনুভব করলাম। এই নিষ্ঠুর পরিহাসময় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি মহাত্মা গান্ধী হত্যার মিল খুঁজে পাই। ধর্মান্ধ এক হিন্দুর হাতে নিহত হওয়ার আগের সময়টা গান্ধী বিরলা হাউসে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সেই বিরলা হাউসও দেখতে যাই।

বিরলা হাউসের মতো ধানমন্ডির এই বাসভবনকে ঘিরেও এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক বোধ আমার হৃদয়ে জেগে ওঠে। আমার মনে পড়ে যায়, যেন এই কয়দিন আগেই শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার নিলাম। তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কতই না আশাবাদী ও আহ্লাদিত ছিলেন; দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য কত যে তাঁর পরিকল্পনা। মনে পড়ে, তিনি জোরগলায় জাতীয় ঐক্যের কথা বলতেন, বলতেন—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব জনগণই বাংলাদেশের মালিক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলনীতিও ছিল তাই। কিছু প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এই জাতি কি শেখ মুজিবের সেই নীতিকে বহাল রাখবে? আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাঁর সেই ঐক্যের প্রচেষ্টা কি সফল হবে? ওই সময়ে আমি তাঁর মৃত্যুর কারণে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে আশাভঙ্গের বেদনা দেখেছি। যেন সবাই মিলে শোকাহত একটি জাতি।

শেখ মুজিব হত্যা মামলার একটা গতি হলো। এখন ঢাকার উচিত এ বিষয়ে তদন্ত করা যে, শেখ সাহেবকে হত্যার বিষয়ে 'র'-এর পূর্বাভাস কেন বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিরা তখন আমলে নেননি। আমি যদ্দূর জানি, দিল্লির কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সম্ভাব্য একটি সামরিক অভ্যুত্থান ও সেই সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার বিষয়ে ঢাকার কর্তাব্যক্তিদের সতর্ক করার জন্য সেখানে যান।

হয়তো খুনিদের সহযোগী বা তাদের প্রভাবশালী বন্ধুরাই সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে তারা শেখ মুজিবের নিরাপত্তা জোর করা নিয়েও উদাসীনতা দেখায়। তাদের উদাসীনতার কারণেই হোক, আর ষড়যন্ত্রেই হোক—বাংলাদেশ এক চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে তার মহান নেতাকে হারায়।

আমি একবার বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাক্ষাৎকারের একটি অংশ শোনাই : 'মাথাপিছু গড় আয় হিসাব করলে আমাদের জীবনযাত্রার মান পূর্ব পাকিস্তানের (আপনি হয়তো অন্য কোনো নামে দেশটিকে চিহ্নিত করতে পারেন) চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যাবে, সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে তা এমনকি ভারতের চেয়ে বেড়ে যাবে। যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো হুমকি আমাদের বাস্তবতায় নেই, তথাপি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিক সময়োপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হাতে নেয়া গেলে, কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন

নিশ্চিত হলে এবং নিজেদের খনিজ তেল ব্যবহার করা গেলে (আমার বিশ্বাস, আমাদের খনিজ তেল আছে এবং আমরা অচিরেই তা খুঁজে বের করব) আমরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে যাব।'

ভুট্টোর এ কথা শুনে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন : 'আমাদের সম্পদ পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের আছে মাছ, পাট, গ্যাস, ফলফলাদি ও আবাদি জমিসহ এক বিশাল জনবল। আমরা অচিরেই স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছি। কিন্তু পাকিস্তানে জীবনযাত্রার যা ব্যয়, তা অব্যাহত থাকলে তাদের দেউলিয়া হতে হবে।' কত যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তিনি। যাই হোক, শেখ হাসিনাকেই এখন তাঁর পিতার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

শেখ মুজিব হত্যা পরিকল্পনার তদন্তের ক্ষেত্রে ওই সময়ে বাংলাদেশে ট্যাঙ্ক সরবরাহের প্রসঙ্গটা গভীর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। তৎকালীন ভারত সরকারের মন্ত্রী ও সরকারের বেসামরিক মুখপাত্র ডিপি ধড় বাংলাদেশে ট্যাঙ্ক না পাঠানোর জন্য নয়াদিল্লিকে অনুরোধ জানান। কারা ঢাকায় সেই তিনটি ট্যাঙ্ক সরবরাহ করে, যেগুলো কাজে লাগিয়েই পুরো হত্যাকাণ্ডটি সম্পাদিত হয়? আমার ধারণা, সেগুলো আসে কায়রোর কাছ থেকে। প্রশ্ন ওঠে—ওই খুনিরা, সিনিয়র আর্মি অফিসারেরাই কি কোনো না কোনোভাবে ট্যাঙ্ক কেনার সঙ্গে জড়িত ছিল?

'হাইকোর্টের রায় বদলানোর মতো কোনা যৌক্তিক কারণ আমরা খুঁজে পাইনি', সুপ্রিম কোর্টের এই পরিমিত মন্তব্যে নিম্নআদালতের রায় বহাল থাকলেও, এখানেই ইতিহাসের এ অধ্যায়ের শেষ হচ্ছে না। শেখ হাসিনার সরকারকে অবশ্যই দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে আরও বলীয়ান করে তুলতে হবে, যাতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মতো আর কোনো ষড়যন্ত্র দেশের জনগণের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে না পারে। বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সামরিক শাসনের ভার বইতে হয়েছে, যা ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গড়ে ওঠা চেতনাগুলোকে জনগণের মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

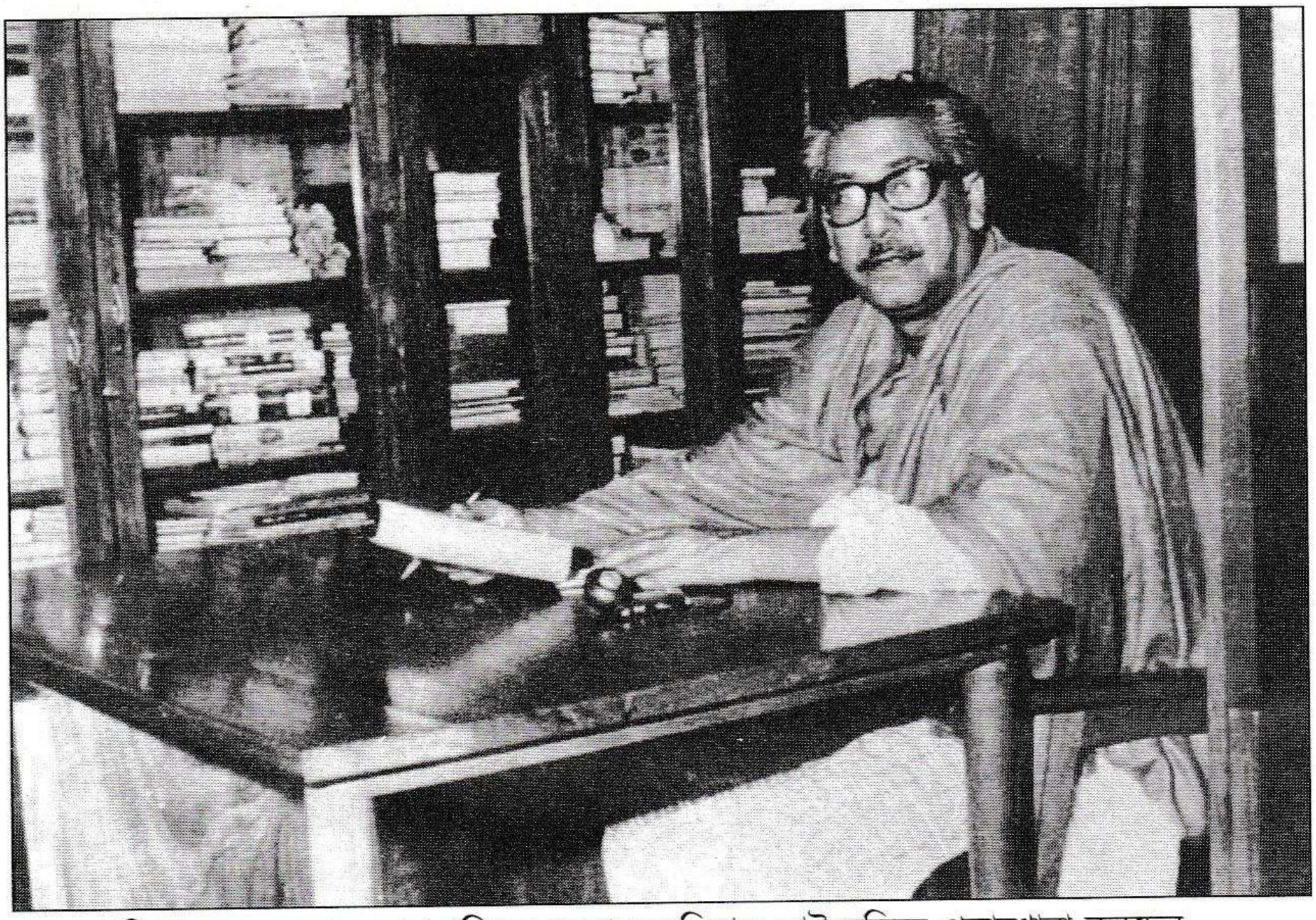
এ বছর ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে অবশ্যই সেই দিনগুলোতে তাঁর পিতার প্রয়াসকে স্মরণে রেখে বারবার ঐক্য সৃষ্টির জন্য কাজ করে যেতে হবে। এ জন্য অবশ্যই সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আমার মনে হয় না, শেখ হাসিনার পক্ষে এই কাজ করা খুব একটা কঠিন হবে।

কুলদীপ নায়ার : ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ছবি



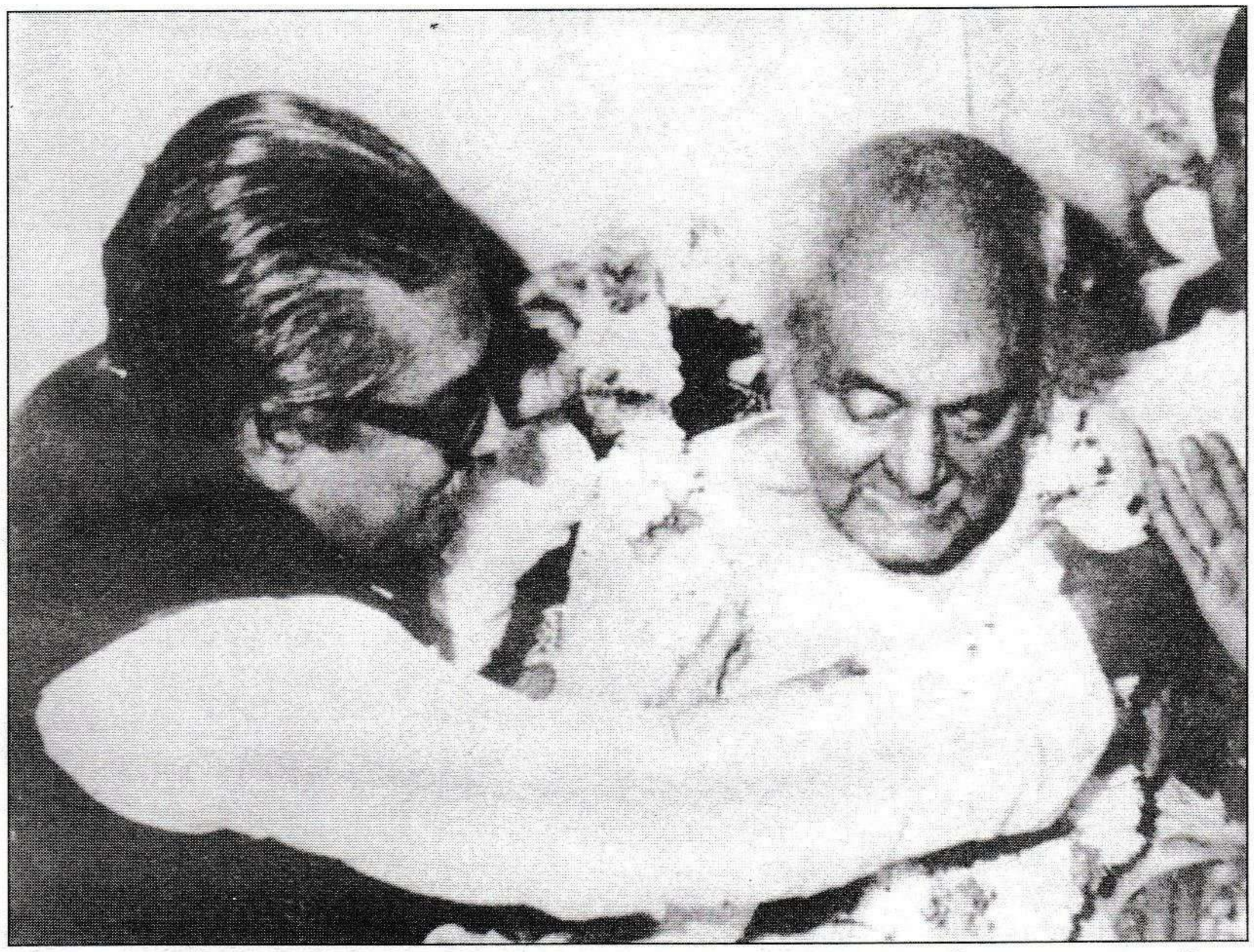
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কবতুর পছন্দ করতেন।



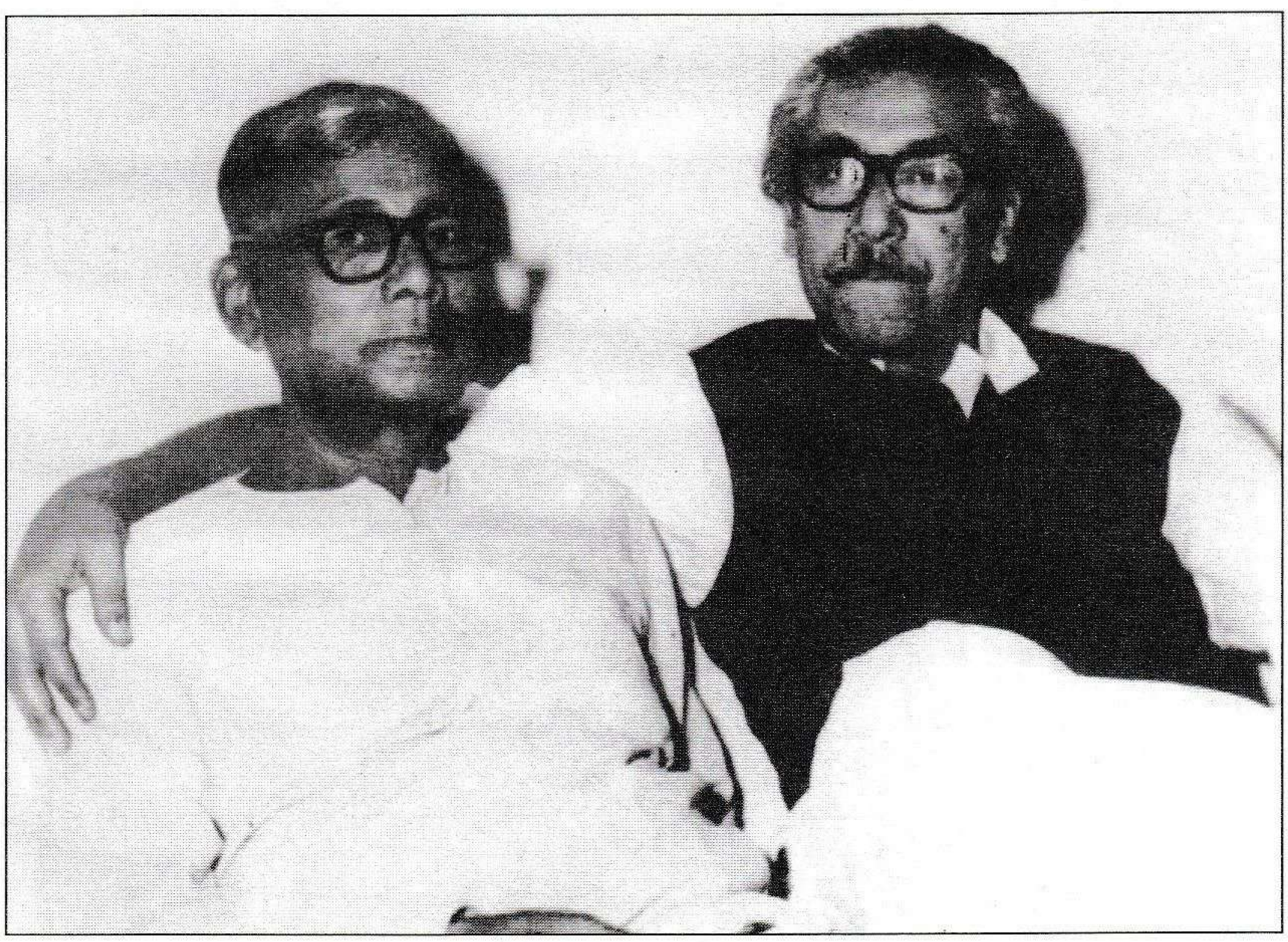
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করছেন



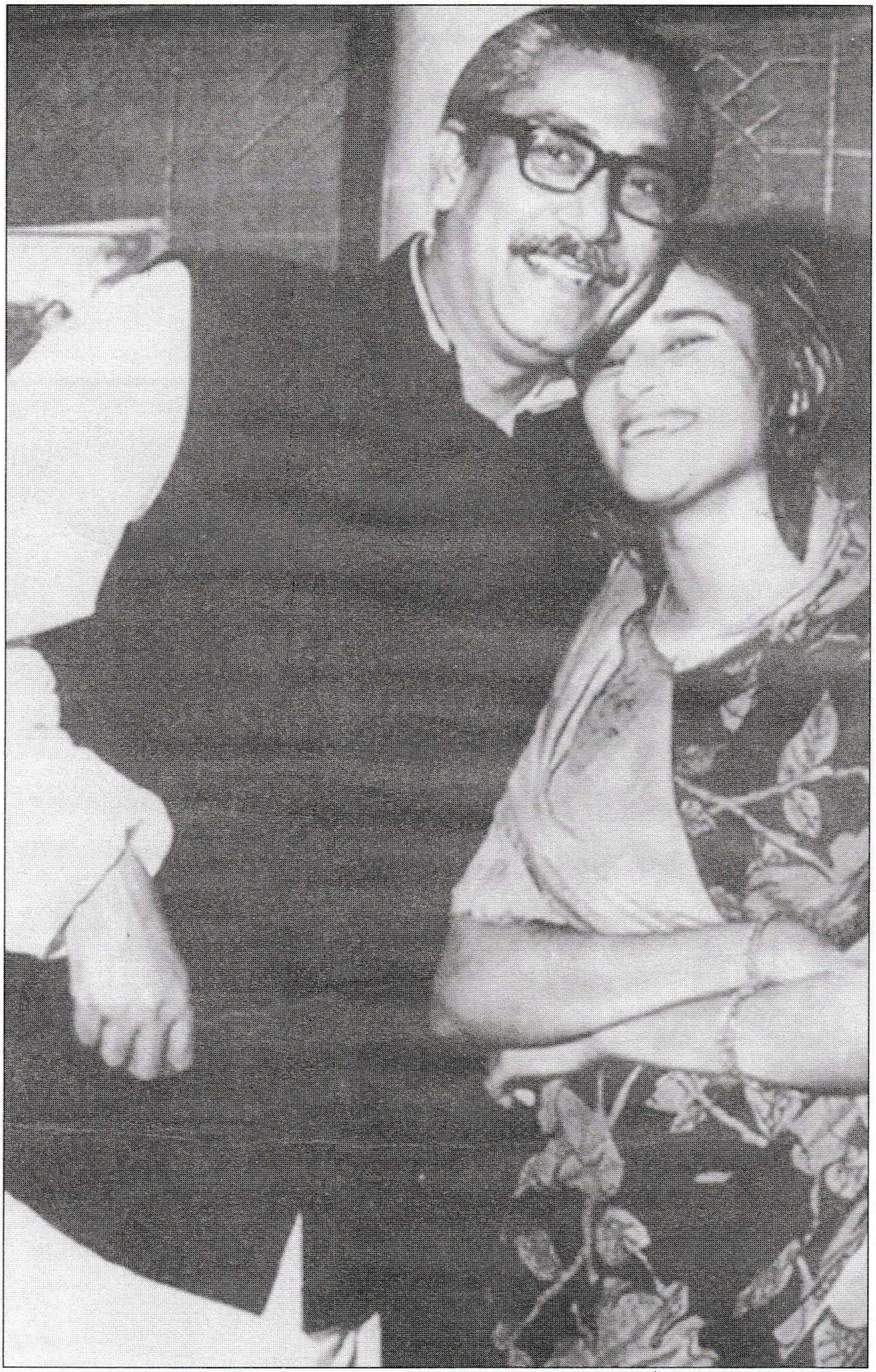
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক আবহমান বাংলার মুক্তির প্রতীক



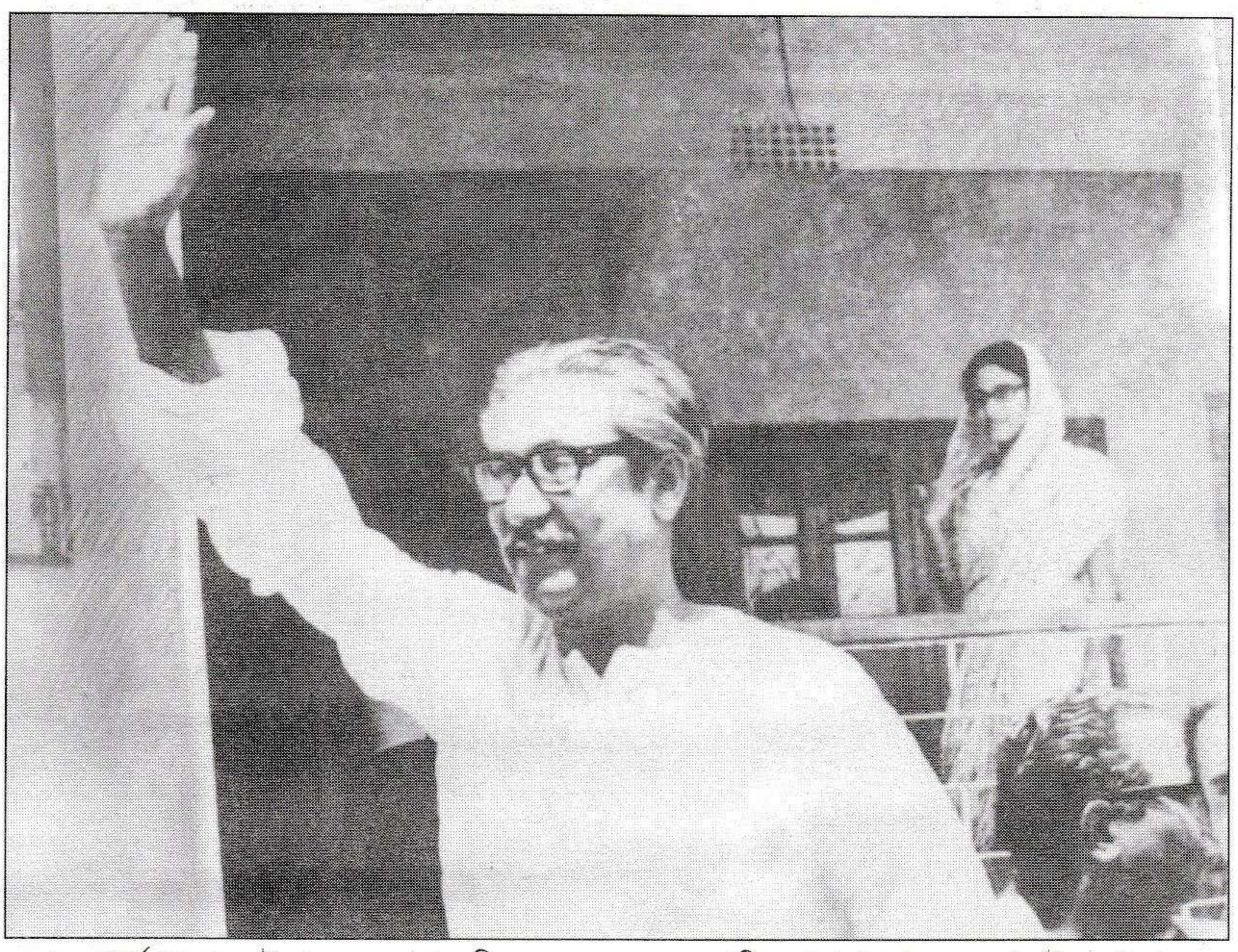
১৯৭২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার পর কবির সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু



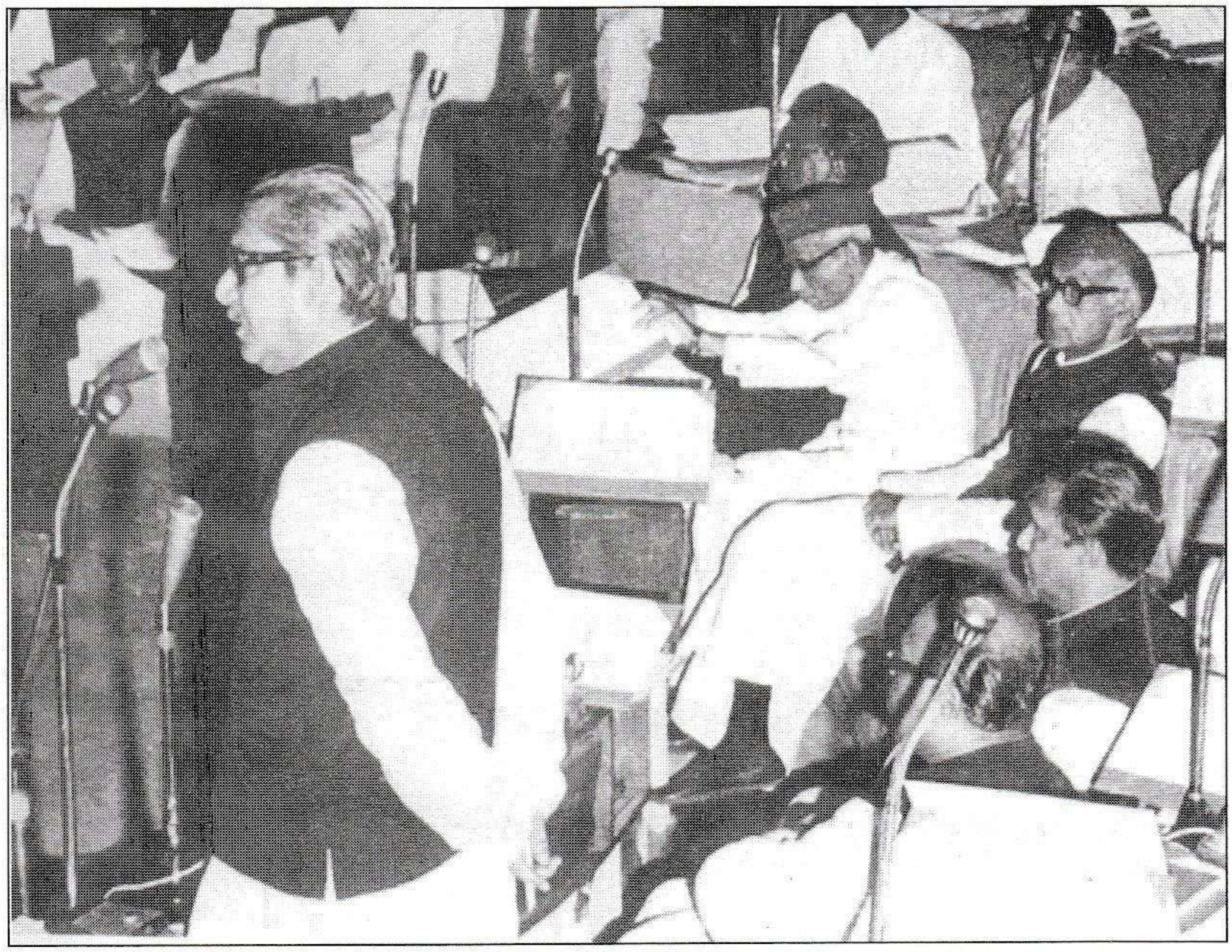
হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা



২৩ মার্চে ১৯৭১ : উত্তাল সময়ে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বাড়ির বারান্দা থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। পেছনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।



১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ : সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুবিজুর রহমান



১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ঐতিহাসিক ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এ বাড়িটি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর



১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব



১৭ মার্চ ১৯৭৫ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আনন্দ অনুষ্ঠান



১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের ঐতিহাসিক বাড়ির সিঁড়িতে ঘাতকের বুলেটে
নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আরও যাঁরা নিহত হয়েছিলেন



বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব



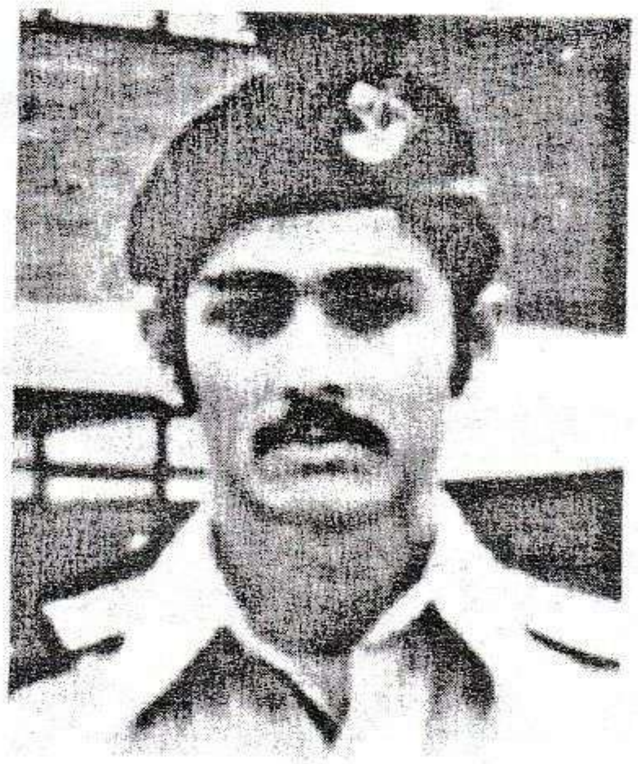
শেখ কামাল



সুলতানা কামাল



শেখ রাসেল



শেখ জামাল



পারভীন জামাল রোজ



শেখ আবু নাসের



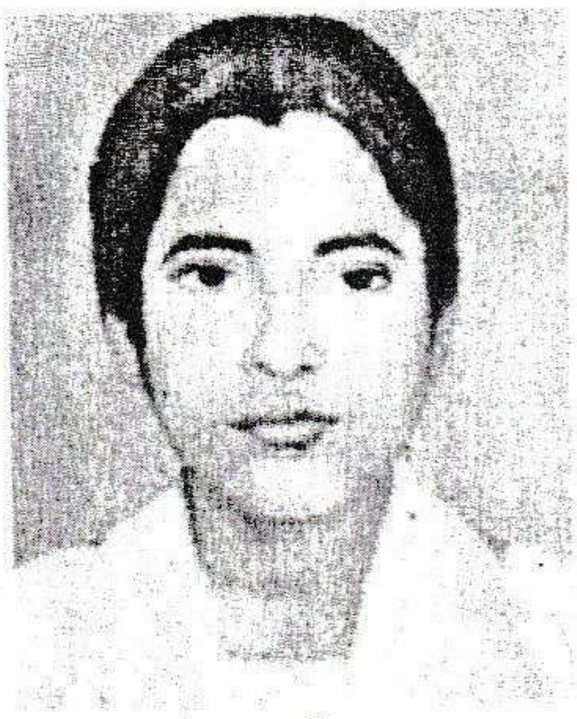
শেখ ফজলুল হক মণি



বেগম আরজু মণি



আবদুর রব সেরনিয়াবাত



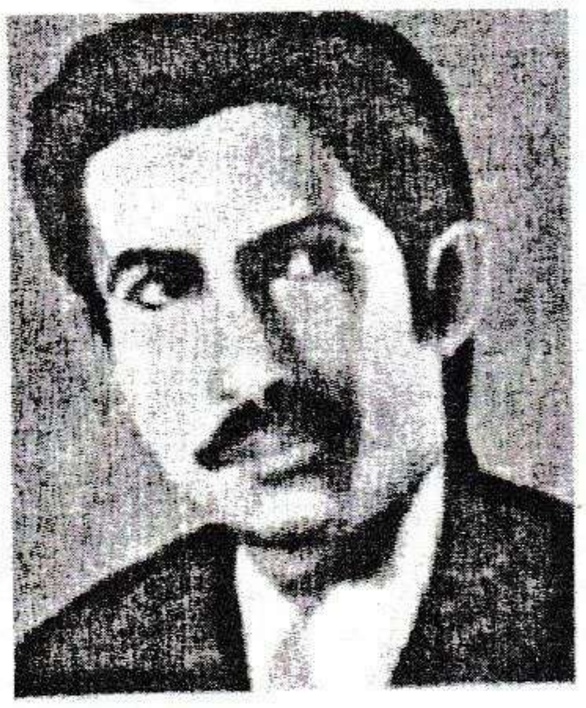
বেবি সেরনিয়াবাত



আরিফ সেরনিয়াবাত



সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু



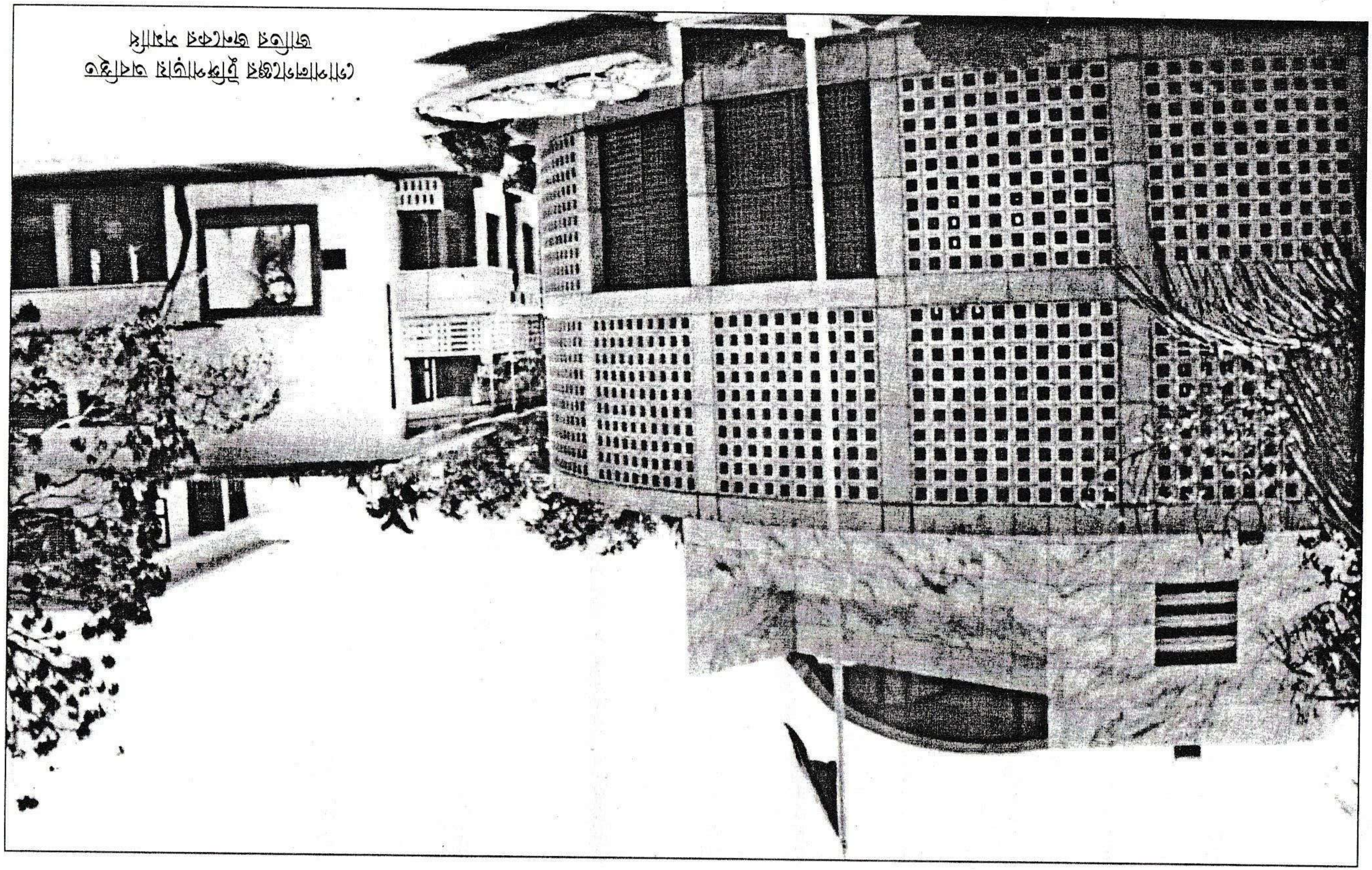
শহীদ সেরনিয়াবাত



কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ



আবদুল নঈম খান রিন্টু



গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত
জাতির জনকের সমাধি

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়, প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া

আমিনুল হক বাদশা, *লন্ডন থেকে*

বাংলাদেশের মত প্রবাসী বাঙালিরাও অধীর আগ্রহে চাতক পাখির মত চেয়ে আছে আদালতের রায়ের দিকে।

রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে, রেস্টুরেন্টে, বাড়ির বৈঠকখানায় সব জায়গাতেই একই আলোচনা বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় কি হবে? শতকরা একশ' জনই ভাবছে যে, খুনিদের ফাঁসির নির্দেশ বহাল থাকবে।

দলমত নির্বিশেষে সকলেই আশা করছেন যে, আদালতের পূর্বেকার প্রদত্ত রায়, ফারুক, রশিদ, ডালিম, বজলুল হুদাসহ সকল খুনিদের ফাঁসির নির্দেশ বলবৎ থাকবে। এর সাথে প্রবাসীরা আরও মনে করে যে, খুনি মোস্তাকের মৃত্যুর বিচার হওয়া উচিত। তা না হলে পরিবারসহ জাতির পিতার হত্যার বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রবাসীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, পরিবারসহ জাতির পিতার নৃশংসভাবে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। পৃথিবীর জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ড। খুনি মোস্তাকের দোষর ফারুক রশিদ গং অবলা নিষ্পাপ শিশু রাসেলসহ বেগম মুজিব, সুলতানা, রোজীকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। তাই এইসব খুনিদের বিরুদ্ধে আদালতের পূর্বেকার ফাঁসির নির্দেশ বহাল থাকবে বলে প্রবাসীরা মনে মনে প্রার্থনা করছে। তারা মনে করে, ইংরেজিতে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে, তা হলো 'জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনায়েড' যেন না হয়। এদিকে, প্রবাসে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নানা ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে। লন্ডনে বসে সন্ত্রাসী তারেক জিয়া খুনিদের দোসরদের সাথে গোপন বৈঠক করেছে বলে একসূত্রে জানা গেছে। এছাড়া খুনি ফারুক, রশিদ, ডালিমসহ অন্য খুনিদের দোসররা আদালতের রায় কার্যকর না হওয়ার বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেছে বলেও জানা গেছে। গুজব তারা নাকি প্রবাসে প্রতিবাদী আন্দোলন করবে। এর ইন্ধন যোগাচ্ছে গুটিকয়েক শিবির-জামায়াত আর পাকিস্তানীমনা বাংলাদেশবিরোধী ধর্মান্ধ ইসলামী গোষ্ঠী।

প্রবাসীরা আরও মনে করে, যেসব খুনী বিদেশে পালিয়ে আছে তাদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে সরকারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তা না হলে প্রবাসীরা এই দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করবে।

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদী উদ্যোগ প্রতিহত করবে বলে স্বাধীনতাপ্রিয় প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

রায়ের মাধ্যমে জাতি কলঙ্কমুক্ত হলো

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বহাল রাখায় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্তোষ প্রকাশ করে অভিনন্দন জানিয়েছে। সংগঠনগুলো পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বিচারের রায় অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি জানায়।

কামাল হোসেন : দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী কামাল হোসেন বলেছেন, জাতি আজ সাংবিধানিক শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফিরে পেয়েছে। আপিল বিভাগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তার দায়িত্ব পালন করেছে, জাতীয় দাবি পূরণ হয়েছে। বিচারব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অপরাধের বিচারের যে নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া থাকার কথা, জাতি তা আজ ফিরে পেয়েছে।

এক বিজ্ঞপ্তিতে কামাল হোসেন আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে বিচার শুরু হয়। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ের পরেও বিচারের দীর্ঘসূত্রতা লজ্জার বিষয়। অ্যাডহক ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হলেও গত ছয় বছরে তা করা হয়নি।

রাজনৈতিক দল : বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান মল্লিক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে ইতিহাসের দায়মুক্তি ঘটল। বাঙালি জাতির ওপরে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হওয়ার যে কলঙ্ক চেপে বসেছিল, এ রায় তার অবসান ঘটিয়েছে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সাজদ)-এর সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাফর সাজ্জাদ যৌথ বিবৃতিতে বলেন, জাতি তার ললাটে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কলঙ্ক থেকে মুক্ত হলো।

গণফোরাম সভাপতি কামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী বিবৃতিতে

রায় কার্যকর করার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সভাপতি মনজুরুল আহসান খান এবং সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম যৌথ বিবৃতিতে বিদেশে লুকিয়ে থাকা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে সহায়তা করতে বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক বিবৃতিতে বলেন, এ রায় দেশে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা জনতা লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এমএল), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে রায় ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে।

আইনজীবী : আইনজীবী আমীর-উল ইসলাম এক সংবাদ বিবৃতিতে বলেন, রায় ঘোষণার মাধ্যমে প্রমাণ হলো, অপরাধী যেই হোক না কেন, তাঁকে বিচারের আওতায় আসতে হবে এবং শাস্তি পেতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এফ এম মেজবাহউদ্দিন ও সম্পাদক শ ম রেজাউল করিম পলাতক আসামিদের অবিলম্বে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আরও বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা আইনজীবী পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি প্রমুখ।

ব্যবসায়ী নেতারা : বণিক ও শিল্প সমিতিসমূহের ফেডারেশন এফবিসিসিআইয়ের নেতারা রায়কে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অর্জন বলে অভিহিত করে বলেছেন, এর ফলে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

পেশাজীবী : রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, স্বাধীনতা ডিপ্লেমা চিকিৎসক

পরিষদ, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদ, আওয়ামী হকার্স লীগ, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ, বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি, প্রশিকা, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ঢাকা সিটি করপোরেশন শ্রমিক-কর্মচারী লীগ, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি) অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মচারী সংযুক্তি পরিষদ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক-কর্মচারী লীগ, বাংলাদেশ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস কর্মচারী পরিষদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড।

শ্রমিক সংগঠন : জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী লীগ, জাতীয় রিকশা-ভ্যান শ্রমিক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক লীগ।

ছাত্রসংগঠন : বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ।

সাংস্কৃতিক : বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী সাংস্কৃতিক ফোরাম, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদ, জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী, আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু শিশু একাডেমী, বাংলাদেশ জাতীয় বাউল শিল্পী লীগ, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমী।

অন্যান্য : আরও বিবৃতি দিয়েছে বঙ্গবন্ধু নাগরিক সংহতি পরিষদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ, এলেবেলে সাহিত্য সংসদ, মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক তরুণ লীগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ফাউন্ডেশন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা পরিষদ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, স্বাধীনতা ফাউন্ডেশন, নদী সংস্কার পানি শাসন ও ব্যবহার সংগ্রাম পরিষদ-বাংলাদেশ, সিটিজেন রাইটস মুভমেন্ট, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ড, অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রভৃতি।

মওদুদ আহমদের প্রতিক্রিয়া : মামলার রায়ে জাতি স্বস্তি পেয়েছে

'মরহুম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে কেবল আইনের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় জাতি স্বস্তিও পেয়েছে। এ রায় ভবিষ্যতে এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে সব মহলকে বিরত রাখবে।'

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর মতিঝিলে নিজের কার্যালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি এই রায়কে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বিএনপি সরকারের শেষ মেয়াদের সময় এই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত থাকার বিষয়ে সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। তিনি বলেন, 'এই হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়াকে দলীয়ভাবে দেখা ঠিক হবে না। এখন রায় কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের।'

ক্রীড়াঙ্গনেও সবাই খুশি

আমার জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু ও শেখ কামাল। ১৯৭৫ সালে জুনিয়র ফুটবলার হিসেবে আবাহনীতে যোগ দিয়েছিলাম। তখন ক্লাবের সভাপতি ছিলেন শেখ কামাল, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ। সালাউদ্দিন ভাই তখন আবাহনীর সুপারস্টার। একদিন অনুশীলনের সময় সালাউদ্দিন ভাই কামাল ভাইকে বলেছিলেন আমাকে রেজিস্ট্রেশন করাতে। কামাল ভাই আমাকে ডেকে সেদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু ১৫ আগস্টের রাতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু। প্রতিবছর ১৫ আগস্ট আমি বনানী গোরস্থানে যাই কামাল ভাইসহ অন্যদের কবরে ফুল দিতে। যতদিন বাঁচব যাব। আজ আমার দুঃখের মাঝেও আনন্দ হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের রায় হয়েছে। খুনিরা শাস্তি পাচ্ছে– এই ভেবে কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

বাদল রায় (সাবেক তারকা ফুটবলার) আমাদের বাঙালি জাতির জীবনে ঐতিহাসিক দিন হিসেবে ১৯ নভেম্বর লেখা থাকবে। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় হয়েছে এদিন। দীর্ঘ ৩৪ বছর অপেক্ষার পর জাতির জনকের খুনিদের শাস্তি হচ্ছে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ। সেই সঙ্গে জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদেরও বিচার হবে এই মাটিতে, সেই প্রত্যাশায় রইলাম।

আমিনুল হক মনি (পরিচালক, ক্রিকেট বোর্ড)

আমরা কিছুটা হলেও দায়মুক্ত হলাম। জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের হত্যাকারীদের শাস্তি হচ্ছে। এর জন্য অনেক বছর প্রতীক্ষা করেছি। যে বঙ্গবন্ধু জন্ম না নিলে দেশ স্বাধীন হতো না, সেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাঙালি জাতিকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। এই রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে কলঙ্ক থেকে মুক্ত হবে জাতি।

হামিদা বেগম (সুলতানা কামালের বান্ধবী ও অ্যাথলেট)

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের রায় হবে শুনে আমি অফিসে যাইনি। টেলিভিশন সেটের সামনে বসেছিলাম মেয়ে ফারজানা মোস্তফা মৌকে নিয়ে। হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় শুনে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছি। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছি– কি অপরাধ ছিল বঙ্গবন্ধুর? কি অপরাধ করেছিল শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল? আমার প্রিয় বান্ধবী খুকি। সেই ক্লাস সেভেন থেকে একসঙ্গে পড়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পড়তাম, খেলাধুলা, চলাফেরা– সবকিছু ছিল একসঙ্গে। এতদিন পর বান্ধবীর হত্যাকারীরা ফাঁসিতে ঝুলবে, এতে নিজেকে কিছুটা হালকা লাগছে। অন্যায় করে পার পাওয়া যাবে না, এই রায়ে তার প্রমাণ মিলেছে। তবে কিছুটা আক্ষেপ রয়েছে আমার। খুকির বাবা-মা, বড় ভাবী দেখে যেতে পারলেন না খুকির হত্যার বিচার।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু থেকে শেষ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ৩৪ বছর পর ঘোষিত হল এ রায়। মাঝখানের এ সময়টি ছিল ঘটনাবহুল। নানা ঘটনা, বিপত্তি, জটিলতা ও বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা মুখ দেখলো চূড়ান্ত রায়ের। এমনই এক দিনে স্মৃত হতে পারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও বিচারের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

১৯৯৬ সালের ১২ আগস্ট কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান ও কর্নেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ২১ বছর পর ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির আবাসিক ব্যক্তিগত সহকারী আ.ফ.ম. মোহিতুল ইসলাম।

১৯৯৬ সালের ৩ অক্টোবর সিআইডি'র এএসপি আব্দুল কাহ্হার আকন্দ মামলার তদন্ত শুরু করেন।

১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (বাতিল) বিল পাস হয়।

১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি সিএমএম আদালতে মামলার চার্জশীট দাখিল করা হয়। এতে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩৪ এবং অন্য কয়েকটি ধারার অধীন চার্জশিটটি দাখিল করা হয়।

১৯৯৭ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা বিচারের জন্য ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানো হয়।

১৯৯৭ সালের ৩ মার্চ নাজিমউদ্দিন রোডে কারগার সংলগ্ন একটি ভবনে বিশেষ আদালত গঠন করা হয়।

১৯৯৭ সালের ১২ মার্চ গ্রেফতারকৃত ৬ আসামীর উপস্থিতিতে বিচার কাজ শুরু হয়।

১৯৯৭ সালের ৭ এপ্রিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়।

১৯৯৭ সালের ৬ জুলাই শুনানির প্রথম দিন বাদী মোহিতুল ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৮ সালের ২০ জুলাই সাক্ষ্য গ্রহণ ও সওয়াল জবাব সম্পন্ন হয়। ৬১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন।

১৯৯৮ সালের ১২ আগস্ট সরকার ও আসামী পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শুরু হয়।

১৯৯৮ সালের ১৩ অক্টোবর যুক্তিতর্ক সম্পন্ন হয়। বিচার আদালতের রায়ের তারিখ ধার্য হয়।

১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল রায় ঘোষণা করেন। এতে তিনি ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৪ জনকে বেকসুর খালাস দেন। এ রায়ের মধ্য দিয়ে বিচারক কাজী গোলাম রসূলের কর্মজীবনের ইতি ঘটে।

২০০০ সালের ২৮ জুন হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কয়েক দফা বিব্রতবোধ করার পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ডেশি রেফারেন্স শুনানি শুরু।

২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৬৩ কার্যদিবস শুনানি শেষে হাইকোর্ট বিভক্ত রায় দেন। বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন ১০ আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। অপর বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ১৫ আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

২০০১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের আদালতে মামলার শুনানি শুরু।

২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল তৃতীয় বেঞ্চ ১২ আসামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে তিনজনকে খালাস দেয়। চূড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকা ১২ আসামীর মধ্যে পরে একই বছর কারাবন্দী চার আসামী সুপ্রিমকোর্টে লিভ টু আপিল করেন।

২০০৭ সালের ১৩ মার্চ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটক হন।

২০০৭ সালের ১৮ জুন এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদকে (ল্যান্সার) যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। জিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছলে ওখানেই তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়।

২০০৭ সালের ২৪ জুন এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ জেল আপিল করেন।

২০০৭ সালের ২ আগস্ট হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আসামীদের লিভ টু আপিল শুনানির বেঞ্চ গঠন করা হয়।

২০০৭ সালের ৭ আগস্ট বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম, বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন ও বিচারপতি মোঃ হাসান আমীনের আপিল বিভাগীয় বেঞ্চ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ করেন।

২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগ ২৫ কার্যদিবস শুনানি গ্রহণ করে

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামীর লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন।

২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর পেপার বুক (মামলার নথি) তৈরি করে জমা দিতে আসামীপক্ষকে বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়। এর আগেই আসামীপক্ষ পেপার বুক জমা দেন।

২০০৯ সালের ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপক্ষ মামলার সার-সংক্ষেপ (কনসাইস স্টেটমেন্ট) আপিল বিভাগে দাখিল করেন।

২০০৯ সালের ২৪ আগস্ট আপিল বিভাগের চেম্বার জজ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির তারিখ ধার্য করেন ৫ অক্টোবর।

২০০৯ সালের ৪ অক্টোবর আপিল বিভাগের বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে ৫ বিচারপতি সমন্বয়ে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়।

২০০৯ সালের ৫ অক্টোবর আপিলের শুনানি শুরু হয়।

২০০৯ সালের ১২ নভেম্বর কার্যদিবস শুনানি শেষে রায়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৯ নভেম্বর।

পাঁচ খুনির ফাঁসি কার্যকর

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ভোররাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল ঘাতকেরা। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ৩৪ বছর পর পাঁচ খুনির ফাঁসি কার্যকর হলো গত ২৭ জানুয়ারি দিবাগত রাতে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরও ছয় খুনি এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পলাতক। অন্য একজান মারা গেছেন।

২৭ জানুয়ারি বুধবার রাত ১২টার পরপরই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঁচ আসামির মধ্যে প্রথমে বজলুল হুদা ও মুহিউদ্দিন আহমেদকে (আর্টিলারি) ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে সৈয়দ ফারুক রহমান ও সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান এবং রাত একটা পাঁচ মিনিটে এ কে এম মহিউদ্দিনের (ল্যান্সার) ফাঁসি কার্যকর হয়। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও কারা প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর পাঁচজনের লাশ বিশেষ পাহারায় অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়। সকালের মধ্যে লাশগুলো দাফনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফাঁসির রায় কার্যকর করতে ঐ দিন বিকেলের পর থেকে কারাগারের আশপাশে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শত শত পুলিশ ও র‍্যাব সদস্য চারদিক থেকে কারাগার ঘিরে রাখেন। সন্ধ্যার পর রাজধানীর চানখাঁরপুল মোড় থেকে কারাগারের প্রবেশ মুখে চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় অনুমোদিত লোকজন ছাড়া কাউকে চলাচল করতে দেওয়া হয়নি। রাতে নগরের অন্যান্য স্থানেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

সকাল সাড়ে নয়টায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নাকচ হওয়ার পর থেকেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রস্তুতি শুরু হয়।

রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নাকচ হওয়ার পর পাঁচ আসামির মধ্যে সৈয়দ ফারুক রহমান বিকেলে প্রাণভিক্ষা চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেন। স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘুরে অতি দ্রুত ওই আবেদন বঙ্গভবনে পৌঁছায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা নাকচ হয়। রাতে তা ফারুক রহমানকে জানানো হয়। রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নাকচ হওয়ার মাত্র ১৫ ঘণ্টা পরেই ফাঁসি কার্যকর করা হয়। গতকাল রাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।

সরকারি দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানায়, বৃহস্পতিবার প্রথম প্রহরে ফাঁসি কার্যকর করার সব ধরনের প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রাখে কারা কর্তৃপক্ষ।

এর আগে দুপুরে আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই ফাঁসি কার্যকর হবে। নিরাপত্তার কারণে ফাঁসির স্থান ও সময় গোপন রাখা হবে। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই গোপন থাকে নি। বিকেলের পর থেকেই সংবাদকর্মীরা কারাগারের সামনে ভিড় করতে শুরু করেন। এর আগে সরকারের উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বৈঠক করে নিরাপত্তার প্রস্তুতি নেন।

কারাবন্দী পাঁচ আসামির সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের শেষবারের মতো দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়। সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে আসা স্বজনদের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ছিল। তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, লাশ হস্তান্তর নিয়ে তাদের সঙ্গে কারা কর্তৃপক্ষের কথা হয়েছে। ভেতরে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত অবস্থায় তারা দেখেছেন। তাদের ফোন নম্বর রেখে দিয়েছেন কারা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

সূত্র জানায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে একটিমাত্র ফাঁসির মঞ্চ ছিল। পাঁচজনের ফাঁসির জন্য আরও দুটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। ফাঁসির জন্য রশি ও অন্যান্য সরঞ্জামও প্রস্তুত করা হয়। সর্বশেষ গতকাল রাত আটটার দিকেও বাইরে থেকে মঞ্চের সরঞ্জাম ভ্যানে করে ভেতরে নেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পুরোনো মঞ্চেই ফাঁসি কার্যকর হয়। কারণ, নতুন মঞ্চ দুটি ফাঁসি কার্যকরের মতো পুরো উপযোগী হয়নি।

সূত্র জানায়, কাশিমপুর-১ কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ৬০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত শাহজাহান ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা হত্যা মামলায় যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত কালু জল্লাদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সহযোগিতা করেন আরও তিন কয়েদি।

কাশিমপুর কারাগার থেকে রাত ১০টা ১০ মিনিটে সাদা রঙের দুটি পিকআপ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকে আসে। সামনের পিকআপে ছিলেন খুনি মুহিউদ্দিনের দুই ছেলে। পেছনের পিকআপে ছিলেন তিন জল্লাদ। জল্লাদ শাহজাহান ও তাঁর সহযোগী বাবুল ও মনিরের পরনে কয়েদির পোশাক ও ডান্ডাবেড়ি ছিল। তাঁরা কারাগারের প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময় ভেতরে সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই কারাগারের ভেতরে ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

কারাগারের আশপাশের ভবনগুলোর ছাদে পুলিশ সতর্ক অবস্থান নেয়। ভবনগুলোর জানালা বন্ধ করে দিয়ে বাসিন্দাদের ভেতরে থাকতে বলা হয়। সন্ধ্যা সাতটার পর কারাগারের দেয়ালঘেঁষা সব সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে র‍্যাব ও পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দারা অবস্থান নেয়।

রাত ১১টা ১০ মিনিটে আইজি (প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফুল ইসলাম খান, ঢাকার জেলা প্রশাসক জিল্লার রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমিতাভ সরকার, ঢাকার সিভিল সার্জন মুশফিকুর রহমান, সহকারী সিভিল সার্জন শামসুদ্দিন এবং রাত সাড়ে ১১টার দিকে স্বরাষ্ট্রসচিব আবদুস সোবহান সিকদার কারাগারে

ঢোকেন। এর পরপরই একটি পিকআপে করে পাঁচটি কফিন কারাগারের ভেতরে নেওয়া হয়, লাশের গোসল করানোর চৌকি পাঠানো হয় এর পরপরই।

রাতে ফাঁসির মঞ্চের পাশে অনেকের সঙ্গে ছিলেন কারা তত্ত্বাবধায়ক তৌহিদুল ইসলাম। তাঁর হাতে ছিল একটি লাল রঙের রুমাল। তিনি হাত থেকে রুমাল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ মঞ্চের লিভার (লোহার তৈরি বিশেষ হাতল) টেনে দেন। এতে পায়ের তলা থেকে কাঠ সরে গিয়ে ফাঁসি কার্যকর হয়। পরে চিকিৎসক লাশ পরীক্ষা করে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। লাশের প্রতিবেদন তৈরি করেন ম্যাজিস্ট্রেট। ফাঁসিতে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রতিবেদন তৈরি করেন। এরপর গোসল করিয়ে একে একে লাশগুলো কফিনে ভরা শুরু হয়।

কারাগারের চারপাশে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও ফাঁসি কার্যকর করার কথা শুনে শত শত উৎসুক মানুষ সেখানে ভিড় করে। ভিড় সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। মানুষের ভিড় উপচে পড়ে পুরো নাজিমউদ্দিন সড়কে। দুই শিশুকে দেখা যায় ফাঁসির দাবির ব্যানার হাতে শীতের রাতে কারা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁসি কার্যকর করার খবর শুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা মিছিল বের করে। কারাগারের আশপাশেও মিছিল দেখা যায়।

প্রথম আলো : ২৮ জানুয়ারি ২০১০

২১ বছর পর মামলা ৩৪ বছর পর দায়মুক্ত জাতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। এ পথপরিক্রমায় সময় লেগেছে দীর্ঘ ৩৪ বছর। তবু শেষমেশ স্বস্তি পেয়েছে জাতি। দায় থেকে মুক্ত হয়েছে গতকাল বুধবার।

শুরুতে দায়মুক্তি (ইনডেমনিটি) অধ্যাদেশের জন্য বিচার কার্যক্রম বন্ধ ছিল ২১ বছর। তবে মামলার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। মামলা দায়ের করার পরও বিচার শেষ করতে লেগেছে ১৩ বছর। নিম্ন আদালতে বিচারকের অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে বিচারে বিলম্ব হয়। মামলার চার্জ গঠনসহ প্রতিটি বিষয় হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করায় তৈরি হয় ধীরগতি।

২০০১ সালে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ের পর বিচারপতিদের বিব্রতবোধ হওয়া ও বিচারক স্বল্পতার কারণে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আমলে আপিলের শুনানি স্থবির হয়ে পড়ে।

ঘটনা ও তথ্য বিশ্লেষণ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থেমে থেমে চলা এই মামলার কার্যক্রমের মূল অংশ তুলে ধরা হলো—

১৯৭৫ সালেরা ১৫ আগস্ট : সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর : তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন : আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। উদ্যোগ নেওয়া হয় অধ্যাদেশটি বাতিলের।

আসামি গ্রেপ্তার শুরু : ১৯৯৬ সালের ১৩ আগস্ট বিশেষ ক্ষমতা আইনে আসামি সৈয়দ ফারুক রহমানসহ তিন আসামি গ্রেপ্তার হন। ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল পাস হয়।

১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি : মামলার অভিযোগপত্র দাখিল। আসামি করা হয় বিশ জনকে। মারা যাওয়ায় চারজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে আরও একজন অব্যাহতি পান। ২০ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্তদের মুখ্য মহানগর

আদালতে হাজিরা করা হয়। ১ মার্চ মামলা ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানো হয়। ৩ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে বিশেষ এজলাস গঠন করা হয়। বিচারক কাজী গোলাম রসুল। সিরাজুল হক রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ পিপি নিযুক্ত হন। ১২ মার্চ ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিশেষ এজলাসে বিচার শুরু হয়।

ওই বছরের ৭ এপ্রিল ২০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়। ২১ এপ্রিল বিচারকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। ২৯ এপ্রিল মোশন খারিজের পর আবার বিচার শুরু হয়।

৪ মে পলাতক এক আসামির স্ত্রী জোবায়েদা রশিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ চ্যালেঞ্জ করায় বিচার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। ১৯ জুন জোবায়দা রশিদের আবেদনে হাইকোর্টে নিস্পত্তি হয়নি বলে মামলার কার্যক্রম তৃতীয়বারের মতো স্থগিত হয়। কয়েকদিনের ব্যবধানে হাইকোর্ট জোবায়েদা রশিদকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিলে ১৯ জন আসামির বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। ৬ জুলাই সাক্ষ্য, জবানবন্দি ও জেরা শুরু হয়।

১৯৯৮ সালের ২ মার্চ : ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিতকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি মামলা হাইকোর্ট খারিজ করে দেন। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা চালিয়ে যেতে সব বাধা অপসারিত হয়। ২০ জুলাই সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়।

একই বছরের ১২ আগস্ট সাওয়াল জবাব শুরু এবং ১৩ অক্টোবর শেষ হয়। দেড় 'শ দিনের মতো শুনানির পর ৮ নভেম্বর রায়ের তারিখ ঘোষণা হয়।

৮ নভেম্বর : কাজী গোলাম রসুল রায়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ১৯ আসামির মধ্যে খালাস দেওয়া হয়— তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, ক্যাপ্টেন আব্দুল ওয়াব জোয়ার্দার, দফাদার মারফত আলী শাহ ও এলডি আবুল হাশেম মৃধাকে। ওইদিনই অপর আসামি বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আনা হয়।

১১ নভেম্বর : হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্সের জন্য পাঠানো হয় মামলা।

২০০০ সালের ৩০ মার্চ : ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের আপিল শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়। ২ এপ্রিল পলাতক আসামিদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওই বছরের ১০ এপ্রিল এক বিচারপতি শুনানিতে বিব্রতবোধ করেন। ১৮ এপ্রিল বিচারকদের বিব্রতবোধ হওয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা লাঠিমিছিল করেন। ২৪ এপ্রিল হাইকোর্টের অপর একটি দ্বৈত বেঞ্চও বিব্রতবোধ করেন।

২ মে ১১ জন পলাতক আসামিদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। ৩ মে সংশোধিত পেপারবুক তৈরির আবেদন নাকচ করে সম্পূরক পেপারবুক তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৮ জুন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর শুনানি শুরু হয়। ১০ জুলাই সম্পূরক পেপারবুক আদালতে জমা হয়। ১৮ জুলাই পেপারবুক পাঠ শেষে রায়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন শুরু হয়।

১৪ ডিসেম্বর বিভক্ত রায় দেন হাইকোর্ট। এক বিচারপতি পনের জনের মধ্যে দশ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। অপর বিচারপতি ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

২০০১ সালের ১৪ জানুয়ারি : দুই বিচারপতির বিভক্ত রায় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিাচরপতির কাছে পাঠানো হয়। ১৫ জানুয়ারি বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমকে তৃতীয় বিাচরপতি নিয়োগ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় বিচারপতির আদালতে শুনানি শুরু এবং ১৯ এপ্রিল শেষ হয়। ৩০ এপ্রিল তৃতীয় বিচারপতি রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১২ আসামির সাজা বহাল রেখে, খালাস দেন তিন আসামিকে। এরপর আটক সাজাপ্রাপ্ত চার আসামি লিভ টু আপিল দায়ের করেন।

১৬ আগস্ট লিভ টু আপিল শুনানির জন্য কার্যতালিকায় ছিল। এরপর আট বার শুনানি মুলতবি হয়।

২০০২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি : মামলাটির শুনানি আপিল বিভাগের কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ১৯ মার্চ বিশেষ পিপি সিরাজুল হক শুনানি শুরুর আবেদন জানালে আপিল বিভাগের দুজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করেন। ফলে শুনানির জন্য বিচারপতি সংকট সৃষ্টি হয়। ১৫ ডিসেম্বর এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ কৌঁসুলিদের অব্যাহতি দেয় জোট সরকার।

২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মার্চ : দীর্ঘ এই সময়ে আপিল বিভাগে শুনানি হয়নি। ২০০৭ সালের ২০ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আপিল বিভাগে বিচারপতি মো. হাসান আমীনকে নিয়োগ দেওয়ায় লিভ টু আপিল শুনানির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

১৮ জুন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপর আসামি ল্যান্সার মহিউদ্দিনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ২৪ জুন আসামি ল্যান্সার মহিউদ্দিন জেল আপিল করেন। ২ আগস্ট প্রধান বিচারপতি লিভ টু আপিল শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠন করেন। বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চের অপর দুই বিচারপতি হলেন বিচারপতি জয়নুল আবেদীন ও বিচারপতি মো. হাসান আমীন।

৭ আগস্ট আসামিদের লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি শুরু। ২৩ সেপ্টেম্বর লিভ টু আপিলের ওপর ২৫ কার্যদিবস শুনানি গ্রহণ করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামির আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেন।

২০০৯ সালের ২৪ আগস্ট রাষ্ট্রপক্ষ শুনানির দিন নির্ধারণের জন্য আবেদন জানায়। চেম্বার বিচারপতি ৫ অক্টোবর শুনানির দিন ধার্য করে দেন। ৪ অক্টোবর প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিন আপিল শুনানির জন্য বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলামের

নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সমন্বয়ে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন। ৫ অক্টোবর আসামিপক্ষের আইনজীবী আপিলের ওপর শুনানি শুরু হয়। ১৫ অক্টোবর যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন শুরু করে আসামিপক্ষ।

২ নভেম্বর রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন শুরু করে এবং ১১ নভেম্বর শেষ হয়। শুরু হয় আসামিপক্ষের আইনি ব্যাখ্যা।

১৯ নভেম্বর পাঁচ আসামির আপিল ও জেল আপিল খারিজ করে রায় দেওয়া হয়।

২০১০ সালের ৩ জানুয়ারি : ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আব্দুল গফুর পাঁচ আসামির মৃত্যুপরোয়ানা জারি করেন। ৯ জানুয়ারি : রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন আসামি বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) ও মুহিউদ্দিন (আর্টিলারি)। ১০ জানুয়ারি আসামি বজলুল হুদা ও মহিউদ্দিনের আইনজীবী রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন। ১২ জানুয়ারি : আসামি সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানের আইনজীবী পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন। ১৯ জানুয়ারি : পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন আসামি সৈয়দ ফারুক রহমান ও মুহিউদ্দিন আর্টিলারি।

সর্বশেষ আদেশ : প্রধান বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে চার বিপারপতির বিশেষ বেঞ্চ ২৪, ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি উভয়পক্ষের শুনানি গ্রহণ শেষে গতকাল ২৭ জানুয়ারি আদেশ দেন।

রায় পুনর্বিবেচনার সব আবেদন খারিজ করা হয়।

প্রথম আলো : ২৮ জানুয়ারি ২০১০

বঙ্গবন্ধুর কিছু স্মরণীয় উক্তি

বঙ্গবন্ধু একবার একান্ত আলাপচারিতায় যুব লীগের কয়েকজন কর্মীকে বলেছিলেন, আমি মারা গেলে আমার কবরে একটা টিনের চোঙ্গা রেখে দিস। লোকে জানবে এই একটা লোক একটা টিনের চোঙ্গা হাতে নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল এবং সারাজীবন সেই টিনের চোঙ্গায় বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করতে করতেই মারা গেল।

> ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।

> আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ।

> এ দেশে কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। (১০ জানুয়ারি ১৯৭২)।

> এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে। (১৬ জানুয়ারি ১৯৭২)।

> সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না। (২১ জানুয়ারি ১৯৭২)।

> বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। (৯ মে ১৯৭২)

> দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩)

> রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চারটি জিনিসের প্রয়োজন, তা হচ্ছে : নেতৃত্ব, ম্যানিফেস্টো বা আদর্শ, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং সংগঠন।

> গণআন্দোলন ছাড়া, গণবিপ্লব ছাড়া বিপ্লব হয় না।

> বিশ্বে দুই শিবিরে বিভক্ত—শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। (১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে)।

> আমি বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও', বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার জন্য। (২৬ মার্চ ১৯৭৫)।

ইত্তেফাক : ১৯ নভেম্বর ২০০৯

কালপঞ্জি

১৯২০ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম।

১৯২৭ গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু শিক্ষাজীবন।

১৯৪০ নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান।

১৯৪২ এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাস করেন।

১৯৪৩ মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত।

১৯৪৭ ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। কলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি এবং ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান।

১৯৪৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এই দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ ১০ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের ওয়াহিদুজ্জামানকে হারিয়ে নির্বাচিত হন। ১৫ মে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৫ ৫ জুন গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫৬ ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

১৯৫৭ সংগঠনের কাজ করার জন্য ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৫৮ ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন।

১৯৬৫ রাষ্ট্রদ্রোহ ও আপত্তিকর বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের।

১৯৬৬ ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৮ ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়।

১৯৬৯ প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান। ২২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৯৭০ ৬ জানুয়ারি পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা'কে মনোনীত করেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬০টি আসন লাভ। প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ।

১৯৭১ ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' গ্রেপ্তার হন ২৫ মার্চ রাতে।

১৯৭২ ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ 'জুলি কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

১৯৭৩ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৩টি।

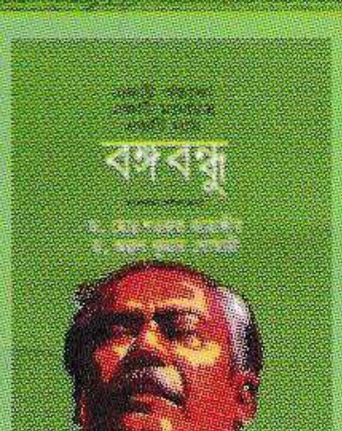
১৯৭৪ ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ প্রদান।

১৯৭৫ ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে।



ড. অরুণ কুমার গোস্বামী ১৯৫৭ সালের ১২ জুলাই মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার খালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়—খালিয়া রাজা রাম ইনস্টিটিউশন থেকে মাধ্যমিক, শহীদ মানিক বিজয় সাইদুর কলেজ (বর্তমানে রাজৈর কলেজ) থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল UNFPA ফেলোশিপ নিয়ে ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (সিডিএস) ত্রিভান্দ্রাম, কেরালা থেকে পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ১৯৯৭-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ২০০২ সালে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন—UGC পি-এইচ.ডি, ফেলোশিপ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম Institutionalization Constraints of Democracy in Bangladesh (1990-1996)। দেশ-বিদেশের স্টান্ডার্ড একাডেমিক জার্নালে এবং বইতে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৮ সালের ০৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৮ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত ড. গোস্বামী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সরকারি কলেজে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি গোপালগঞ্জ জেলার কৃতি শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হন। ২০০৮ সালের ২ আগস্ট থেকে ড. গোস্বামী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'Authoritaion Versus Democracy : The Changing Phases of Bangladesh Politics', 'June 1996 Parliamentary Election in Bangladesh : A Review'. পুস্তক পর্যালোচনা, 'অমর্ত্য সেনের 'The Argumentative India', 'মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস নীতি' প্রভৃতি। তিনি দেশ-বিদেশে বেশকিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান এলামনাই এসোসিয়েশন, ইউনেস্কো ক্লাব: বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি: রজনীগন্ধা কচি-কাঁচার মেলা প্রভৃতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তাঁর গবেষণা আগ্রহ : গণতন্ত্রায়ন, নির্বাচন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব, ভারতীয় ও প্রাচীন গ্রিক দেশীয় মহাকাব্য প্রভৃতি। শিক্ষকতা ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কো-কারিকুলার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।



একটি পতাকা
একটি মানচিত্র
একটি নাম

বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর
ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

প্রচ্ছদ : মশিউর রহমান

মূল্য : ৩০০.০০

ISBN : 978-984-8383-97-1

সৃজনী